কিশোর থ্রিলার

সেবা প্রকাশনী

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৮৫

রকিব হাসান

শামসুদ্দিন নওয়াব

ভলিউম-৮৫

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান/শামসুদ্দীন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-1588-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-85
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan &
Shamsuddin Nawab

সেবা প্রকাশনী

পঞ্চাশ টাকা

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম:
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর
আমেরিকান নিগ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবার—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

গুপ্তধনের সন্ধানে/শামসুদ্দীন নওয়াব ৭-৯৫
শয়তানের জলাভূমি/রকিব হাসান ৯৬-১৭১
সেরা গোয়েন্দা/শামসুদ্দীন নওয়াব ১৭২-২০৮

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১ (তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা) ৫৯/-
তি. গো. ভ. ১/২ (ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো) ৫৯/-
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত) ৫০/-
তি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৩/১ (হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি) ৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১ (ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২) ৫০/-
তি. গো. ভ. ৪/২ (ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব) ৪৮/-
তি. গো. ভ. ৫ (ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল) ৫৬/-
তি. গো. ভ. ৬ (মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭ (পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ) ৫৬/-
তি. গো. ভ. ৮ (আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ) ৫২/-
তি. গো. ভ. ৯ (পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল) ৫২/-
তি. গো. ভ. ১০ (বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১) ৫৪/-
তি. গো. ভ. ১১ (অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো) ৪৯/-
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া) ৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু) ৪৮/-
তি. গো. ভ. ১৪ (পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন) ৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর) ৫২/-
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ) ৫৭/-
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ) ৫০/-
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড) ৫২/-
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া) ৫৬/-
তি. গো. ভ. ২০ (খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ) ৫০/-
তি. গো. ভ. ২১ (ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার) ৫০/-
তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন) ৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে) ৪৯/-
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ) ৫৪/-
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা) ৪৯/-

ত্তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৪৭/-
ত্তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৫৪/-
ত্তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪৭/-
ত্তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪৫/-
ত্তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৫/-
ত্তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, প্রেট রবিনিয়োসো)	৪৫/-
ত্তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, প্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
ত্তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৪৪/-
ত্তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৪৩/-
ত্তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, প্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪৪/-
ত্তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৮/-
ত্তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৪৪/-
ত্তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৪৪/-
ত্তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪৭/-
ত্তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
ত্তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কি রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৪১/-
ত্তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৪১/-
ত্তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, গোষা ডাইনোসর)	৪৪/-
ত্তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৪৪/-
ত্তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৮/-
ত্তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৯/-
ত্তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৪০/-
ত্তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
ত্তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্ণদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৭/-
ত্তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৯/-
ত্তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক)	৩৫/-
ত্তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৯/-
ত্তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৫/-
ত্তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৫/-
ত্তি. গো. ভ. ৬০	(উটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, উটকি শত্রু)	৩৬/-
ত্তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে ত্তি. গো.)	৩৬/-
ত্তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৬/-
ত্তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৪০/-
ত্তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৮/-
ত্তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+কেরাটনের কবরে)	৩৬/-
ত্তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৬/-
ত্তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৬/-
ত্তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+উটকি গোয়েন্দা)	৩৫/-
ত্তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+সুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
ত্তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-
ত্তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রক্তের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	৩৯/-

ভি. গো. ভ. ৭২	(ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি)	৪৭/-
ভি. গো. ভ. ৭৩	(পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভূতুড়ে ঘড়ি)	৩৯/-
ভি. গো. ভ. ৭৪	(কাওরাই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউনভিলে গণ্ডগোল)	৫১/-
ভি. গো. ভ. ৭৫	(কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ক্যাস্টাসিল্যান্ড)	৪১/-
ভি. গো. ভ. ৭৬	(মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য)	৪১/-
ভি. গো. ভ. ৭৭	(চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা)	৫০/-
ভি. গো. ভ. ৭৮	(চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর)	৩৭/-
ভি. গো. ভ. ৭৯	(লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাঁটি+তুষার মানব)	৩৬/-
ভি. গো. ভ. ৮০	(মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি)	৪৩/-
ভি. গো. ভ. ৮১	(কালোপর্দার অন্তরালে+ভয়াল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক)	৪৭/-
ভি. গো. ভ. ৮২	(বনদস্যুর কবলে+গাড়ি চোর+পুতুল-রহস্য)	৪৪/-
ভি. গো. ভ. ৮৩	(খনিতে বিপদ!+গুহা-রহস্য+কিশোরের নোটবুক)	৪৪/-
ভি. গো. ভ. ৮৪	(মৃত্যুগুহায় বন্দি+বিষাক্ত ছোবল+ঔটকি রাজকুমার)	৪৭/-
ভি. গো. ভ. ৮৫	(গুপ্তধনের সন্ধানে+শয়তানের জলাভূমি+সেরা গোয়েন্দা)	৫০/-
ভি. গো. ভ. ৮৬	(পাহাড়ে বন্দি+বারমুডা অভিযান+রহস্যের হাতছানি)	৪২/-
ভি. গো. ভ. ৮৭	(মমিরহস্য+ভাইরাস আতঙ্ক+তালিকা-রহস্য)	৪২/-
ভি. গো. ভ. ৮৮	(পিছনে কে?+খুনে তান্ত্রিক+কালো আলখেল্লা)	৪১/-
ভি. গো. ভ. ৮৯	(বোম্বেটের সিন্দুক+মারাত্মক বিপদ+হারানো তলোয়ার)	৪২/-
ভি. গো. ভ. ৯০	(হিমগিরিতে সাবধান!+সাগরে শঙ্কা+খেপা জাদুকর)	৪৪/-
ভি. গো. ভ. ৯১	(ক্যামেরার চোখ+ভ্যাম্পায়ারের ছায়া+ভূতুড়ে বাড়ি)	৪১/-
ভি. গো. ভ. ৯২	(জিন্দালাশের পিছে+অগ্নিগিরি অভিযান+গবলিনের কবলে)	৫০/-
ভি. গো. ভ. ৯৩	(পিশাচের আস্তানা+উড়ন্ত রবিন+অন্য ভুবনের কিশোর)	৩৮/-
ভি. গো. ভ. ৯৪	(সময়সুড়ঙ্গে আবার+হিমপিশাচের কবলে+ছায়ামানবী)	৪১/-
ভি. গো. ভ. ৯৫	(মরণসঙ্কেত+জলদস্যুর গুপ্তধন+গোলমাল)	৪৮/-
ভি. গো. ভ. ৯৬	(সাগরতীরে তিন গোয়েন্দা+দ্বীপরহস্য+দুর্গরহস্য)	৪৮/-
ভি. গো. ভ. ৯৭	(ভেল্কিবাজ+মঙ্গলের অতিথি+প্রেতচক্র)	৩৬/-
ভি. গো. ভ. ৯৮	(ঝড়ের দ্বীপ+জিন্দালাশের মুখোমুখি+তুষারগিরি-রহস্য)	৪০/-
ভি. গো. ভ. ৯৯	(রুদ্র সাগর+মূর্তি চোর+মহাকাশের দূত)	৪১/-
ভি. গো. ভ. ১০০	(নিষুমপুরের কাণ্ড+তুষারদানো+খুলিগুহার রহস্য)	৪১/-
ভি. গো. ভ. ১০১	(প্রেত বৈমানিক+ছায়া কালো কালো+বাতিঘরের পিশাচ)	৪১/-
ভি. গো. ভ. ১০২	(গুপ্তদূত+গ্রহান্তরের বন্ধু+জাদুঘরের দানব)	৩৭/-
ভি. গো. ভ. ১০৩	(মাদক-রহস্য+গুপ্তধনের নকশা+ভয়ের মুখোশ)	৪৪/-
ভি. গো. ভ. ১০৩/২	(অভিশপ্ত পাথর+দানবের চোখ+হারানো মমি)	৩৬/-
ভি. গো. ভ. ১০৪	(নিখোঁজ মেয়ে+মৃত নগরী+বনের খাঁচায়)	৪৪/-
ভি. গো. ভ. ১০৪/২	(গোরস্থানে সাবধান!+নেকড়ের বনে+খাবারচোর)	৪৪/-
ভি. গো. ভ. ১০৫	(ভূতুড়ে ট্রেন+ইয়েতি-রহস্য+ক্যাপ্টেন কিডের গুপ্তধন)	৪৪/-
ভি. গো. ভ. ১০৫/২	(লকেট-রহস্য+ঔটকির পেট শো+পান্না-রহস্য)	৩৮/-
ভি. গো. ভ. ১০৬	(ভূতুড়ে শহর+রোবট-রহস্য+ইচ্ছাপূরণ)	৪৭/-
ভি. গো. ভ. ১০৬/২	(লাটসাহেব+পাজি বিড়াল+ভৌতিক দুর্গ)	৫৯/-
ভি. গো. ভ. ১০৭	(যন্ত্রপিশাচ+বিভীষণের জাগরণ+কঙ্কাল-রহস্য)	৫০/-
ভি. গো. ভ. ১০৭/২	(টেরোড্যাকটিলের থাবা+পাহাড়ী দানো+রাজকুমারের খোঁজে)	৩৮/-
ভি. গো. ভ. ১০৮	(অভিশপ্ত হোটেল+সবুজ মৃত্যু+হারকিউলিস-রহস্য)	৪১/-

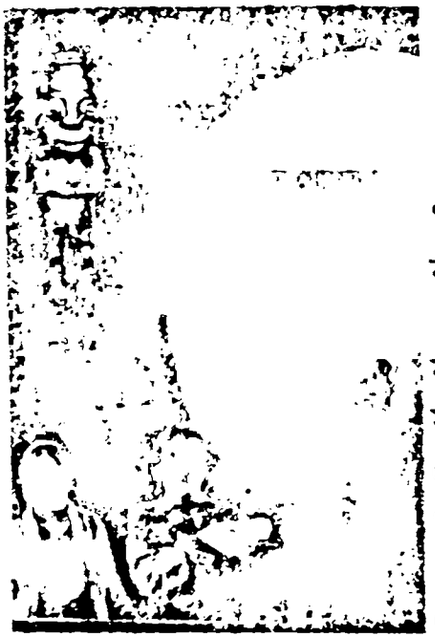

গুপ্তধনের সন্ধানে

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

'এটার কথাই বলেছিলাম, কিশোর। এরই রহস্য ভেদ করতে হবে। আমি এটাকে বলি বাঁদর-রহস্য।'

কিশোরের দিকে থালার মতো গোল জিনিসটা বাড়িয়ে ধরল লিন্ডা পিনোশে। স্কুলের ছুটিতে ফিরে যাবে ও পেরুর রাজধানী লিমায়, নিজের দেশে। একই ক্লাসে পড়ে কিশোর আর লিন্ডা, ধীরে ধীরে পরিচয়টা আন্তরিকতায় গড়িয়েছে।

'বাবা এটা পাঠিয়ে দিলেন। জানিয়েছেন দু'বার এটা চুরির চেষ্টা হয়। কুকুরটার কারণে চোর নিয়ে যেতে পারেনি প্লাকটা। আমেরিকায় এটা নিরাপদে থাকবে ভেবেছেন বাবা। একটা চিঠিও এসেছে হুমকি দিয়ে। এল গ্যাটো নামের এক লোক প্লাকটা চেয়েছে। না দিলে নাকি ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'এল গ্যাটো মানে কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বিড়াল,' জবাব দিল লিন্ডা।

পনেরো ইঞ্চি ব্যাস হবে জিনিসটার। এক ইঞ্চি পুরু। দেখতে অনেকটা রুটি বেলার কাঠের পিঁড়ির মতো। হাতে নিয়ে ওটা উল্টেপাল্টে দেখল কিশোর। লিন্ডার পাশে লিভিংরুমে বসে আছে ও।

চাকতিটার কাঠ অনেক পুরোনো। ভেতরে নক্সা করা। সময়ে নক্সা কিছুটা হালকা হয়ে গেলেও এখনও মোটামুটি স্পষ্টই আছে।

'একটা বাঁদরের ছবি দেখছি,' বলল কিশোর। 'লেজটা কাটা। আরও কয়েকটা রেখা বাঁদরের গা থেকে চাকতির প্রান্তে গিয়ে মিশেছে।' লিন্ডার দিকে তাকাল ও। 'তোমার কি ধারণা, গোপন কোন রহস্য আছে এই ছবিতে? যেমন ধরো: গুপ্তধন-টন?'

'তিনশো বছর ধরে এটা আছে আমাদের পরিবারে,' স্প্যানিশ সুরে ইংরেজিতে বলল লিন্ডা। 'আমার তো ধারণা এসব আঁকিবুকি দিয়ে গুপ্তধনের সন্ধানই জানানো হয়েছে। মাঝখানে হারিয়ে গিয়েছিল। বিশ বছর আগে বাবা আবার দাদার ট্রাঙ্কে খুঁজে পায়।'

আবার ছবিটা দেখল কিশোর। একটা বাঁদর কুঁজো হয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

'উল্টোদিকটা দেখো,' বলল লিন্ডা। 'ওদিকটা আরও রহস্যময়।'

ওল্টাল কিশোর। বেশ কয়েকটা রেখা চাকতির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। মাঝখানে একটা শব্দফাঁদ। গভীর মনোযোগ দেয়ায় কিশোরের ভ্রূ কুঁচকে গেল। বিড়বিড় করে বলল, 'মনে হয় এটার ওপর কাজ করতে ভাল

লাগবে আমার। প্রথম কাজ এটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে রেখে পরীক্ষা করে দেখা। এক কাজ করো না, আজ রাতে আমাদের বাসায় খাও। চাকতিটাও নিয়ে যাওয়া যাবে। পরীক্ষা করে দেখতে পারব।'

'খালাকে বলে দেখি।' লিভিং রুমের দিকে পা বাড়াল লিন্ডা।

রকি বীচের স্কুলে পড়তে এসে খালা-খালুর বাসায় উঠেছে লিন্ডা।

কিশোরদের বাড়িতে রাতে খাওয়ার কথা বলতে আপত্তি করলেন না সেনিয়রা হান্টিংটন। কিশোরকে বললেন, 'তুমি লিন্ডার সঙ্গে থাকছ বলে চিন্তা করছি না। তবে আমি চাই না ও একা বাড়ি ফিরুক। ক'দিন আগে ভীষণ ভয় পেয়েছিল ও। আমি ওর খালুকে বলব ওকে নিয়ে আসতে।'

'তার দরকার হবে না, সেনিয়রা হান্টিংটন,' বলল কিশোর। 'আমিই ওকে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

সেনিয়রা হান্টিংটনের চেহারা দেখে মনে হলো তিনি স্বস্তি পেয়েছেন। বললেন, 'কেন আমি চাই না ও একা আসুক সেটা বোধহয় বলা দরকার। গত কয়েকদিন কয়েকবার ওকে অনুসরণ করা হয়েছে।'

'তাই?' একটু বিস্মিত হলো কিশোর।

আস্তে করে মাথা দোলালেন সেনিয়রা হান্টিংটন।

'খামোকা তুমি ভয় পাচ্ছ, আন্টি,' প্রতিবাদের সুরে বলল লিন্ডা।

কোনও একটা দল বা নির্দিষ্ট কোন লোক লিন্ডাকে অনুসরণ করছে প্লাকের জন্যে, আন্দাজ করল কিশোর। মুখে বলল, 'লিন্ডা, এল গ্যাটো হুমকি দিয়ে লিমায় চিঠি দিয়েছিল। এল গ্যাটো শুনে অন্য কিছু কি তোমার মনে পড়ছে?'

খানিক চিন্তা করে মাথা নাড়ল লিন্ডা। লিমায় তাদের বাড়িতে কোন বিড়াল নেই। বলল, 'কিন্তু চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। আর কয়েকদিন পরই বাড়ি ফিরছি আমি।'

সেনিয়রা হান্টিংটনের কাছ থেকে বিদায় নিল কিশোর, লিন্ডাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো কিশোর। সেনিয়রা হান্টিংটনের বাড়িটা নদীর তীরে। ঢাল ধরে হাঁটছে ওরা, পাশ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে নদীর নীল জল। হাতে শক্ত করে চাকতিটা ধরে রেখেছে লিন্ডা।

ড্রাইভওয়েতে নুড়িপাথরের ওপর হোঁচট খেল ও, পিছলে গেল। ভারসাম্য রাখতে গিয়ে হাত থেকে ছুটে গেল চাকতি। মাটিতে পড়েই গড়াতে শুরু করল, ঢাল বেয়ে নেমে গেল নদীতে। ঝপাস করে পানিতে পড়েই স্রোতে ভেসে যেতে শুরু করল।

'হায়-হায়!' মাটিতে বসে অসহায় চোখে ওটাকে চলে যেতে দেখছে লিন্ডা।

চট করে নিজেকে সামলে নিয়েছে কিশোর, শেষ পর্যন্ত ধাওয়া করেও চাকতিটা ধরতে পারল না। চট করে জুতো খুলে ফেলেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। দ্রুত সাঁতার কেটে এগোল ওটার দিকে। স্রোত ওকে সাহায্য করল। পাঁচ মিনিট পর চাকতিটা নিয়ে তীরে উঠল কিশোর।

লিন্ডা বলল, 'জানি না কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব। মনে হচ্ছিল জিনিসটা সত্যি সত্যি হারালাম।' কিশোরের ভেজা কাপড় দেখে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল, 'বাড়ি চলো, খালুর কাপড় পরবে। ভেজা কাপড়ে থাকলে সর্দি লেগে যেতে পারে।'

'বাড়ি পৌঁছে কাপড় পাল্টে নেব,' বলল কিশোর। কাঠের চাকতি লিন্ডাকে দিয়ে হাতের ইশারা করে হাঁটতে শুরু করল।

পাঁচ মিনিট পর স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছে গেল ওরা। বেল টিপতেই দরজা খুললেন মেরি চাচী। কিশোরের সঙ্গে লিন্ডাকে দেখে হাসি ফুটল তাঁর মুখে। খুশি হলেন কিশোর লিন্ডাকে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছে শুনে।

দেখার মতো দারুণ একটা জিনিস আছে, চাচী,' ডাইনিং রুমের দিকে পা বাড়িয়ে বলল কিশোর। টেবিলের ওপর চাকতিটা রাখল লিন্ডা। চাচীকে খুলে বলল এটা তিনশো বছর ধরে ওদের পরিবারে আছে, শব্দফাঁদের মানে বের করতে পারলে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। উৎসাহ নিয়ে শুনলেন মেরি চাচী।

এই ফাঁকে দোতলা থেকে কাপড় পাল্টে এলো কিশোর। হাতে একটা শক্তিশালী ম্যাগনিফায়িং গ্লাস। বাঁদরের ছবির দিকটা আগে পরীক্ষা করে দেখল ও।

'কোনার দিকে একটা ঝাপসা শব্দ দেখা যাচ্ছে,' কিছুক্ষণ পর বলল ও, 'হয়তো কোন নাম। আগুস্তো লেখা আছে।'

'আগুস্তো, আমাদের এক পূর্বপুরুষের নাম,' উত্তেজিত স্বরে জানাল লিন্ডা। 'বড় শিল্পী ছিলেন। আজকের আগে জানতাম না ওটাতে তাঁর নাম লেখা আছে।'

'হয়তো তিনিই ছবিগুলো এঁকেছেন,' বলল কিশোর। 'তাঁর ব্যাপারে আর কি জানো?'

'লিমা থেকে অদৃশ্য হয়ে যান তিনি,' বলল লিন্ডা। 'তারপর কেউ আর তাঁর কোন খোঁজ পায়নি।'

এপিঠে নতুন আর কিছু চোখে পড়ল না কিশোরের। এবার ওপিঠ ওল্টাল। 'হুম,' বিড়বিড় করে বলল, 'কি যেন অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে।'

'কি?' ঝুঁকে এলো লিন্ডা।

'মাঝখানের খোদাই করা জায়গাটা শব্দের একটা অংশ। একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে। ওপরের দিকের কয়েকটা অক্ষর পড়া যাচ্ছে তবু। ওগুলোও শব্দফাঁদের অংশ। দেখো তো, লিন্ডা, কি মনে হয় তোমার।' ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা লিন্ডার হাতে দিল ও।

ওটার ভেতর দিয়ে গভীর মনোযোগে তাকাল লিন্ডা। একটু পর উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'প্রথম চারটে অক্ষর দিয়ে লিখেছে মোনো। স্প্যানিশ ভাষা। মোনো মানে বাঁদর। আর কিছু বুঝতে পারছি না। বড় বেশি খয়ে গেছে।'

কিশোর বুঝতে পারল কাজ মাত্র শুরু হলো। এই রহস্য ভেদ করতে এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সহজ হবে না কাজটা।

রাশেদ চাচা ফেরার পর ডিনার সারল ওরা। খাওয়ার ফাঁকে চলল শব্দফাঁদের

রহস্য নিয়ে আলোচনা। 'কিশোর, বুঝতে পারছি আরেকটা রহস্যের খোঁজে আছিস তুই,' বলে অফিসে চলে গেলেন রাশেদ চাচা। মেরি চাচীও ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। একটু পরেই তিনি যাবেন অসুস্থ বান্ধবীকে দেখতে, সেজন্যে তৈরি হতে হবে।

'আসল সূত্র আছে শব্দফাঁদের ভেতর,' বলল চিন্তিত কিশোর।

কিছুক্ষণ পর লিন্ডার বিদায়ের সময় হলে মেয়েটা বলল কিশোরের কাছে থাকুক চাকতিটা। অবসরে ওটার ওপর কাজ করতে পারবে ও।

চকচক করে উঠল কিশোরের চোখ। বলল, 'আমার ওপর অনেক বিশ্বাস রাখছ তুমি। দেখি তোমার কোন উপকারে আসতে পারি কিনা। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। তবে যদি ব্যর্থ হই তাহলে হতাশ হয়ো না যেন।'

হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় আসতে ঘাড় কাত করে কিশোরের দিকে তাকাল লিন্ডা। 'কিশোর, দারুণ একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। তুমি, মুসা আর রবিন কি যাবে আমার সঙ্গে লিমায়, আমাদের বাড়িতে? রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাহলে সময় পাবে বেশি।'

'সময় আসলেই লাগবে,' স্বীকার করল কিশোর। তারপর বলল, 'সত্যি দারুণ হতো যেতে পারলে। অনেক ধন্যবাদ। কবে ফিরে যাচ্ছ তুমি?'

'আগামী পরশু।' হাসল লিন্ডা। 'সত্যি যদি উদ্‌ঘাটনের মতো কোন রহস্য নাও থাকে তাহলেও তোমরা বেড়াতে এলে খুব খুশি হবো আমি। দারুণ জায়গা পেরু, তোমাদের ভাল লাগবে। পেরুতে প্রাচীন ইন্ডিয়ানদের ধ্বংসস্তূপ আছে, স্প্যানিশ আমলের প্রাসাদ আছে। মরুভূমি, পাহাড়–কি নেই। খাওয়া আর কেনার জন্যে জিনিসের অভাব হবে না। চলো না তোমরা?'

'একমিনিট,' বলে ঘর থেকে বের হয়ে এলো কিশোর। স্কুলের ছুটিতে বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু চাচার অনুমতি দরকার। অফিসেই তাঁকে পেল ও।

জিজ্ঞেস করতেই কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, 'যাবি তো যা। সঙ্গে মুসা আর রবিনকে নিতে পারিস কিনা দেখ। এই বয়সে না ঘুরলে, না শিখলে, ঘুরবি আর শিখবি কবে?'

চাচার অনুমতি তো পাওয়া গেল। কিন্তু চাচীর? সেই সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল। চাচা বললেন, 'তোর চাচীকে আমি বুঝিয়ে দেব, আপত্তি করবে না।'

'ঠিক আছে।' ঝড়ের বেগে চাচার অফিস থেকে বের হলো উৎফুল্ল কিশোর। ঠিক করেছে কালকে সকালে রবিন আর মুসাকে জানাবে পেরুতে যাওয়ার দাওয়াতের কথা।

লিন্ডাকে বাড়ি দিয়ে এসে দেখল চাচা ডাইনিং টেবিলে বসে আছেন। টেবিলের ওপর চাকতিটা রেখে গিয়েছিল কিশোর। টেবিলে এখন চোখ পড়তেই থমকে গেল ও।

জিনিসটা নেই!

দুই

'লিন্ডার প্লাকটা নেই!' সামলে নিয়ে বলে উঠল কিশোর। 'চুরি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই!'

আফসোস হলো ওর এভাবে টেবিলের ওপর জিনিসটা অসর্তকতার সঙ্গে রেখে যাওয়ার জন্যে। রাশেদ চাচা বললেন, 'তোর চাচী হয়তো অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, চাচা, আমাদের আগেই বেরিয়ে গেছে চাচী। তখনও টেবিলের ওপর ছিল ওটা।'

বোরিস আর রোভারকে ডাক দিয়ে জানা গেল কাউকে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকতে দেখেনি তারা। তাদের বিদায় করে দিলেন রাশেদ পাশা।

চাচা-ভাতিজা খুঁজে দেখতে শুরু করলেন আরও কিছু খোয়া গেছে কিনা।

প্রথমে দেখা হলো মেরি চাচীর শখের রুপোর বাটি আর ডিনার সেট থাকে যে ড্রয়ারটা। কোন কিছু চুরি গেছে বলে মনে হলো না। নিচতলা আর দোতলা খুঁজে দেখা হলো। না, মূল্যবান কিছুই চুরি যায়নি।

সামনের দরজায় চাবি ঘোরানোর আওয়াজ হলো। মুহূর্তের জন্যে উত্তেজিত হলো ওদের স্নায়ু। তারপর মেরি চাচীকে ভেতরে ঢুকতে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

'কি ব্যাপার?' তাঁর দিকে অদ্ভুত ভাবে দু'জনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন মেরি চাচী। 'হান্নাকে দেখে এলাম। এখন বেশ ভাল আছে।'

'চাচী, প্লাকটা চুরি হয়ে গেছে,' বলল গম্ভীর কিশোর। 'যেটা লিন্ডা আমার কাছে রেখে গিয়েছিল।'

মনে হলো না মেরি চাচী বিস্মিত হয়েছেন। শান্ত তাঁর চেহারা। বললেন, 'তোদের অস্থির করে দিয়েছি, তাই না? পার্সটা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওটা নিতে ফিরে এসে দেখি টেবিলের ওপর প্লাক পড়ে আছে। ভাবলাম মূল্যবান জিনিস, সরিয়ে রাখা দরকার। তাছাড়া লিন্ডাকে অনুসরণ করা হচ্ছিল বলেছিস তুই। কে যেন ওকে চিঠিও দিয়েছে। তাই চাকতিটা লুকিয়ে ফেললাম।'

ডাইনিং রুমের শোকেসের নিচে বেশ কয়েকটা ম্যাট্রেস ভাঁজ করে রাখা আছে। ওগুলোর তলা থেকে প্লাক বের করলেন মেরি চাচী।

ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন রাশেদ পাশা, মৃদু মৃদু হাসছেন। বললেন, 'তুমি দেখি আমাদের সঙ্গে থেকে থেকে পাকা গোয়েন্দা হয়ে গেলে! আমি আর কিশোর বহু খুঁজেও জিনিসটা বের করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে তুমিই একমাত্র জিনিসটা লুকিয়ে রাখার কথা ভেবেছ!'

দুশ্চিন্তা কেটে যাওয়ায় কিশোরের মুখেও হাসি ফুটল। সায় দিয়ে ও বলল, 'এখন তো মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে চাচী আমাদের চেয়ে ভাল গোয়েন্দা হতে পারবে।'

ভোর বেলায় উঠল কিশোর। আগেই ঠিক করে রেখেছিল, ঘুম থেকে উঠেই ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাতের কাছে একটা স্প্যানিশ ডিকশনারি রেখেছে। ওটা থেকে বোঝার চেষ্টা করল মুছে যাওয়া শব্দগুলো কি হতে পারে। অনেকক্ষণ পর ক্ষান্ত দিল। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সকালে নাস্তার টেবিলে নিজের ব্যর্থতার কথা চাচাকে বলল কিশোর।

স্মিত হাসলেন চাচা, বললেন, 'হতাশ না হয়ে লেগে থাক্। ঠিকই অর্থ বেরোবে।'

নাস্তা সারার পর মেরি চাচী আর রাশেদ চাচা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিশোর গেল টেলিফোন করতে। মুসা আর রবিনকে জানাতে হবে যে ওরা লিমায় যাওয়ার দাওয়াত পেয়েছে।

ওর কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল দুই গোয়েন্দা, জানাল সামনাসামনি আরও জানার জন্যে যতো দ্রুত সম্ভব চলে আসবে।

মুসা বলল, 'আমার অবশ্য একটু দেরি হতে পারে। সকালে জুডোর ক্লাস আছে। তবে চলে আসব যতো তাড়াতাড়ি পারি।'

হাসল কিশোর, বলল, 'এমন কিছু শেখার চেষ্টা করো যেটা আমাদের কাজে আসবে।'

'যেমন শত্রুকে পাহাড় থেকে লাথি মেরে ফেলে দেয়া?'

'না, ভূতের সঙ্গে লড়াই করে জেতা।'

ফোন রেখে দিল কিশোর।

দু'ঘণ্টা পরে পাঁচ মিনিটের এদিক ওদিকে এলো রবিন আর মুসা। দু'জনই কৌতূহল নিয়ে নক্সা করা কাঠের চাকতিটা দেখল।

মুসা বলল, 'আমার তো বেশ পছন্দই হচ্ছে লেজকাটা বাঁদরটাকে। কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছে!'

'আমার কিন্তু উল্টো দিকটা বেশি রহস্যময় মনে হয়েছে,' বলল রবিন। 'সবগুলো অক্ষর থাকলে ভাল হতো।'

রবিনের হাতে ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা দিতে যাচ্ছিল কিশোর, এমন সময়ে মিষ্টি সুরে বেজে উঠল সদর দরজার বেল। দরজা খুলল কিশোর। বারান্দায় বছর তিরিশেকের এক লোক দাঁড়িয়ে। এতোই চিকন যে দেখলে মনে হয় আইসক্রিমের কাঠি।

'তুমিই কি কিশোর পাশা?'

'হ্যাঁ।'

কথা না বলে কোট ফাঁক করল লোকটা। লাইনিঙে একটা ব্যাজ দেখতে পেল কিশোর। ওটায় লেখা আছে: *ডিটেকটিভ, এল. এ. পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।*

'ভেতরে আসতে পারি?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল ডিটেকটিভ।

সরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারা করল কিশোর। 'আমি হেনরি ওয়াল্টার,' নিজের পরিচয় দিল লোকটা। 'প্লাকটা নিয়ে যাবার জন্যে একটা কোর্ট অর্ডার আছে আমার কাছে।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। কিশোরকে দেখানোর কোন ইচ্ছে যে তার নেই সেটা বোঝা গেল ওটা আবার পকেটে রাখতে দেখে।

কথা শুনতে এগিয়ে এসেছে মুসা আর রবিন। রবিনের হাতে প্লাক।

'আমি বুঝতে পারছি না পুলিশের কেন এই প্লাক দরকার,' বলল কিশোর। 'এটা তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াল্টার। 'তা তো আমি বলতে পারি না। নির্দেশ দিলে সেটা পালন করতে হবে সেই ট্রেনিংই আমাদের দেয়া হয়। জিনিস্টা দিয়ে দাও, তাড়া আছে আমার।'

সন্দেহ জেগে উঠল কিশোরের মনে। লোকটাকে দেখে পছন্দ হয়নি ওর। তাছাড়া যেরকম তাড়াহুড়ো করছে সেটাও স্বাভাবিক নয়।

সরাসরি ওয়াল্টারের চোখের দিকে তাকাল ও। বলল, 'আরও জোরাল কোন প্রমাণ না পেলে আপনাকে আমি ওটা দেব না। বসুন, আমি পুলিশ চীফকে ফোন করছি। তিনি যদি আপনার কথা কনফার্ম করেন তাহলে ওটা পাবেন।'

ওয়াল্টারের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। রাগী স্বরে বলল, 'দেখো ছোকরা, বেশি বাড়াবাড়ি করছ কিন্তু তুমি। ফালুত প্যাচাল ছেড়ে যা চাইছি দিয়ে দাও।'

কথা শেষ করে দেরি করল না লোকটা, রবিনের হাত থেকে ছোঁ মেরে চাকতিটা নিয়েই দরজার দিকে দৌড় দিল। যেতে পারল না বেশিদূর। বিদ্যুতের গতিতে সামনে বাড়ল মুসা, দরজার কাছে পৌঁছে গেল। কলার চেপে ধরল ওয়াল্টারের, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে নিখুঁত ভাবে জুডোর থ্রো করল। ঘরের ভেতর উড়ে এসে দড়াম করে চিত হয়ে কার্পেটের ওপর পড়ল লোকটা। হুশ করে বুক থেকে বাতাস বেরিয়ে গেল তার। কি হয়েছে বুঝতেও পারেনি। ফ্যালফ্যাল করে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওঠার শক্তি নেই।

মুচকি হাসল মুসা। মেঝে থেকে প্লাকটা তুলে নিয়ে কিশোরের হাতে দিল। চিন্তিত হয়ে পড়েছে কিশোর। যা হলো তাতে ঝামেলা হতে পারে। লোকটা হয়তো সত্যি সত্যি পুলিশ অফিসার।

ওয়াল্টারকে উঠতে সাহায্য করল কিশোর। 'বাপরে!' কোমরে হাত দিয়ে ককিয়ে উঠল লোকটা। প্লাকের কথা আর বললই না, পেছনে একবারও না তাকিয়ে বিমর্ষ চেহারায় বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

কিশোর দরজা বন্ধ করার পর মুসা বলল, 'পাহাড় থেকে ব্যাটাকে ফেলতে পারিনি বটে, কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছি আছাড় খেলে কেমন লাগে। আমার জুডো তোমাদের পছন্দ হয়েছে?'

রবিনকে চিন্তিত দেখাল। মৃদু স্বরে ও বলল, 'লোকটা হয়তো প্রতিশোধ নিতে চাইবে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। বলল, 'হয়তো এই ওয়াল্টারই লিন্ডাকে অনুসরণ করছিল।'

'তাহলে কি এই লোকই লিন্ডাকে প্লাক চুরির সঙ্গে জড়িত?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হতে পারে।'

চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করল কিশোর। কি ঘটেছে জানাল। ওকে মাথা দুলিয়ে ওপ্রান্তের বক্তব্য শুনতে দেখল রবিন আর মুসা। চীফের কথা শেষ হতে কিশোর বলল, 'বয়স হবে তিরিশ মতো। রোদে পোড়া বাদামী চামড়া। ছোট ছোট কালো চুল। অসম্ভব চিকন লোকটা।'

রিসিভার নামিয়ে রাখার পর বন্ধুদের দিকে ফিরল ও। 'হেনরি ওয়াল্টার নকল লোক। ডিটেকটিভ স্কোয়াডে ওই নামে কোন লোকই নেই।' মিস্টার ফ্লেচার জানালেন এখনই লোকটাকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা নেবেন।' মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'চীফ তোমাকে তাঁর তরফ থেকে ধন্যবাদ দিতে বলেছেন। জুডোর কৌশলের জন্যে।'

'হয়তো আরও অনেক কাজে লাগবে জুডো,' হাসল মুসা। 'পটকান মারতে পারলে দারুণ মজা লাগে।'

'আমাদের প্রথম কাজ শব্দফাঁদের মানে বের করা,' মনে করিয়ে দিল রবিন।

বিকেলে রবিন আর মুসার ফোন পেল কিশোর। দু'জনই জানাল বাড়ি থেকে অনুমতি আদায় করতে পেরেছে। ওর সঙ্গে পেরুতে যাবে ওরা। খবরটা লিন্ডাকে জানিয়ে দিল কিশোর। খুব খুশি হলো লিন্ডা। 'চমৎকার লাগবে তোমাদের, দেখো,' বলল ও।

ভাগ্য ভাল যে তিন গোয়েন্দার প্রত্যেকেরই পাসপোর্ট আপটু ডেট করা আছে। প্লেনের টিকেট কেটে দিলেন রাশেদ চাচা। কিশোরকে বললেন, 'হেনরি ওয়াল্টার এখনও ধরা পড়েনি। তোদের পেরুতে যাওয়াই ভাল। ওখানে বিপদ হবে না।'

'আমি একটা কথা ভাবছি,' বলল চিন্তিত কিশোর। 'ফ্লাইটের আগের রাতেই এয়ারপোর্টের মোটেলে গিয়ে উঠলে কেমন হয়? কারও যদি অনুসরণ করার ইচ্ছে থাকে তাহলে সে বাড়ির ওপর চোখ রাখবে। যখন বুঝবে আমরা নেই ততোক্ষণে প্লেনে চেপে বসব আমরা।'

'গুড আইডিয়া,' সায় দিলেন রাশেদ পাশা। 'তাই করিস

পরদিন সকালে হাজির হয়ে গেল মুসা আর রবিন। একটু পরেই লিন্ডাও এলো। সবাইকে আপ্যায়ন শেষে কিশোর বলল, 'আমরা যেহেতু পেরুতে যাচ্ছি, আমার মনে হয় প্রাচীন পেরুর আর্টিফ্যাক্ট সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে যাওয়া দরকার। কারও আপত্তি না থাকলে মিউযিয়ামে যাওয়া যায়। পেরুর গ্যালারিটা একবার ঘুরে দেখলে উপকার হবে, ভালও লাগবে।'

আপত্তি করল না কেউ

কপাল ভাল ওদের। মিউযিয়ামের গাইড কয়েকজন ট্যুরিস্টকে পেরুর গ্যালারি দেখাচ্ছে, তাদের দলে জুটে যেতে পারল।

একনাগাড়ে কথা বলছে গাইড। হরেক রকম তথ্য জানাচ্ছে।

'প্রাচীন পেরুর ইন্ডিয়ানরা, বিশেষ করে ইনকাদের কাছে সূর্যই ছিল রক্ষাকর্তা দেবতা। ইনকা জাতির রাজাকে বলা হতো ইনকা। ধারণা করা হতো সরাসরি সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া পবিত্র ক্ষমতা বলে দেশ শাসন করত সে। মন দিয়ে দেখুন আপনারা, ছবিগুলোতে সূর্যের প্রাধান্য দেখতে পাবেন।'

বেশিরভাগই মাটি দিয়ে তৈরি সাজানোর জিনিস। কারুকার্যময়। মূর্তিও আছে অনেক। কোনটা উবু হয়ে আছে, কোনটা হাঁটার ভঙ্গিতে। কিছু মূর্তি আছে যেগুলো হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে বসে আছে। 'ওগুলো যেভাবে বসে আছে সেভাবেই মমি করে রাখত প্রাচীন ইনকারা,' গাইড জানাল।

পরের ঘরটাতে সব সোনার তৈরি নানা ধরনের গহনা। নেকলেস, কানের দুল, বালা—নানা মূল্যবান পাথর বসানো।

'খাইসে,' বলে উঠল মুসা। ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'মনে তো হচ্ছে ভূতের মুখোশ!'

এগিয়ে গেল ওরা। কার্ডে লেখা আছে ওগুলো কি।

'শেষকৃত্যে লাশের জন্যে ব্যবহৃত মুখোশ,' পড়ল কিশোর।

কাছে দাঁড়ানো এক লোক জানাল মমির মুখের ওপর ওগুলো রাখা হতো না মাথার ওপর রাখা হতো। 'কেন তা কেউ জানে না।'

লিন্ডা বলে উঠল, 'আরে, ওই মুখোশটা দেখেছ? ঠিক যেন লামার চেহারা। কারও পোষা লামার জন্যে বানিয়েছিল?'

'লামা কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'উটের মতো একটা প্রাণী,' জানাল বইয়ের পোকা রবিন।

কাছে দাঁড়ানো লোকটা হাসল। বলল, 'হয় লামার মুখোশ, নাহলে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কারও, যার চেহারাটা ছিল ঠিক লামার মতো।'

কিশোর আগ্রহ বোধ করল অন্য একটা আর্টিফ্যাক্ট দেখে। দুটো হাত আর পা, নিখুঁত সোনার তৈরি। ভদ্রলোক জানালেন ওগুলো যাজকের ব্যবহার করা হাত আর পায়ের মোজা। জিনিসগুলোয় একটা খুঁত আছে। আঙুলের নখগুলো কালো আর ক্ষয়ে যাওয়া। 'ওগুলো রুপোর তৈরি,' বললেন ভদ্রলোক। 'প্রথমে কালো হয়ে যায়, তারপর ক্ষয়ে যেতে শুরু করে।'

একটা বুড়ো আঙুলের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন; ওটা এখনও ক্ষয়ে যায়নি। বলল, 'প্রাচীন ইনকাদের কেউ কেউ অনেক বড় নখ রাখত!'

আরও কিছুক্ষণ পেরুর আর্টিফ্যাক্ট দেখে বেরিয়ে এলো ওরা। ভদ্রলোককে তাঁর সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেনি।

স্যালভিজ ইয়ার্ডের সামনে পৌঁছে ভেতরে ঢুকল না কিশোর। ওদের হেডকোয়ার্টার মোবাইল হোম লিন্ডাকে দেখাবে আগেই ঠিক করেছে তিন

গোয়েন্দা। জানে, চমকে যাবে লিন্ডা।

ইয়ার্ডে ঢোকার দরজার কাছে না গিয়ে বাইরের বেড়ার ধার ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করল ওরা। শ'খানেক গজ যেতেই প্রশ্ন করল লিন্ডা, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'আমাদের হেডকোয়ার্টারে,' জবাব দিল গম্ভীর মুসা।

বেড়ার গায়ে আঁকা নীল সাগর। ওখানে থামল ওরা। দুই মাস্তুলের পালতোলা একটা জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়েছে। মাথা উঁচু করে দেখছে বড় একটা মাছ।

হাত বাড়িয়ে মাছের চোখ টিপে ধরল রবিন। নিঃশব্দে ডালার মতো উঠে গেল বেড়ার গায়ে লেগে থাকা দুটো সবুজ বোর্ড। কয়েকটা গোপন পথের একটা। সবুজ ফটক এক।

বিস্মিত লিন্ডাকে নিয়ে ইয়ার্ডে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের ভেতরে আবর্জনার স্তূপের তলায় চাপা পড়ে আছে একটা ট্রেইলার-মোবাইল হোম। ভাঙাচোরা। ওটাকে মেরামত করে নিজেদের গোপন আস্তানা বানিয়েছে তিন গোয়েন্দা। কয়েকটা গোপন পথ আছে, ওরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না।

সবাইকে নিয়ে সহজ তিনের দিকে এগোল কিশোর। ওদের হেডকোয়ার্টারে ঢোকার এটা সবচেয়ে সহজ গোপন পথ। ফ্রেমে আটকানো বিরাট একটা ওক কাঠের দরজা। গ্র্যানিট পাথরে তৈরি ধসে পড়া একটা বাড়ি থেকে খুলে এনেছেন রাশেদ চাচা। ওটাকেই একটা দানবীয় স্টীম এঞ্জিনের পুরোনো বয়লারের এক প্রান্তে কায়দা করে বসিয়ে নেয়া হয়েছে।

লোহালক্কড়ের মাঝে একটা খোঁড়লে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ভেতরে বসানো আছে একটা ছোট বাক্স, তাতে চাবি রাখা। এমন জায়গায় বাক্স আর তার ভেতরে দরজার চাবি থাকতে পারে তা কল্পনাই করবে না কেউ। দরজার তালা খুলল কিশোর। টান দিয়ে খুলল পাল্লা। ঢুকল বিশাল বয়লারে।

পুরো সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। মাথা সামান্য নুইয়ে বয়লারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। শেষ মাথায় বড় গোল একটা ফুটো। ওটার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর, দু'কদম হেঁটে প্রবেশ করল ট্রেইলারের ভেতরে। ওর পেছনে একে একে ঢুকল লিন্ডা, মুসা আর রবিন।

সুইচ টিপে আলো জ্বালল কিশোর। আধপোড়া ডেস্কের পেছনে নিজের আরামদায়ক চেয়ারে বসল। অন্যরা বসার পর ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে লিন্ডার দিকে তাকাল ও। 'কি বুঝলে?'

'দারুণ!' উত্তেজনায় চকচক করছে লিন্ডার চোখ। 'গোপন পথ কি আরও আছে?'

মুসাকে ইঙ্গিত করল কিশোর। লিন্ডার হাত ধরে ট্রেইলারের শেষ প্রান্তে চলে গেল মুসা। একটা ঢাকনি সরাতেই দেখা গেল গুপ্তপথ। এটা 'দুই সুড়ঙ্গ-পথ'।

মুসার পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল লিন্ডা। চল্লিশ ফুট লম্বা পাইপ,

হাঁটুতে খুব ব্যথা লাগত আগে, তাই পুরোনো কার্পেট পেতে নিয়েছে ওরা পরে।

শেষমাথার লোহার পাত সরিয়ে ওদের ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এলো মুসা। লিন্ডাকে ঘুরিয়ে দেখাল ছাপার মেশিন আর ওদের অন্যান্য জিনিস। একটু পর সন্তুষ্ট লিন্ডা ফিরল মোবাইল হোমের ভেতর, কিশোরের সামনে।

'আরও পথ আছে,' বলল কিশোর। 'সবগুলো দেখালে রহস্য থাকে না।'

চাপাচাপি করল না লিন্ডা। একদিনের জন্যে যথেষ্ট দেখেছে।

বিকেলে গল্প শেষে যে যার বাসায় ফিরল ওরা, কাল সকালে পেরুর ফ্লাইট, কাজেই তৈরি হতে হবে। ঠিক করেছে রাত আটটার আগেই এয়ারপোর্টের মোটেলে উঠবে সবাই। যে যার মতো আলাদা ভাবে যাবে। ফোন করে আগেই ঘর বুক করেছেন রাশেদ চাচা, সমস্যা নেই কোন।

বিদায়ের আগে মেরি চাচী বারবার করে কিশোরকে সাবধান থাকতে বলে দিলেন। রাশেদ চাচা বললেন, 'আমি আর কিছু বলব না। আশা করি সফল হবি। ফেরার আগে ফোন করিস।'

মোটেলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন রাশেদ চাচা, সন্ধের অন্ধকার নেমেছে তখন। ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে লবিতে এলো কিশোর। ওটাতে আছে জামাকাপড় আর সেই প্লাক।

আগেই পৌঁছে গেছে রবিন, মুসা আর লিন্ডা; লবিতে সোফায় বসে আছে। কাউন্টারে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ঘরের চাবি নিল ওরা। মালামাল তুলে নিল পোর্টার। ওরা তার পেছনে পা বাড়ানোর আগেই বাজল কাউন্টারের ফোন। রিসিভার তুলে কথা শুনল রিসেপশনিস্ট। কিশোরকে ডাক দিল।

'তোমার ফোন, কিশোর পাশা।'

তার কাছ থেকে রিসিভার নিল কিশোর।

'কিশোর পাশা বলছি।'

'গুড। আমি ইয়ান ফ্লেচার। নিশ্চয়ই ভাবছ কি করে ফোন করলাম? তোমার চাচী মোটেলের নাম্বারটা দিয়েছেন। জলদি হেডকোয়ার্টারে চলে এসো। জরুরী।' ওপ্রান্তে রিসিভার নামিয়ে রাখা হলো।

তিন

পুলিশ চীফ কি বলেছেন বন্ধুদের জানাল কিশোর।

'হয়তো হেনরি ওয়াল্টার ধরা পড়েছে,' ভ্রূ কুঁচকাল রবিন।

মুসা বলল, 'যাব যে, কিভাবে যাব? আমাদের সঙ্গে তো গাড়ি নেই।'

'ট্যাক্সিই যথেষ্ট,' বলল কিশোর, সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। 'লিন্ডা, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। প্লাকটা তোমার।'

পোর্টারকে ব্যাগেজ ঘরে পৌঁছে দিতে বলে রওনা হয়ে গেল ওরা। চল্লিশ মিনিট পর হাজির হলো পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। ইয়ান ফ্লেচারের অফিসে বসল ওরা। একটু পরেই হাজির করা হলো হাতকড়া পরানো লোকটাকে।

'এই লোকটাই কি নিজেকে পুলিশের ডিটেকটিভ বলে পরিচয় দিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ।

'জ্বী।'

চোখ দুটো জ্বলে উঠল হেনরি ওয়াল্টারের। কর্কশ গলায় বলল, 'জীবনে কোনদিন এই ছোকরাকে দেখিনি আমি!'

পাত্তা দিল না কিশোর। বলল, 'দামী একটা প্রাচীন প্লাক চুরির চেষ্টা করছিল এ।' লিন্ডাকে দেখাল। 'জিনিসটা ওর।' ইচ্ছে করেই লিন্ডার নাম উচ্চারণ করল না ও। আশা করছে লিন্ডার পরিচয় বলে নিজেই ধরা খাবে শুঁটকি লোকটা।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করল ওয়াল্টার। 'আমি এব্যাপারে আর মুখ খুলতে রাজি নই।' চীফের দিকে ফিরল সে। 'আমাকে ধরে রাখার কোন অধিকার নেই আপনার। অন্যায় কিছু করিনি আমি।'

কিশোর বলে উঠল, 'চীফ, আপনি যদি সাক্ষী চান তাহলে মুসা আর রবিন সাক্ষ্য দেবে। ওরা তখন উপস্থিত ছিল।'

এ-কথায় মত পরিবর্তন করল ওয়াল্টার। বলল, 'ঠিক আছে, স্বীকার করছি আমি প্রথমে এই ছেলেটাকে চিনতে পারিনি। আগে যখন দেখি তখন চেহারাটা অন্যরকম লেগেছিল।'

কড়া চোখে ওয়াল্টারকে দেখলেন ইয়ান ফ্লেচার। 'তাহলে তুমি স্বীকার করছ যে প্লাক চুরির চেষ্টা করেছিলে?'

'অবশ্যই না,' ঘনঘন মাথা নাড়ল ওয়াল্টার। 'ওই প্লাকটা আসলে আমার।'

'মিথ্যে কথা!' উত্তেজিত হয়ে উঠল লিন্ডা।

নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল বন্দি। 'আমি একজন আমদানীকারক। আমদানীর ব্যবসা আছে আমার। সারা দুনিয়া থেকে বিভিন্ন জিনিস আমদানী করি আমি। ওই প্লাকটা দক্ষিণ আমেরিকায় আমার কাছে বিক্রি করা হয়। জিনিসটা আমার দোকান থেকে চুরি যায়। তখন থেকে খুঁজছি। তারপর জানা গেল ওটা আছে মিস পিনোশের কাছে, রকি বীচে। খোঁজ নিয়ে জানলাম সে ওটা কিশোর পাশার কাছে রাখতে দিয়েছে।'

হাসি-হাসি হয়ে গেল কিশোর আর ইয়ান ফ্লেচারের চেহারা। লোকটা বেশি কথা বলে ফেঁসে গেছে। দোকান কোথায়? মালিকানা কার? কি করে সে প্লাকের খোঁজ পেল? নানা প্রশ্ন জাগে মনে, যেগুলোর একটারও উত্তর হেনরি ওয়াল্টার দিতে পারবে না।

ইয়ান ফ্লেচারের গলাটা কড়া শোনাল।

'ঠিক আছে, অনেক মিথ্যে শুনেছি। এবার আসল কথাটা বলো।'

আর কিছুতেই মুখ খুলল না লোকটা। নিচু গলায় লিন্ডাকে জিজ্ঞেস করল

কিশোর, 'এই লোকই কি তোমাকে অনুসরণ করছিল?'

'মনে হয়। কিন্তু জোর দিয়ে বলতে পারি না।'

তথ্যটা চীফের কাছে নিচু গলায় বলল কিশোর। জানাল লিন্ডা হয়তো একটা চিঠিও পেয়েছে। হয়তো ওটা এই লোকেরই কাজ। চিঠির বক্তব্য বলে জিজ্ঞেস করল, 'এল গ্যাটো কথাটার বিশেষ কোন অর্থ জানা আছে আপনার?'

জবাব দেয়ার আগে বুককেসের কাছে চলে গেলেন ইয়ান ফ্লেচার, একটা খাতা নিয়ে খুললেন। পাতা উল্টে চলে গেলেন প্রায় শেষে, তারপর আঙুল চালালেন লেখার ওপর।

'হুম্!' বিড়বিড় করে বললেন। কিশোরকে পড়তে ইশারা করলেন।

তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে পড়ল কিশোর। পেরুর রহস্যময় এক লোক সম্বন্ধে খাতায় তথ্য আছে। পেরুর পুলিশের কাছে লোকটার পরিচয় এল গ্যাটো। সত্যিকার নাম এবং কোথায় আস্তানা সেটা পুলিশের জানা নেই। তাকে গ্রেফতারের জন্যে হুলিয়া জারি করা হয়েছে।

খাতা রেখে বন্দির দিকে ফিরলেন চীফ। 'শাস্তি কমাতে চাইলে ঝেড়ে কাশো। প্রথমে আমি জানতে চাই এল গ্যাটো কে।'

চমকে গেল হেনরি ওয়াল্টার। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁ করল কিছু একটা বলার জন্যে, তারপর সিদ্ধান্ত বদলে মুখ বন্ধ করে ফেলল। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আরও কোন মিথ্যে কেসের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন? আমি জানি না কি ব্যাপারে কথা বলছেন আপনি।'

অফিসারকে বন্দি নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন ইয়ান ফ্লেচার। তার আগে জানিয়ে দিলেন ইচ্ছে করলে ওয়াল্টার নিজের জন্যে উকিল ঠিক করতে পারে। নইলে সরকারী উকিল কোর্টে তার পক্ষ নেবে।

'কালকে জানাব আমি,' বলল ওয়াল্টার, অফিসারের পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নতুন এই কেসের ব্যাপারে সামান্য আলোচনা হলো কিশোর আর ইয়ান ফ্লেচারের। চোখ বড় বড় করে শুনল লিন্ডা। শেষে থাকতে না পেরে বলল, 'খুব খারাপ লাগছে। আমার জন্যেই এতো ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে তোমরা।'

স্নেহের হাসি হাসলেন চীফ। 'হয়তো আমরা দুই দেশের পুলিশ তোমাকে ধন্যবাদ দেব এল গ্যাটোর ব্যাপারে সচেতন করে দেয়ার জন্যে।' কিশোরের দিকে তাকালেন। 'আশা করছি শব্দফাঁদের রহস্য তুমি উদ্ঘাটন করতে পারবে।' সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় দিলেন তিনি।

ট্যাক্সি ছাড়েনি ওরা, বাইরে অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার। নতুন করে ট্যাক্সি নিতে হলো না। মোটেলে ফিরে এলো ওরা, রাতের খাওয়া সেরে নিল। কিছুক্ষণ পেরু গিয়ে কি-কি করবে জমিয়ে সে গল্প করল ওরা, তারপর উঠবে বলে ঠিক করল। কালকে পেরুর প্লেনে চাপতে হবে। ধকল যাবে বেশ। আগে আগে ঘুমিয়ে পড়াই ভাল।

ওরা ওঠার আগেই বেলবয় এসে দাঁড়াল কিশোরদের সামনে। 'কিশোর পাশা কে?' জিজ্ঞেস করল।

'আমি,' বলল কিশোর।

'তোমার ফোন।'

লাউঞ্জে গেল কিশোর। রিসিভার কানে ঠেকাল। হ্যালো বলতেই ওপ্রান্তে মেরি চাচীর গলা শুনতে পেল।

'এয়ারলাইন থেকে ফোন এসেছিল। তোদের ফ্লাইট ক্যান্সেল করা হয়েছে। মোটেলে থাকবি, না বাড়ি চলে আসবি?'

'ভেবে দেখি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'পরে জানাব।'

'আচ্ছা।' ফোন রেখে দিলেন মেরি চাচী।

বন্ধুদের কাছে ফিরে এলো কিশোর, জানাল মেরি চাচী কি বলেছেন। ভ্রূ কুঁচকে আছে ওর। একটু থেমে বলল, 'আমার ধারণা চালাকি করেছে কেউ। ফ্লাইট বাতিল করার কোন কারণ দেখছি না। আবহাওয়া পরিষ্কার। কুয়াশা নেই। এমন হতে পারত যে দেরিতে প্লেন ছাড়বে, কিন্তু যাত্রা বাতিল করার ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকছে। এয়ারপোর্টে ফোন করব। দেখি তারা কি বলে।'

টিকেট কাউন্টারে যোগাযোগ করল কিশোর। ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন, মুসা আর লিন্ডা। ও রিসিভার নামিয়ে রাখতে কৌতূহল নিয়ে তাকাল।

'যা বলেছিলাম,' বলল কিশোর। 'চাচীকে মিথ্যে কথা বলেছে কেউ। চেয়েছিল আমরা যাতে পেরু যেতে না পারি।'

'কে হতে পারে লোকটা?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানি না,' স্বীকার করল কিশোর, তারপর বলল, 'হেনরি ওয়াল্টার নয়, কারণ সে থানায়। নিশ্চয়ই তার কোন সঙ্গী।'

'কেউ একজন চায় না আমরা পেরু যাই,' বলল মুসা। 'চাইছে আমরা দেশ ছাড়ার আগেই যে করে হোক প্লাকটা চুরি করতে।'

দৃঢ় শোনাল কিশোরের গলা। 'ব্যর্থ হতে হবে তাকে। আমি জানতে চাই লোকটা কে।'

ফোন করে মেরি চাচীকে ও জানিয়ে দিল যে ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়নি। বারবার করে কিশোরকে সাবধান করে দিলেন তিনি। বললেন খারাপ লোকদের সঙ্গে টক্কর দেয়ার কোন দরকার নেই। তারচেয়ে পেরু না যাওয়াই ভাল। হুঁ-হাঁ করে শুনে গেল কিশোর, মত পাল্টাল না। মেরি চাচীকে আশ্বস্ত করে ফোন রেখে দিল।

পরদিন দুপুর বারোটা পাঁচ মিনিটে বিরাট জেট এয়ারলাইনারটা লিমার সুদৃশ্য বিশাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল। মুসা বিড়বিড় করে বলল, 'এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না পেরুতে চলে এসেছি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার, অথচ বাড়ি থেকে কতো দূর!'

কাস্টমস পেরোনোর আগেই কাঁচের একটা পার্টিশনের ওপাশে বাবা-মাকে দেখতে পেল লিন্ডা। বাতাসে চুমু ভাসিয়ে দিয়ে ইশারায় সেনিয়র অ্যান্ড সেনিয়রা

পিনোশেকে বন্ধুদের চিনিয়ে দিল ও। তাঁদের হাত নাড়ার জবাবে কিশোররাও হাত নাড়ল হাসিমুখে। কাস্টমস থেকে ব্যাগেজ ছাড় হওয়ার পর পিনোশেদের বিরাট ফ্যামিলি-অটোমোবাইলে চড়ে বসল ওরা।

হাসিখুশি ফুর্তিবাজ মানুষ সেনিয়র পিনোশে। সেনিয়রা একটু গম্ভীর, তবে মানুষ ভাল। দু'জনই লম্বা, রোদেপোড়া, দেখতে সুন্দর। সেনিয়রা পিনোশেকে দেখলে মনে হয় বয়স্কা লিন্ডা।

গাড়িটা আবাসিক এলাকায় ঢোকার পর চোখে প্রশংসা নিয়ে চারদিকে তাকাতে হলো তিন গোয়েন্দাকে।

রাস্তার দু'পাশে সুন্দর সুন্দর সব বিরাট,বিরাট বাড়ি, তেমনি চমৎকার সাজানো গোছানো সবুজ বাগান। বুলেভার্ডগুলো প্রশস্ত, বেশিরভাগ লনই উঁচু-উঁচু লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা।

পিনোশেদের বাড়ি অত্যন্ত সুন্দর। সামনের গ্রিলের বেড়া পার হওয়ার পর যত্ন করে সাজানো একটা বাগান। এক পাশে গায়ে গিঁটওয়ালা একটা চিরসবুজ গাছ আকাশে মাথা তুলেছে। মুসা ওটার প্রশংসা করতে সেনিয়র পিনোশে জানালেন ওটা কোয়েনার গাছ।

ড্রাইভওয়ে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত গেছে। মাঝামাঝি জায়গায় ডানদিকে একটা আলপাকার মূর্তি। 'দারুণ!' বিড়বিড় করল মুসা।

সেনিয়র পিনোশে জানালেন ওটা আসল আলপাকা মূর্তির নকল। আসলটা ছিল কাযকো শহরে, সূর্য দেবতার মন্দিরের সামনে বিশাল চত্বরে। 'বলতে খারাপই লাগছে,' বললেন তিনি, 'তবে স্বীকার না করে উপায় নেই, স্প্যানিশরা যখন এদেশে এলো তখন ইনকাদের রাজ্য দখল করে নিল। তারা ইনকাদের কাছে এতো বেশি সোনা দাবী করল যে কাযকো শহর ধ্বংস হয়ে গেল। সোনার তৈরি সবকিছু নিয়ে নিল স্প্যানিশরা। প্রাচীন কালে ওই শহরের আরেকটা নাম ছিল স্বর্ণশহর।'

স্প্যানিশ রীতিতে সাজানো ডাইনিং রূমে ওদের জন্যে খাবার পরিবেশন করা হলো। এলো একের পর এক ডিশ। অত্যন্ত সুস্বাদু, একেকটার তুলনা হয় না। গন্ধে জিভে জল চলে আসে। পেট পুরে খেল মুসা আর অন্যরা। সেনিয়রা পিনোশে বেড়ে বেড়ে দিলেন।

খাওয়ার পালা চোকার পর ব্যাগ থেকে প্লাকটা বের করল কিশোর। লিন্ডা বাবা-মাকে জানাল এপর্যন্ত ওটা সম্বন্ধে কি কি জানা গেছে।

'ভাল, খুবই ভাল,' বললেন সেনিয়র পিনোশে। 'আমি আসলে কখনোই ওটা মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। দেখা উচিত ছিল।'

সেনিয়রা পিনোশে আর লিন্ডা কিশোরের ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা নিয়ে ঝুঁকে পড়ে শব্দফাঁদ দেখছে। কিশোর, মুসা আর রবিন মনোযোগ দিল সেনিয়র পিনোশের কথায়। তিনি প্লাকটা সম্বন্ধে বলছেন।

'কয়েক পুরুষ আমরা ওটা খুঁজে পাইনি। তারপর হঠাৎ করেই পাওয়া গেল।

পাওয়া গেল আমার দাদার মৃত্যুর পর, তাঁর জিনিসপত্রের ভেতরে, ট্রাঙ্কে। ততোদিনে ওটা এতোই ক্ষয়ে গেছে যে কি লেখা ছিল তা আর কেউ উদ্ধার করতে পারল না।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয় অনেক আগেই কেউ ওটার রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলেছে?'

'না, মনে হয়। তাহলে আমরা জানতাম। আমরা শুধু শুনেছি অনেক কাল আগে এক ইনকা ইন্ডিয়ান প্লাকটা নিয়ে আসে। আমার এক পূর্বপুরুষের হাতে ওটা দিয়ে চলে যায় সে। কোথায়, কেউ তা জানে না। লোকটা ইনকাদের কুয়েচুয়া ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা জানত না, ফলে তার কাছ থেকে কিছুই জানা যায়নি।'

টেলিফোন বেজে উঠতে ধরলেন সেনিয়র পিনোশে।

মুসা বলল, 'কি দারুণ রোমাঞ্চকর একটা কাহিনী!'

মনে মনে সায় না দিয়ে পারল না কিশোর আর রবিন।

লিন্ডা জিজ্ঞেস করল পুরো বাড়ি ঘুরে দেখতে চায় কিনা ওরা। রাজি হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

সারা বাড়ি যেন একটা জাদুঘর। প্রাচীন মূল্যবান জিনিসের ছড়াছড়ি। চমৎকার করে সাজানো। ইনকাদের আর্টিফ্যাক্ট তো আছেই, আছে প্রাচীন স্প্যানিশদের হাতে আঁকা দুর্লভ সব ছবি।

'সত্যি দারুণ,' প্রশংসা করল মুসা।

সব দেখতে আধঘণ্টা লাগল। আবার লিভিং রূমে ফিরে এলো ওরা। মাত্র ভেতরে ঢুকেছে এমন সময় সেনিয়রা পিনোশে অস্ফুট একটা আওয়াজ করলেন। কিশোরের ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে এখনও প্লাক দেখছেন তিনি। মুখ তুলে বললেন, 'মনে হয় শব্দফাঁদের একটা টুকরো আমি বুঝতে পেরেছি!'

চার

ঝুঁকে পড়ল ওরা। সেনিয়রা পিনোশে অক্ষরগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়া লম্বা দাগে আঙুল রাখলেন।

'মনে হচ্ছে কোলা লেখা আছে। কোলা মানে স্প্যানিশে লেজ।'

হাসল কিশোর। 'তার মানে নিচের অক্ষরগুলোর সঙ্গে মেলালে দাঁড়ায় মোনো কোলা। অর্থাৎ বাঁদরের লেজ।'

'ঠিক,' সায় দিলেন সেনিয়ন পিনোশে। 'কিন্তু এ থেকে কি বুঝব?'

প্রশ্নটার জবাব দিতে পারল না কেউ। চিন্তা করছে সবাই।

কিশোর বলল, 'এমন হতে পারে যে আগুস্তো পিনোশে বাঁদরের পুরো লেজ

দিতে না পেরে লেজ কথাটা লিখে রেখে গেছেন।'

মাথা দোলালেন সেনিয়র পিনোশে। 'যুক্তিসঙ্গত কথা।'

'এই বাঁদরটার হয়তো বিশেষ ধরনের লেজ আছে,' বলল রবিন।

কিশোর বলল, 'জানতে হলে বাঁদর জাতির ওপর লেখা বই ঘেঁটে দেখতে হবে।' তাকাল সেনিয়র পিনোশের দিকে। 'আপনার কাছে কি এ বিষয়ের ওপর কোন বই আছে?'

'থাকার তো কথা,' বললেন সেনিয়র পিনোশে। 'আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরিতে খুঁজলে পেয়ে যাবে। তবে আমার যতোদূর জানা আছে তাতে সব জাতির বাঁদরের লেজই লম্বা, শুধু বনমানুষ আর বেবুন বাদ দিলে।'

লিন্ডা বলল, 'কি মনে হয়, কিশোর? ধাঁধার জবাব কি বাঁদরের লেজের মধ্যেই আছে?'

থুতনি চুলকাল কিশোর। ধীর গলায় বলল, 'প্লাকে যেহেতু বাঁদরের লেজের কথা বলা আছে, আর লেজ যখন কাটা, তখন মনে তো হয় এটা রহস্য উদ্ঘাটনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।'

'তাহলে,' বলল লিন্ডা, 'আগুস্তো পিনোশে কি গুপ্তধন রেখে গেছেন? আমরা বাঁদরের লেজের রহস্য ভেদ করতে পারলেই লুকানো সম্পদ উদ্ধার করতে পারব?'

'খুবই সম্ভব,' বলল কিশোর। 'আরও একটা ব্যাপার আমার মনে হচ্ছে। প্লাকটা যে ধরনের কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে সেটাও আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে।' একটু থামল ও। 'আচ্ছা, সেনিয়র পিনোশে, আপনি কি জানেন কোন গাছের কাঠ এটা?'

মাথা নাড়লেন সেনিয়র পিনোশে। 'সত্যি বলতে কি, কোন্ গাছের কাঠ সেটা নিয়ে ভাবার কথা একবারও আমার মাথায় আসেনি।'

'জানাতে পারবে এমন কাউকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ। গ্রেগরি ভালদেজ। লিমায় তার চেয়ে উপযুক্ত লোক আর নেই। একটা দোকান আর ফ্যাক্টরি আছে তার। কাঠের ট্রে, প্লাক, বোল, সালাদের কাঁটা-চামচ আর চামচ তৈরি করে। ওর কাছে গেলে জানতে পারবে এই প্লাক কোন্ কাঠের তৈরি। ভালদেজের দোকান ঘুরে দেখতে ভালও লাগবে তোমাদের।' একটু থামলেন তিনি, তারপর বললেন, 'সেনিয়র ভালদেজ আর তার সহকারী এসেছিল একটা ডেস্ক দিয়ে যেতে। সহকারীর খুব আগ্রহ দেখেছিলাম প্লাকটার ব্যাপারে। হয়তো সে-ও কিছু বলতে পারবে।'

'তাছাড়া বাড়ি নিয়ে যাওয়ার মতো কেনার জিনিসেরও অভাব নেই ওখানে,' বললেন সেনিয়রা পিনোশে।

দেরি করার ইচ্ছে নেই কিশোরের। ওখানে এখনই যেতে চায় শুনে সেনিয়রা পিনোশে জানালেন দোকান এখনও খোলেনি। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটে পর্যন্ত দোকান খোলা রাখেন সেনিয়র ভালদেজ।

প্লাকটা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখল ওরা। বিকেল চারটের খানিক আগে লিন্ডার স্পোর্টস কারে চেপে রওনা হলো, সেনিয়র ভালদেজের দোকানে যাবে।

দক্ষ ড্রাইভার লিন্ডা. রাস্তায় প্রচুর গাড়িঘোড়ার ভিড়, তবুও ব্যবসা কেন্দ্রের ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে বেশ দ্রুত এগোচ্ছে। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল সেনিয়র ভালদেজের দোকানের সামনে।

অনেক পুরোনো একটা স্প্যানিশ বাড়ির একতলায় দোকান। প্রকাণ্ড বাড়িটা ভাবগম্ভীর। চেহারা এমনই যে মনটা কেমন যেন করে ওঠে।

ওরা দোকানের ভেতরে ঢুকে দেখল দু'জন লোক চকচকে পলিশ করা পাত্র তাকে তুলে রাখছে। ওদের দেখে হাসল বয়স্ক লোকটা। দু'এক কথায় জানা গেল ইনিই সেনিয়র ভালদেজ। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে। হাসিখুশি, সদালাপী ভদ্রলোক। সরু মোম পলিশ করা গোঁফ দেখলে মনে হয় কার্টুনের রাজপুত্র। কোঁকড়ানো দীর্ঘ চুল কাঁধের ওপর লুটাচ্ছে।

তিন গোয়েন্দা ওদের পরিচয় দেয়ায় মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে বললেন, 'খুশি হলাম তোমাদের পরিচয় পেয়ে।' সঙ্গীর পরিচয় দিলেন তিনি। 'এ হচ্ছে মরিয়েন্তোস, আমার সহকর্মী।'

তিরিশ হবে মরিয়েন্তোসের বয়স। গম্ভীর চেহারায় লেগে আছে সার্বক্ষণিক তিক্ততা। চিকন লোক। একটু কুঁজো। বাহুর ঘন লোম দেখলে বনমানুষের কথা মনে পড়ে যায়। চঞ্চল চোখ, কোথাও স্থির হচ্ছে না।

সে এবং ভালদেজ দু'জনই ইংরেজি বলতে পারে।

কাপড় সরিয়ে প্লাকটা বের করে সেনিয়র ভালদেজকে দেখাল কিশোর। 'আপনি কি বলতে পারবেন এটা কোন্ গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি?'

সাবধানে গভীর মনোযোগে চাকতিটা দেখলেন সেনিয়র ভালদেজ, প্রান্ত থেকে সামান্য কাঠ চেঁছে নিলেন। আলোর নিচে টুকরোটা পরীক্ষা করে বললেন, 'অনেক পুরোনো জিনিস। আজকাল আর এগুলো পাওয়া যায় না। অ্যারায়ানেস কাঠ। দুনিয়ায় মাত্র একটা জায়গাতেই এই গাছ পাওয়া যায়।'

'পেরুতে নিশ্চয়ই?' জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

মাথা নাড়লেন ভালদেজ। 'না। জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূরে, আর্জেন্টিনায়। লেকের ভেতরই বলতে পারো। তিন দিকে সাগরের মতো লেক। আঙুলের মতো লেকের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে অ্যারায়ানেস গাছের সেই জঙ্গল।'

'আর্জেন্টিনা!' বিড়বিড় করল লিন্ডা।

একটু হতাশ বোধ করছে কিশোর। ও ভেবেছিল জঙ্গলে গিয়ে হয়তো কোন সূত্র পেয়ে যাবে। পেরুর ভেতরে কোথাও হলেও একটা কথা ছিল, কিন্তু সেই আর্জেন্টিনায় যাওয়া তো আর সম্ভব নয়।

'আর্জেন্টিনার কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

সেনিয়র ভালদেজ জানালেন লেক নাহুয়েল হুয়াপির ভেতরে ঢুকেছে জঙ্গলটা। বললেন, 'যদি পারো তাহলে অ্যারায়ানেস জঙ্গল দেখতে ভুল কোরো

না। বিজ্ঞানীদের মতামত অনুযায়ী ওই গাছগুলো পৃথিবীর আদিমতম বৃক্ষের বংশধর। দুনিয়ায় অন্য কোথাও আজকাল আর এ জাতীয় গাছ দেখতে পাওয়া যায় না।

'গাছগুলো দেখতেও অদ্ভুত। এখন জঙ্গলটা সরকারের সংরক্ষিত সম্পত্তি। কাউকে ওখান থেকে কাঠ সংগ্রহ করতে দেয়া হয় না।' প্লাকটা দেখালেন তিনি। 'এটা সেই জঙ্গলের কাঠ দিয়েই তৈরি।'

নক্সা আঁকা চাকতির সঙ্গে যে রহস্য জড়িয়ে আছে তা সেনিয়র ভালদেজকে বলতে শুরু করল লিন্ডা। কিশোর খেয়াল করল, শোনার জন্যে সামনে এগিয়ে এসেছে মরিয়েন্তোস। চেহারায় গভীর মনোযোগের ছাপ। হাতে একটা নোট বই। দ্রুত হাতে প্লাকের ছবিগুলো নকল করছে সে। লোকটাকে কেন যেন সন্দেহ হলো কিশোরের। মনের ভেতরে খচখচ করছে। মরিয়েন্তোস চাকতির অপর পিঠের শব্দফাঁদ লিখে নিতে শুরু করতেই প্লাকটা সরিয়ে নিল ও।

অজান্তেই কড়া শোনাল ওর গলা। 'এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি।'

মুসা আর রবিনও সহকারীর অতি আগ্রহ খেয়াল করেছে। বিদ্যুতের গতিতে সামনে বাড়ল মুসা, মরিয়েন্তোস বাধা দেয়ার আগেই কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে নোটবুকটা কেড়ে নিল। এক টানে ছিঁড়ে নিল স্কেচওয়ালা পৃষ্ঠাটা। কাজটা সেরে নোটবুক রেখে দিল কাউন্টারের ওপরে।

মুসার দিকে তাকাল মরিয়েন্তোস, দু'চোখ থেকে নগ্ন ঘৃণা ঝরছে। শ্বাসের নিচে বিড়বিড় করে স্প্যানিশ ভাষায় কি যেন বলল সে। নোটবুকটা পকেটে রেখে দ্রুত পায়ে চলে গেল পেছনের ঘরে।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙলেন সেনিয়র ভালদেজ। দুঃখ প্রকাশের সুরে বললেন, 'মাঝে মাঝে আমার সহকারী মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহল দেখিয়ে ফেলে।'

বিব্রত বোধ করছে কিশোর, তবে বুঝতে পারছে এ ছাড়া মুসার সামনে আর কোন পথও খোলা ছিল না। প্রসঙ্গ পাল্টাল ও। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি উত্তর আমেরিকায় রপ্তানী করেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন ভালদেজ। 'উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় যায় আমার তৈরি জিনিস। বিশেষ করে যায় ক্যালিফোর্নিয়াতে।'

হেনরি ওয়াল্টার নামের কারও সঙ্গে সেনিয়র ভালদেজ ব্যবসা করেন কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

একটু ভেবে মাথা নাড়লেন সেনিয়র। 'না মনে হয়। দাঁড়াও, তবু দেখে বলছি।'

ডেস্কের একটা ড্রয়ার থেকে মোটা খাতা বের করলেন তিনি। এইচ এবং ডাব্লিউতে খুঁজলেন। 'না। ওই নাম আমার খাতায় নেই। তার মানে সে আমার সঙ্গে ব্যবসা করে না।'

আরও কিছুক্ষণ দোকানে থাকল ওরা, পছন্দের দুয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। বাড়ি ফিরে প্লাকটা দেয়ালের পেরেকের সঙ্গে

লটকে দিল লিন্ডা। জিনিসটা রকি বীচে নিয়ে যাওয়ার আগে ওখানেই ছিল।

'ছোটবেলা থেকেই বাঁদরটা পছন্দ ছিল আমার,' বলল লিন্ডা।

লিভিং রূমে বসল ওরা। একটু পর সেনিয়রা পিনোশে বিকেলের নাস্তা পাঠিয়ে দিলেন। নাস্তা শেষ হওয়ার পর লিন্ডা জিজ্ঞেস করল লিমায় দর্শনীয় জায়গাগুলো ওরা ঘুরে দেখবে কিনা।

এক বাক্যে রাজি হয়ে গেল মুসা। 'চলো, যাই। এমন সুন্দর বিকেলে ঘরে বসে থাকতে মন চায় না।'

কিশোর আর রবিনেরও কোন আপত্তি নেই। কিশোর বলল, 'লিমায় জাদুঘর আছে না? প্রথমে জাদুঘরে যেতে চাই আমি। আশা করছি ওখানে বাঁদরের ছবিওয়ালা কিছু পেয়ে যাব। হয়তো জানা যাবে আমাদের বাঁদরের লেজ কাটা কেন।'

লিন্ডা জানাল বেশ কয়েকটা জাদুঘর আছে। তার মধ্যে দুটো স্প্যানিশরা আসার আগের আর্টিফ্যাক্টের জন্যে বিখ্যাত।

'ওদুটোর একটা এখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা,' বলল লিন্ডা। 'কিন্তু অন্যটার মালিককে আমি চিনি। সেনিয়র হেরেরা। আমাদেরই প্রতিবেশী। তাঁর জাদুঘর বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকলেও ঢুকতে পারব আমরা।'

রওনা হয়ে গেল ওরা। জাদুঘরে পৌঁছে দেখল খোলাই আছে। ভেতরে দু'জনকে পেল ওরা। এক ভদ্রমহিলা আর এক ভদ্রলোক। লোকটি মোটাসোটা, লাল টকটকে চেহারা। উত্তর আমেরিকান। মহিলা সম্ভবত তাঁর স্ত্রী। স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে একটা জিনিস দেখাচ্ছেন তিনি।

মহিলা আপত্তির সুরে বললেন, 'আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি। লাঠি দিয়ে ওভাবে তাক করে আমাকে দেখাতে হবে না তোমার। কখন বেআক্কেলের মতো লাঠির গুঁতো লাগিয়ে বসবে, দামী কিছু পড়ে গিয়ে ভাঙবে।'

যতোবার মহিলা অনুযোগ করেন ততোবার ভদ্রলোক সবজান্তার হাসি হাসেন। 'অত লেকচার দিয়ো না, আমি জানি আমি কি করছি।'

দু'পাশে তাক, তার ওপর প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য আর্টিফ্যাক্ট রাখা। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। দু'দিকে দেখতে দেখতে চলল তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডা। সবক'জন কোনও আর্টিফ্যাক্টে বাঁদরের ছবি আছে কিনা দেখছে।

হরেক রকম জগ দেখতে দেখতে এগোল ওরা। কোন কোনটা নক্সা করা, জন্তুজানোয়ারের ছবি আঁকা, আধার কোন কোনটা সাধারণ।

কাঁচের কেসের ভেতরে রাখা হয়েছে নানা ধরনের গহনা। মুসা আগে আগে চলেছে। একটার সামনে থমকে গেল ও। অবাক গলায় বলল, 'আরেহ্ খাইসে! দেখো যাও। এতো বড় কানের দুল জীবনেও দেখোনি কেউ।'

'একেকটা কমপক্ষে এক টন হবে,' বলল লিন্ডা। 'দস্তা আর সীসের তৈরি।'

আগে বাড়ল ওরা। সামনে থেকে স্বামী-স্ত্রীর গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। মহিলা স্বামীকে এখনও বলে চলেছে লাঠি তাক না করতে।

সরু আরেকটা পথে এগোল ওরা এবার। দু'পাশে তাকের ওপর নানা প্রাচীন জিনিসের মেলা। সব মাটির তৈরি। স্বামী-স্ত্রী দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাচ্ছেন। তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডাকে তাঁরা এখনও দেখেননি।

মুসা হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'আমি একটা বাঁদরের ছবিওয়ালা জগ দেখেছি!'

ওর ঠিক পেছনেই আছে কিশোর। মুসার আঙুল লক্ষ্য করে ওপরের তাকের দিকে তাকাল। ঠিক সেই মুহূর্তে হাতের লাঠিটা ওপরের দিকে তাক করলেন ভদ্রলোক। লাঠির ডগা খোঁচা মারল বাঁদরের ছবি আঁকা জগে। টলমল করে উঠল ওটা, তারপর কাত হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল।

আর এক মুহূর্ত, তারপরই মেঝেতে পড়ে হাজার টুকরো হয়ে যাবে ওটা।

পাঁচ

তড়িৎ গতিতে সামনে বেড়ে পড়ন্ত জগটা খপ করে ধরে ফেলল মুসা। স্বস্তির শ্বাস ফেলল সবাই।

লেঠেল ভদ্রলোকের স্ত্রী প্রথমে মুখ খুললেন। 'আমি বারবার করে বলিনি, জেমস?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'তোমার ওই লাঠির জন্যে একদিন মরতে হবে আমাকে!' স্বামীর লাঠিটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ভদ্রলোক লাঠির অধিকার ছাড়তে মোটেই রাজি নন। টানাটানি চলল।

একজন গার্ড চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে এলো। শান্ত কিন্তু কঠোর গলায় দম্পতিকে বিদায় হতে বলল সে। মিইয়ে গেলেন ভদ্রলোক, স্ত্রীর পিছু পিছু মাথা নিচু করে চলে গেলেন।

'আমার এরকম স্বামী হলে...' হেসে ফেলে কথা শেষ করতে পারল না লিন্ডা।

'বউটার মতো কঠোর হতে হতো তোমাকে,' কথা শেষ করল রবিন।

মুসার হাত থেকে জগটা নিল কিশোর। গার্ড জানাল ওটা তাক থেকে সরানো ঠিক হয়নি ওদের। মুসা সংক্ষেপে বলল কি ঘটেছিল। ওর কথা শুনে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল গার্ড। বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। জিনিসটা অমূল্য।'

'গ্রেশিয়াস,' মৃদু হাসল মুসা।

জগটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কিশোর। বাঁদরের দেহটা পরিষ্কার ভাবে আঁকা, কিন্তু লেজের জায়গাটা আবছা।

'কিছু বুঝতে পারলে?' কিশোরকে জগটা তাকের ওপর রেখে দিতে দেখে জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

'না।' গার্ডের দিকে ফিরল কিশোর। জিজ্ঞেস করল বাঁদরের লেজ অসমাপ্ত

হওয়া কোন বিশেষ কিছু নির্দেশ করে কিনা। কাঁধ ঝাঁকাল গার্ড, বলল এব্যাপারে কিছু জানা নেই তার।

জাদুঘর ঘুরে দেখে বাড়ি ফিরল ওরা। দক্ষিণ আমেরিকায় রাতের খাওয়া বেশ দেরি করে সারা হয়। বিস্কুট দিয়ে পেট ঠাণ্ডা রাখতে হলো মুসাকে। রাতে খেয়েদেয়ে লিন্ডা আর ওর বাবা-মার সঙ্গে জমিয়ে বসল তিন গোয়েন্দা।

সারাদিন ওরা কি করেছে শুনে কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন সেনিয়র পিনোশে, 'তদন্ত কিভাবে করবে সে-ব্যাপারে ভেবেছ কিছু? এরপর কি করবে?'

চকচক করে উঠল কিশোরের চোখ। একটু দ্বিধা করল, তারপর বলল, 'কি করা উচিত তা বুঝতে পারছি। কিন্তু করার কোন উপায় নেই।'

'উপায় আসলে কোন না কোন থাকেই,' বললেন সেনিয়র পিনোশে। 'কিছুই অসম্ভব নয়। কি ভাবছ বলে ফেলো দেখি।'

'অ্যারায়ানেস অরণ্যে যেতে চাই।'

চমকে গেল মুসা আর রবিন। লিন্ডা চোখ পিটপিট করে তাকাল। কেউ ভাবতে পারেনি এরকম একটা অসম্ভব চিন্তা মনের ভেতরে পুষছে কিশোর।

সেনিয়র পিনোশেকে দেখে মনে হলো না খুব একটা অবাক হয়েছেন তিনি। খুকখুক করে কাশলেন। মৃদু হাসছেন। বললেন, তাঁর কোম্পানির একটা প্রাইভেট প্লেন আছে। আগামীকাল ওটার আর্জেন্টিনা যাওয়ার কথা।

'ওটা অ্যারায়ানেস বনের খুব কাছ দিয়ে যাবে।'

তিনি এবং তাঁর কয়েকজন একযিকিউটিভ তিন দিনের জন্যে যাচ্ছেন। উঠবেন বিলাশবহুল লাও-লাও হোটেলে। ওখানে জরুরী একটা কনফারেন্স আছে তাঁদের। অবসরটা গলফ খেলে কাটাবেন।

'ব্যারিলোচে নামবে প্লেন। ওখান থেকে মোটরগাড়ি করে হোটেলে যাব আমরা। তোমাদের সঙ্গে নেবার পরও প্লেনে অনেক জায়গা থাকবে। যাবে নাকি?' তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডার ওপর পালা করে ঘুরছে ভদ্রলোকের চোখ।

নির্বাক হয়ে গেল ওরা। এ সম্ভব, ভাবেনি কেউ। আর্জেন্টিনা! নাচতে বাকি থাকল মুসার। সামলে নিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'যেতে পারলে দারুণ হয়! আপনি বললেন অ্যারায়ানেস বন বেশি দূরে নয়। ওখানেও নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই। হোটেলটা ওই একই লেকের ধারে। একটা লঞ্চ ভাড়া করে অ্যারায়ানেস জঙ্গলে চলে যেতে পারবে তোমরা।'

'আব্বু!' বাবাকে জড়িয়ে ধরল লিন্ডা। 'তোমার তুলনা হয় না।'

সেনিয়র পিনোশে জানালেন কাল সকালে রওনা হবে তাঁদের প্লেন। ভোরে উঠে তৈরি থাকতে বলে দিলেন। কিশোর আলাপ করে ঠিক করল প্লাকটা ওরা সঙ্গে নেবে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে মুসা রবিনকে বলল, 'বাড়ি ছাড়ার পর এতো উত্তেজনায় সময় কাটছে যে মনে হয় আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে।'

হাসল রবিন, পাশ ফিরে শুয়ে বলল, 'যেভাবে গলা পর্যন্ত খেয়ে চলেছ তাতে

হার্ট অ্যাটাক হলে আমি অবাক হবো না।'

প্লেন জার্নিটা হলো অসাধারণ। এতো চমৎকার নৈঃসর্গিক দৃশ্য দেখতে পাবে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি ওরা। সফেদ বরফে ঢাকা পাহাড়-চুড়ো আর নীল লেকের ওপর দিয়ে উড়ে গেল ওরা, উড়ে গেল মাইলের পর মাইল ঢেউ খেলানো সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে। হাজার হাজার গরু-বাছুর চরছে মাঠগুলোয়।

ব্যারিলোচ সাজানো গোছানো সুন্দর একটা ছোট্ট শহর। সুইস লোকরা এর গোড়াপত্তন করেছে। বাড়ি-ঘর, রাস্তাঘাট দেখলে মনে হয় সুইযারল্যান্ডেরই একটা টুকরো, ভুল করে দক্ষিণ আমেরিকায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

এয়ারস্ট্রিপে নামার আধঘণ্টার মধ্যে গাড়ি করে হোটেল লাও-লাওতে পৌঁছে গেল ওরা। সুদীর্ঘ একটা বিল্ডিঙে হোটেল। দাঁড়িয়ে আছে গাঢ় নীল লেকের তীরে, উঁচু জমিতে। চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখার মতো।

ঠিক মাঝখানে হোটেলের লবি। সেখান থেকে দু'দিকে চলে গেছে করিডর, একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। দু'দিকেই শেষে আছে হরেক টুকিটাকি চটকদার জিনিসের দোকান। বিশাল লাউঞ্জের কাঁচঘেরা আরামদায়ক কক্ষে বসে সামনের ঘন সবুজ গলফ কোর্স দেখা যায়।

তৃতীয় তলায় তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডার জন্যে পাশাপাশি দুটো ঘর দেয়া হলো। চওড়া সিঁড়ি। এলিভেটরে ওঠার বদলে সিঁড়িই ব্যবহার করল ওরা।

দুটো ঘরের জানালাতে দাঁড়ালেই লেক দেখা যায়। নীল পানিতে মৃদু মৃদু ঢেউ। সূর্যের আলো পড়ে মাথাগুলো সোনার মতো চিকচিক করছে। লেকটা মাইলের পর মাইল বিস্তৃত, সেই দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। হোটেলের নিজস্ব জেটিতে বেশ কয়েকটা ছোট লঞ্চ দেখা গেল, ভাড়া দেয়া হয়।

'দেখেছ!' আঙুল তুলে একদিকের ঢালের একটা রাস্তা দেখাল মুসা।

একটা ষাঁড় কাঠের তৈরি গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে। গাড়িতে আরাম করে নিমীলিত চোখে শুয়ে আছে চালক। হাতে আলতো করে রাশ দুটো ধরা।

'ছবি তুলব আমি,' বলল লিন্ডা। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে ক্যামেরা বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। ক্যামেরা নিয়ে ফিরে এসে হতাশ হতে হলো ওকে। আগেই বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেছে ষাঁড়ের গাড়ি।

'পরেরবার হয়তো কপাল ভাল হবে,' সান্ত্বনা দিল রবিন।

হাত-মুখ ধুতে নিজের ঘরে চলে গেল লিন্ডা। তিন গোয়েন্দাও পরিচ্ছন্ন হয়ে নিল। ব্যুরোর নিচের ড্রয়ারে প্লাকটা রাখল কিশোর। ওটার ওপর রেখে দিল কয়েকটা শার্ট-প্যান্ট আর সোয়েটার।

'চলো, হেঁটে আসি,' প্রস্তাব করল মুসা। 'বাইরে থেকে ঘুরে এলে ভাল লাগবে। খিদেটাও চাঙা হবে।'

'ভালই হয়,' বলল কিশোর। 'এই সুযোগে বোট ঠিক করে ফেলতে পারব। আমি চাইছি আগামীকালই অ্যারায়ানেস বনে যেতে।'

লিন্ডাকে খবর দিয়ে কাপড় পাল্টে নিল ওরা, তারপর চারজন একসঙ্গে নেমে

এলো নিচে। লিন্ডার কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে। বলল, 'হয়তো ষাঁড়ের গাড়িটা আবার এপথে ফিরে যাবে।'

প্রথমে জেটিতে গেল ওরা। আগামীকাল অ্যারায়ানেস বনে যাওয়ার জন্যে বোটের টিকিট কাটল। বোটম্যান ওদের জানাল আগেই আরও কয়েকজন ট্যুরিস্ট টিকেট কেটে রেখেছে, তাদের সঙ্গে যেতে হবে।

'বৃষ্টি না হলে বাঁচি,' আকাশটা একবার দেখে নিয়ে বলল বোটম্যান। 'দেখে তো মনে হচ্ছে তুমুল বর্ষা নামবে।'

'বৃষ্টি হলেও যাব আমরা,' বলল কিশোর। মৃদু হেসে লিন্ডার কাছ থেকে শেখা স্প্যানিশে বলল, 'হাস্তা লা ভিস্তা।' (*আবার দেখা হবে*)

কিছুক্ষণ লেকের তীরে ঘুরে হোটেলের দিকে পা বাড়াল ওরা। হোটেলের কাছে এসে ষাঁড়ের গাড়িটা দেখতে পেল, রাস্তার পাশে থেমে আছে। চালককে কোথাও দেখা গেল না। লিন্ডা ঠিক করল ষাঁড়ের একটা ছবি নেবে। এগোল ওরা, গজ বিশেক যাওয়ার পর দেখল পাহাড়ী ঢালে একটা চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে বসে আছে। এক লোক তার সঙ্গে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডাকে দেখে কথা শেষ না করেই তাড়াহুড়ো করে চলে গেল লোকটা।

'হুম্!' ভ্রূ কুঁচকাল গম্ভীর কিশোর। 'ভাব দেখে মনে হলো আমাদের এড়িয়ে যেতে চাইল।'

লিন্ডা ছবি তুলতে যাবে এমন সময়ে ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। মুসার ওপর চোখ স্থির হলো তার। 'ষাঁড়ের পিঠে চেপেছ কখনও?' জিজ্ঞেস করল। 'ষাঁড়ের পিঠে চেপে ছবি তুলেছ?'

মাথা নাড়ল মুসা, ষাঁড়ের পিঠে ওঠার ভাবনাটা ওর পছন্দ হয়নি।

'দারুণ আইডিয়া!' বলে উঠল লিন্ডা। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চেহারা। হাতের ইশারা করল। 'উঠে পড়ো, মুসা। চমৎকার ছবি হবে!'

মুখ আরও কালো হয়ে গেল মুসার। প্রেস্টিজের ব্যাপার। লিন্ডার চোখে ছোট হতে ইচ্ছে করল না। কিশোরের দিকে একবার তাকাল ও। চুপ করে আছে কিশোর, কি যেন ভাবছে। কাঁধ ঝাঁকাল মুসা। 'ঠিক আছে, উঠছি। তাড়াতাড়ি ছবি তুলবে কিন্তু।'

সামনে বেড়ে এক লাফে ঘাস খেতে ব্যস্ত ষাঁড়ের পিঠে চেপে বসল ও। যেন এই অপেক্ষাতেই ছিল ছেলেটা। হাতের লাঠি দিয়ে ষাঁড়ের পেছনে কষে এক বাড়ি লাগাল সে। চমকে গেল ষাঁড়। এতো দ্রুত সামনে বাড়ল যে আরেকটু হলে পড়েই যেত মুসা।

চমক কাটিয়ে উঠেই ও খেয়াল করল ষাঁড়ের দড়ি খুলে রাখা হয়েছিল। ষাঁড় লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। গলা ছেড়ে ঘাঁ-ঘাঁ করে ডাকছে। শ্বাস ফেলছে ফোঁস-ফোঁস। বুঝতে পারছে না কোন্ আপদ তার পিঠে চেপে বসেছে।

কোনরকমে জন্তুটার মোটা গর্দান জড়িয়ে ধরে টিকে থাকল মুসা।

লিন্ডা হতভম্ব হয়ে ছবি তোলার কথা ভুলে গেছে। কিশোর আর রবিন ষাঁড়ের

পেছনে দৌড়াতে শুরু করল। ষাঁড় ধরা অতো সোজা নয়। বিরাট দেহ নিয়ে মেইল ট্রেনের মতো ছুটছে ওটা। লেজটা বাতাসে ভাসছে, যেন বিজয় কেতন!

'ঢাল বেয়ে ওঠো!' ছুটতে ছুটতে রবিনকে বলল কিশোর। 'আড়াআড়ি গিয়ে ওদের সামনে পৌঁছে যাব আমরা।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানি না। একটা কিছু করতে হবে।'

ঢাল বেয়ে উঠে পিছলে নামতে শুরু করল দু'জন। রাস্তা ছেড়ে সরতে রাজি নয় ষাঁড়, বাঁক ঘুরে ওদের দিকেই ছুটে আসছে। সরু রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা, পাগলের মতো দু'পাশে হাত ছুঁড়ছে।

দু'দুটো দু'পেয়ে জীবকে চোখের সামনে বিদঘুটে ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়তে দেখে ভাল লাগল না ষাঁড় বাবাজির। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, চোখে ঘোর সন্দেহ। কি করবে বুঝতে না পেরে বাঁ-বাঁ করে ডাক ছাড়ল।

তাড়াহুড়ো করে ওটার পিঠের ওপর থেকে পিছলে নামল মুসা, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কিশোর আর রবিন রাস্তা ছেড়ে দিল। কিন্তু ওদিকে ষাঁড়ের মনোযোগ নেই, দার্শনিক ধরনের প্রাণী, পিঠ থেকে উটকো বোঝা দূর হয়ে যেতেই বারকয়েক ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে রাস্তার পাশের ঘাসে মুখ ডুবিয়ে দিল। পেটপুজোয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কিশোর আর রবিনের পাশে এসে দাঁড়াল মুসা, এখনও হাত কাঁপছে। 'একটুর জন্যে বেঁচে গেছি,' বলল ও। 'ব্যাটার পিঠ ভীষণ পিছলা! আরেকটু হলেই পড়ে গিয়ে আমার হাত-পা ভাঙত।'

'ওটার কি হবে?' খেতে ব্যস্ত ষাঁড়টাকে দেখাল কিশোর। 'এখানেই রেখে যাব?'

যেন ওর প্রশ্নের জবাবেই, দৌড়াতে দৌড়াতে বাঁক ঘুরে হাজির হলো ষাঁড়ে টানা গাড়ির সেই ঘুমন্ত চালক। সামান্য ইংরেজি জানে সে। অভিযোগের সুরে বলল তিন গোয়েন্দা তার অবলা ষাঁড়ের বাঁধন খুলে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে।

লিন্ডাও পৌঁছে গেছে।

অভিযোগ অস্বীকার করল তিন গোয়েন্দা। তিনজনই চিন্তা করছে কাজটা কার। ছেলেটা বাঁধন খুলে রেখেছিল, নাকি যে-লোকটা ওদের দেখে অমন তড়িঘড়ি করে চলে গেল তার কাজ?

'চলো, ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে দেখি,' বলল কিশোর।

গাড়ির কাছে ফিরে এলো ওরা টিলার ওপর দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে। ছোকরা গায়েব! একটু পর ষাঁড় নিয়ে ফিরল চালক। তাকে ওরা ছেলেটার কথা জিজ্ঞেস করল। জানতে চাইল তার পরিচয় জানে কিনা।

'হয়তো রেডিদের বাড়ির কাজের ছেলে,' জানাল চালক। 'থমাস কার্টিস হতে পারে। হাড় বদমাশ ছোঁড়া।'

ক্ষেপে গেছে মুসা, বলল, 'আমাদের ওই রেডিদের বাড়ি যাওয়া উচিত।

ছোকরাকে ধরে জানতে হবে ওই লোকটা তাকে শয়তানী করতে শিখিয়ে দিয়েছিল কিনা।'

মুসার কথায় সায় দিল ওরা। রেডিদের বাড়ি খুঁজে নিতে পনেরো মিনিট লাগল। বাড়ির কর্তা জানালেন তাঁর বাড়িতেই কাজ করে থমাস। বললেন, 'থমাস সকালে বেরিয়ে গেছে। ব্যারিলোচেতেই থমাসের বাড়ি, তবে ঠিকানা জানি না।'

কি ঘটেছে তাঁকে জানাল কিশোর, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'থমাস আসার পর ওকে কি লোকটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন আপনি? খুব উপকার হতো তাহলে। যদি কিছু জানে তো আমাদের যদি জানান। আমরা লাও-লাও হোটেলে আছি।'

রাজি হলেন ভদ্রলোক। বললেন থমাস দায়ী হলে পেঁদিয়ে ওর পেছনের ছাল তুলে নেবেন।

বিদায় নিয়ে চলে এলো তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডা। হোটেলে ফিরে সবার আগে ঘরে ঢুকল কিশোর। প্রথমেই ওর চোখ পড়ল ব্যুরোর ওপর। কি যেন অস্বাভাবিক!

নিচের ড্রয়ারটা খাপ থেকে একটু বেরিয়ে আছে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল কিশোরের। শক্ত করে ড্রয়ার লাগিয়ে গিয়েছিল ও। তাহলে?

মনের ভেতর সন্দেহের দোলা অনুভব করল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে ড্রয়ারটা খুলল ও। যা আশঙ্কা করেছিল!

হতাশায় ছেয়ে গেল ওর মন।

ছয়

'কি হলো?' কিশোরের চেহারায় পরিবর্তন দেখে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'প্লাক! ওটা নেই!'

মুখ কালো হয়ে গেল লিন্ডার, চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। বিড়বিড় করে স্প্যানিশে কি যেন বলল, তারপর ইংরেজিতে বলল, 'এখন কি হবে? আমাদের আর এগোনোর পথ রইল না।'

'সত্যি খুব খারাপ লাগছে,' ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল মুসা। 'তবে চিন্তা কোরো না। আমরা ঠিকই ওটা উদ্ধার করব।'

'চেষ্টা তো করবই,' বলল কিশোর। 'প্রথম কাজ হোটেলের ডেস্কে চুরির কথাটা জানানো। ম্যানেজারের সাহায্য চাইব আমরা।'

কিশোরকে একটা গোছানো সুন্দর অফিসে নিয়ে গেল ক্লার্ক। ডিউটিতে ছিলেন সেনিয়র পেদরো নামের এক ভদ্রলোক। মনোযোগ দিয়ে কিশোরের কথা শুনলেন তিনি।

সব শুনে বললেন, 'খুব খারাপ কথা। কিন্তু ওটা কেউ চুরি করবে কেন সেটা

আমার মাথায় ঢুকছে না। চোরের উদ্দেশ্য কি হতে পারে?'

'জানি না এখনও,' বলল কিশোর। 'জিনিসটা পিনোশে পরিবারে শত শত বছর ধরে আছে। ওটা চুরি গেছে জানলে তাঁরা খুব দুঃখ পাবেন।'

'সেনিয়রিটা পিনোশে তো তোমাদের সঙ্গেই আছে,' বললেন পেদরো। 'সে জানে চুরির কথা?'

'জানে।'

পেন্সিল দিয়ে ডেস্কের ওপর টোকা দিলেন পেদরো। 'একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, যে চুরি করেছিল তার কাছে ঘরের চাবি ছিল। এ থেকে সন্দেহ গিয়ে পড়ে পোর্টার বা চেম্বারমেইডের ওপর। কিন্তু আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি এ হোটেলের কোন কর্মচারী এ ধরনের নোংরা কাজ করবে না।'

কিশোর সায় দিল। হোটেলের কর্মচারীদের প্লাকের ব্যাপারে আগ্রহী হবার কোন কারণ নেই। যে চুরি করেছে সে সম্ভবত বাইরের লোক। ডুপ্লিকেট চাবি ছিল তার কাছে।

'সেক্ষেত্রে লোকটাকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে,' বললেন পেদরো। কিশোরের সঙ্গে লবিতে এলেন তিনি। 'আমি তদন্ত করে দেখছি। কোন সূত্র দিতে পারবে লোকটা কে হতে পারে?'

রকি বীচের হেনরি ওয়াল্টারের ঘটনাটা বলল কিশোর। 'নিজেকে সে আমদানীকারক বলে পরিচয় দিয়েছিল।' মরিয়েন্তোসের কথাও জানাল ও। লোকটা নক্সা নকল করার চেষ্টা করছিল। ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

চোখের কোণে কিশোর খেয়াল করল এক মহিলা গভীর মনোযোগে ওদের কথা শুনছেন। এগিয়ে এলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'প্লাকটার গায়ে বাঁদরের ছবি খোদাই করা আছে?'

'হ্যাঁ।' অবাক হলো কিশোর।

'আমি মিসেস সেগুয়েন্ডো,' পরিচয় জানালেন মহিলা। 'এই মাত্র হোটেলের একটা গিফট শপ থেকে এসেছি। দোকানের দেয়ালে একটা প্লাক দেখলাম। ওটার ওপর বাঁদরের ছবি খোদাই করা ছিল।'

কিশোরের মনে হলো না ওটা লিন্ডার প্লাক হতে পারে, তবু মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে দোকানের দিকে দ্রুত পা বাড়াল ও। সেনিয়র পেদরোও ওর সঙ্গে চললেন।

দোকানে ঢুকে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দেয়ালে ঝুলন্ত প্লাকটা আসলেই পিনোশে পরিবারের প্রাচীন সেই প্লাক!

সেনিয়র পেদরোকে জানাল কিশোর, তারপর দোকানের মালকিন সেনিয়রা রোজকে জিজ্ঞেস করল ওটা তিনি কোত্থেকে পেয়েছেন।

'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক,' বললেন রোজ। 'আধঘণ্টা আগে হোটেলের এক গেস্ট, সেনিয়র মালদিনি এটা নিয়ে আসেন।'

'এখানে কেন আনলেন?' ভ্রূ কুঁচকে গেল কিশোরের।

'বিক্রির জন্যে। সেনিয়র মালদিনি বলেছেন তিনি প্লাকটা হোটেলে এনেছেন কারণ এক কালেক্টর এখান থেকে ওটা ডেলিভারি নেবে। কালেক্টর উত্তর আমেরিকার লোক, সেনিয়র রবার্ট। এই হোটেলেই উঠেছিল। কিন্তু সেনিয়র মালদিনি পৌঁছে দেখল ভদ্রলোক বাইরে গেছে, ফেরেনি তখনও।'

একের পর এক মিথ্যে নীরবে শুনছে কিশোর। মহিলাকে আরও বলার সুযোগ দেবার জন্যে ঘনঘন মাথা দোলাল।

হাসলেন সেনিয়রা রোজ, জিজ্ঞেস করলেন, 'অনেক কথা তো বললাম। এবার তুমি বলো তো কেন প্লাকের ব্যাপারে এতো কৌতূহল তোমার?'

প্লাকটা আঙুল তুলে দেখাল কিশোর। 'কারণ এটা আমার এক বান্ধবীর জিনিস। চুরি হয়ে গিয়েছিল।'

হাঁ হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। 'বলো কি! তাহলে আমি তো ফেঁসে যাব! চুরি? কি সর্বনাশ!'

'পুরো ঘটনা বলুন, প্লীজ,' বললেন পেদরো।

মহিলার চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। বড় করে শ্বাস নিয়ে বলে গেলেন। 'সেনিয়র মালদিনি বলল প্লাকটা আবার বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলায় যেতে চায় না। জিজ্ঞেস করল আমি ওটা কিনতে চাই কিনা।'

'আর আপনি কিনলেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়লেন রোজ। 'ঠিক তখনই এক মহিলা ঢুকলেন দোকানে। কালেক্টর তিনি। প্লাকটা দেখেই বুঝলেন পুরোনো দামী জিনিস। সেনিয়র মালদিনি ওটা বিক্রি করতে চায় শুনে জিজ্ঞেস করলেন কতো হলে বিক্রি করবেন। যখন মালদিনি বলল একশো পঞ্চাশ ডলার হলে, তখনই মহিলা ওটা কিনে নিলেন। আমাকেও কমিশন বাবদ খুশি হয়ে দশ ডলার দিলেন।'

সেনিয়র পেদরো জানতে চাইলেন মহিলা প্লাকটা নিয়ে যাননি কেন।

'তখনই ভারী প্লাক বয়ে ঘরে নিয়ে যেতে চাননি উনি। বললেন আপাতত আমার কাছেই থাকুক।'

মালদিনির চেহারার বর্ণনা জানতে চাইল কিশোর। সেনিয়রা রোজ জানালেন লোকটা বেঁটেখাটো, লাল চুল, পরনে সাদা-কালো চেক স্পোর্টস জ্যাকেট।

ষাঁড়ের সামনে ছেলেটার সঙ্গে যে-লোকটা কথা বলছিল তাকে মনে পড়ে গেল কিশোরের। লোকটার পরনে সাদা-কালো একটা জ্যাকেট ছিল। হ্যাট এতো টেনে নামানো ছিল যে চুলের রং দেখা যায়নি। হতে পারে ওই লোকই ষাঁড়ের বাঁধন খুলে দিয়েছিল। ছেলেটাকে হয়তো কিছু টাকা দিয়ে বলে দিয়েছিল ওরা কেউ ষাঁড়ের পিঠে উঠলে জন্তুটার পেছনে লাঠি দিয়ে বাড়ি লাগাতে।

বুঝতে পারছে কিশোর, লোকটা ওদের দেরি করিয়ে দিতে চেয়েছিল, যাতে ওরা ঘরে ফিরতে না পারে। এই সুযোগে প্লাক চুরি করা হয়।

লোকটা নির্ঘাত প্লাকের ছবি তুলেছে বা নক্সা এঁকে নিয়েছে। তারপর তার

কাছে জিনিসটার আর কোন গুরুত্ব ছিল না। চোরাই জিনিস নিজের কাছে রাখা বিপজ্জনক। বিক্রি করে যা পাওয়া যায় তা-ই লাভ বলে ধরে নিয়েছে।

চালাক লোক, স্বীকার না করে পারল না কিশোর। হোটেলের গিফট শপে জিনিসটা গছিয়ে দেয়ার চিন্তা তা না হলে তার মাথায় আসত না।

সেনিয়র পেদরোর দিকে তাকাল কিশোর। 'মিস্টার রবার্ট কতো নম্বর রুমে উঠেছিল? লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে ডেস্কের দিকে চলে গেলেন সেনিয়র পেদরো, গেস্ট রেজিস্টার দেখবেন। কিশোরকে প্লাকটা দিয়ে দিলেন সেনিয়রা রোজ।

'আশা করি এটা দেখে তোমার বান্ধবীর মন ভাল হবে। পুলিশ যদি প্রতারক লোকটাকে ধরতে না পারে তাহলে আমার কাস্টোমারের দেড়শো ডলার মার যাবে।'

'আমিও চাই লোকটা ধরা পড়ুক,' বলে বিদায় নিল কিশোর। ডেস্কে পৌঁছে দেখল মোটা একটা খাতায় চোখ বুলাচ্ছেন সেনিয়র পেদরো।

একটু পর মুখ তুলে তাকালেন। 'খাতায় সেনিয়র মালদিনি বা মিস্টার রবার্টের নাম নেই!'

ধক করে উঠল কিশোরের বুক। চোর তো পালিয়েইছে, তার কাছে রহস্য উদ্‌ঘাটনের সমস্ত চাবিকাঠিও আছে।

তৃতীয় তলায় উঠে এলো কিশোর। মুসা আর রবিন এখনও লিন্ডাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

'খবর ভাল,' গলাটা উৎফুল্ল করার চেষ্টা করল কিশোর। 'প্লাকটা ফেরত পাওয়া গেছে।'

'কোথায় পেলে?' চোখ ডলল লিন্ডা।

সংক্ষেপে কি ঘটেছে জানাল কিশোর। বলল মালদিনি নক্সা পেয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করছে ও। 'লোকটা বোধহয় হেনরি ওয়াল্টার আর মরিয়েন্তোসের দলের লোক।'

'ওদের আগেই এই রহস্যের সমাধান করতে হবে আমাদের,' দৃঢ় শোনাল মুসার গলা।

ডিনারের আগে দু'জন পুলিশ অফিসার এলো লিন্ডা আর তিন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। সেনিয়রা রোজকে জেরা করে এসেছে তারা। মালদিনির কাছ থেকে যে মহিলা প্লাকটা কিনেছিলেন তাঁকেও জানানো হয়েছে। পুলিশ অফিসাররা বলল ভীষণ রেগে গেছেন মহিলা। তিনি হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করেছেন।

'তাঁর দাবীর সঙ্গে অবশ্য তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই,' বলল একজন। 'মালদিনিকে ধরতে পারলে তোমাদের জানাব আমরা। এমন কিছু যদি তোমাদের জানা থাকে যাতে তদন্তে সুবিধে হবে তাহলে বলতে পারো।'

মালদিনি আর মরিয়েন্তোসের মধ্যে সম্পর্ক থাকতে পারে, নিজের সন্দেহের

কথা বলল কিশোর। বলল রকি বীচের হেনরি ওয়াল্টারের সঙ্গেও এদের যোগসাজস থাকার সম্ভাবনা আছে। সে-ও প্লাকটার ব্যাপারে উৎসাহী।

ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিল পুলিশ অফিসাররা।

সে-রাতে পুলিশের কাছ থেকে কোন খবর পেল না ওরা। পরদিন সকালেও না। হতাশা পেয়ে বসল লিন্ডাকে।

ওর মন ভাল করতে রবিন বলল, 'মালদিনি এতোক্ষণে এখান থেকে হাজার মাইল দূরে ভেগে গেছে। আমাদের আর বিরক্ত করতে আসবে না।'

প্লাকটা সঙ্গে নিয়ে অ্যারায়ানেস জঙ্গলে যাবে, ঠিক করল কিশোর। ওখানে গার্ডকে দেখাবে নক্সাগুলো। হয়তো কিছু বলতে পারবে লোকটা।

সকাল দশটায় নাস্তা সেরে লঞ্চে উঠল ওরা। মাঝখানে একটা কেবিন আছে লঞ্চের, বিশজন যাত্রী বিশ্রাম নিতে পারে। সামনের ডেকেও বসতে পারবে অনেকে। একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় সারেঙের হুইল হাউসে। যাত্রীদের ওখানে যাওয়া নিষেধ।

দিনটা মেঘলা। আকাশে থোকা থোকা ঘন কালো মেঘের মেলা। বাতাসে উড়ে যাচ্ছে দিগ্বিদিকে। লেকের পানিতে ছোট ছোট ঢেউ।

যাত্রীদের মনে খারাপ আবহাওয়ার কোন প্রভাব পড়েনি, হাসি-ঠাট্টায় মেতে আছে সবাই। এক ইংরেজ দম্পতির সঙ্গে খাতির হয়ে গেল ওদের। লিন্ডার মতোই ভদ্রলোকেরও ছবি তোলার খুব শখ। দু'জনে ব্যস্ত হয়ে লেকের দু'পাশের বরফ মোড়া পর্বত চূড়োর ছবি তুলে চলেছে।

লঞ্চটা আধঘণ্টা চলার পর গতি কমাল। একটু পরে থেমে গেল এঞ্জিন। পার হয়ে গেল বেশ কিছুক্ষণ, তারপর হুইল হাউস থেকে বের হলো সারেং। কেবিনে ঢুকে ঘোষণা দিল সে: 'সিন গ্যাসোলিন!'

'তেল শেষ!' বিস্মিত হয়ে আওড়াল কয়েকজন ট্যুরিস্ট।

'এখন কি করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

সারেঙের চেহারায় দেখা দিল চওড়া আন্তরিক হাসি। ভড়ভড় করে স্প্যানিশে কি যেন বলল। তিন গোয়েন্দাকে অনুবাদ করে শোনাল লিন্ডা।

'লোকটা জানতে চাইছে আমাদের মধ্যে কে সাঁতরে তীরে গিয়ে সাহায্য আনবে!'

সাত

সারেঙের বলার ভঙ্গিতে কয়েকজন ট্যুরিস্ট হেসে ফেললেও বাকিরা রেগে গেল। ফাজলেমি নাকি! লেক নাহুয়েল হুয়াপির মাঝখানে আটকা পড়েছে সবাই।

'এই আদেখিলেপনার কোন ক্ষমা নেই,' মন্তব্য করল এক মহিলা।

'সাহায্য আসার আগে হয়তো অনেক সময় পার হয়ে যাবে,' বলল আরেকজন।

মুখে কিছু বলল না কিশোর। মনে মনে অধৈর্য বোধ করছে ও। ভাবছে। আজকে অ্যারায়ানেস জঙ্গলে এই একটা লঞ্চই যাবার কথা। তার মানে আজকে যদি ওরা জঙ্গল দেখতে যেতে না পারে তাহলে আর দেখাই হবে না। আগামীকাল সকালে লিমায় ফিরে যাচ্ছে ওরা।

মুসা বিড়বিড় করে বলল, 'হয়তো শব্দফাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কোন সূত্র আমাদের চোখ এড়িয়ে যাবে।'

যে ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে ওদের খাতির হয়েছে তিনি হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাব দেখে মনে হলো কিছু একটা করেই তবে ছাড়বেন। মই বেয়ে সোজা সারেঙের ঘরে চলে গেলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী মিসেস হার্ভি, তিনি ওদের জানালেন যে তাঁর স্বামী পেশায় এঞ্জিনিয়ার। ভদ্রলোকের ধারণা তেলের অভাব নয়, অন্য কোন কারণে থেমে গেছে লঞ্চ।

'তাঁর ধারণা সত্যি হলে বাঁচি,' নিচু গলায় বলল রবিন।

'হয়তো এঞ্জিন ঠিক করতে পারবেন উনি,' বলল মুসা।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল লিন্ডা। 'এই রহস্যের শুরু থেকে একটার পর একটা বাধাই শুধু আসছে সামনে।'

'এতো হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' বন্ধুদের সান্ত্বনা দিল কিশোর।

দরজায় দাঁড়িয়ে লিন্ডাকে ডাক দিলেন ইংরেজ ভদ্রলোক। লিন্ডা যাওয়ার পর বললেন, 'এলোকটা মোটেই ইংরেজি বোঝে না। আমার হয়ে অনুবাদের কাজটা করে দেবে তুমি?'

খুশি হয়ে রাজি হলো লিন্ডা। প্রথমেই সারেংকে জানাল ইংরেজ ভদ্রলোক একজন এঞ্জিনিয়ার। এঞ্জিন পরীক্ষা করে দেখতে চান। কাঁধ ঝাঁকাল সারেং, ইশারায় কাজ শুরু করতে বলল।

এঞ্জিন ঘরটা সারেঙের টঙের নিচে। একটা দরজা দিয়ে সেখানে যেতে হয়।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ডেকে যারা ছিল তারা হুড়োহুড়ি করে কেবিনে গিয়ে ঢুকল। কিশোর, মুসা আর রবিন লিন্ডার পেছনে সারেঙের ঘরে এসে দাঁড়াল।

মিস্টার হার্ভি তার আর পাইপগুলো পরীক্ষা করে দেখছেন। লিন্ডাকে অনুবাদ করতে অনুরোধ করলেন।

'সারেংকে বলো আমি বুঝেছি লঞ্চে তেলের অভাব নেই। ফুয়েলের লাইন জ্যাম হয়ে গেছে। নিজে সে লাইন পরিষ্কার করতে পারবে কিনা জানতে চাও।'

স্প্যানিশে এঞ্জিনিয়ার সাহেবের বক্তব্য শুনে একান ওকান হাসল সারেং, ঘন ঘন মাথা দোলাল। লাইন পরিষ্কার করতে জানে সে।

দেরি না করে কাজে লেগে গেল লোকটা। একটু পরই মৃদু গর্জন ছেড়ে চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। স্বস্তির শ্বাস ফেলল যাত্রীরা।

প্রথম যাত্রা বিরতি ভিক্টোরিয়া দ্বীপে। এখানে একটা টিলা পেরিয়ে চমৎকার হোটেলে জড়ো হলো যাত্রীরা। দুপুরের খাবার দারুণ জমল।

একটু পরেই আবার শুরু হলো যাত্রা। বৃষ্টি ধরে এসেছে, এখন গুঁড়িগুঁড়ি পড়ছে। ওরা অ্যারায়ানেস অরণ্যের কাছে পৌঁছুনোর আগেই আকাশে জ্বলজ্বলে সূর্য দেখা দিল। আকাশে সোনালী মেঘের ভেলা।

'কি দারুণ!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারল না মুসা।

লালচে-হলদে বনের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

লঞ্চ জেটিতে থামতেই দ্রুত পায়ে নামল ওরা। বনে প্রবেশের আগে থমকে দাঁড়াতে হলো। একটা গাছে পেরেক ঠুকে আটকে রাখা হয়েছে বিরাট একটা প্লাক।

'কোন সূত্র নয় তো?' জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

ওর প্লাকটার মতোই অ্যারায়ানেস কাঠ দিয়ে জিনিসটা তৈরি। গায়ে স্প্যানিশে কি যেন লেখা আছে। পড়ল ও।

'গাছ মানুষের বন্ধু। গাছের ক্ষতি করবেন না।'

'না, কোন সূত্র নয়,' মাথা নাড়ল লিন্ডা।

ছোট-বড় আলগা পাথর আর নুড়িতে ভরা সৈকত ধরে এগোল ওরা। প্রত্যেকেই অবাক হয়ে দেখছে অদ্ভুত জঙ্গলটা।

'মনে হচ্ছে যেন রূপকথার রাজ্যে চলে এসেছি,' বলল রবিন।

সুদীর্ঘ গাছগুলো সোজা উঠে গেছে আকাশের গা বেয়ে। জড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে। একেকটা শেকড় থেকে পাশাপাশি জন্মেছে বেশ কয়েকটা করে গাছ। প্রতিটার গা থেকে আবার বের হয়েছে আকাশমুখী ডাল।

ছাল নেই গাছগুলোর। কাণ্ডে হাত বোলাল মুসা। 'একেবারে সিল্কের মতো মসৃণ।'

'চিরহরিৎ গাছ,' বলল কিশোর। 'কাঁটা নেই কোন।' মুখ তুলে সবুজ পাতার সামিয়ানা দেখল ও, আকাশ ঢেকে রেখেছে।

'কি প্রশান্তিময়,' মন্তব্য করল লিন্ডা।

একটা শেকড়ের ওপর দাঁড়াল রবিন। শেকড়টা মাটির ওপর দিয়ে অনেকদূরে চলে গেছে, তারপর একটা গাছের কাছে গিয়ে মাটিতে সেঁধিয়েছে। 'অদ্ভুত তো!'

একজন ট্যুরিস্ট ওদের আলাপ শুনেছে। বলল, 'ওই শেকড়গুলো দূরে গিয়ে আরেকটা গাছের জন্ম দেয়। এই জঙ্গলের নিচে শেকড়ের আস্ত একটা রাজ্য আছে।'

'আসলে গাছগুলোকে ঝোপ বললেও মিথ্যে বলা হবে না,' মন্তব্য করল কিশোর। 'একসময় হয়তো এগুলোর পাতা খেয়েই বাঁচত ডিপ্লোডোকাসেসরা।'

'কি কাসেস?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

হাসল কিশোর। 'ডিপ্লোডোকাসেস। তৃণভোজী ডায়নোসর।'

মুসার চোখে অস্বস্তি দেখা দিল। 'দক্ষিণ আমেরিকাতেও ওসব দানব প্রাণী ছিল?'

'নিশ্চয়ই!'

সুন্দর একটা কাঠের কুটিরের সামনে দিয়ে গেছে পথ। ছেলেরা আন্দাজ করল ওটাতেই থাকে সরকারী বনরক্ষী প্রহরী। কিশোর বলল ফেরার পথে এখানে থামবে, লোকটা থাকলে কথা বলবে তার সঙ্গে।

বিশ মিনিট পর কুটিরের দরজায় টোকা দিল ওরা। হাসিখুশি মাঝবয়সী এক লোক দরজা খুলল। কিশোর জঙ্গল বিষয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চায় শুনে মাথা দোলাল সে, এক পাশে সরে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল।

নিজেদের পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডা। বনরক্ষী বলল তার নাম রেমারিক। জানতে চাইল কি সাহায্যে আসতে পারে।

লিন্ডার প্লাকটা কাপড়ের মোড়ক খুলে তাকে দেখাল কিশোর।

মনোযোগ দিয়ে জিনিসটা দেখল প্রহরী। বলল, 'অনেক পুরোনো জিনিস। নক্সাগুলো একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, কোন সঙ্কেত থাকলেও থাকতে পারে।'

একটু হতাশ বোধ করল কিশোর। বলল, 'তিনশো বছর আগের জিনিস। অ্যারায়ানেস কাঠ দিয়ে তৈরি। আপনাদের কাছে কি কোন রেকর্ড আছে, কে তিনশো বছর আগে এদিকে থাকত?'

মাথা নাড়ল রেমারিক। 'না, কোন রেকর্ড নেই। তখন একদম বুনো জায়গা ছিল এটা। কখনও শুনিনি এদিকে লোক বাস করত।'

লিন্ডা জানাল ওর পূর্ব পুরুষ আগুস্তো পিনোশে চাকতিটাতে নক্সা খোদাই করেছিলেন। 'কেউ জানে না কি বলা হয়েছে সঙ্কেতের মাধ্যমে। আমরা ধাঁধাটা মেলাবার চেষ্টা করছি।'

কৌতূহল বোধ করছে বনরক্ষী। জিজ্ঞেস করল লিন্ডা তার পূর্ব পুরুষ সম্বন্ধে আরও কিছু জানে কিনা।

'ভাল শিল্পী ছিলেন উনি,' বলল লিন্ডা। 'অভিযাত্রী মানুষ। অনেক জায়গায় ঘুরেছেন।'

রেমারিক বলল একজন লোককে সে চেনে যে হয়তো ওদের সাহায্য করতে পারবে। 'কিন্তু সে এখানে থাকে না। বুড়ো মানুষ। ইনকা জাতির লোক। কাযকো শহরে বাস করে। পেরুতে। দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত কিংবদন্তী তার জানা। আর কেউ এতোটা জানে না।'

লিমা থেকে কাযকো অনেক দূরে। চিন্তিত হয়ে পড়ল কিশোর। অতোদূর যাওয়া কি পোষাবে? সত্যি গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য দিতে পারবে ইন্ডিয়ান লোকটা?

যেন ওর প্রশ্নের জবাব দিতেই রেমারিক বলল, 'তোমাদের রহস্যের ব্যাপারে মাহোপানি কোন সাহায্য করতে না পারলেও ক্ষতি নেই। দক্ষিণ আমেরিকায় এসে কাযকো না দেখে যাওয়া বোকামি। শহরের আসল দেয়াল বেশ

কয়েকটা টিকে আছে এখনও। তাছাড়া আছে ভাঙা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।'

'মাহোপানির সঙ্গে দেখা করতে পারলে ভাল হয় তাহলে,' বলল কিশোর। 'মনে হচ্ছে সে আমাদের সাহায্য করতে পারবে।'

বনরক্ষী বলল ওদের দেখলে খুশি হবে ইন্ডিয়ান বুড়ো। চোখ টিপে বলল, 'মাহোপানি বোধহয় তোমাদের দেখলেই বলবে, "মুনানকি! ইমায়ন্যান কাস্কিয়ানকুই!"'

'স্প্যানিশ তো নয়!' বলল লিন্ডা। 'মানে কি কথাগুলোর?'

হাসল প্রহরী। 'প্রাচীন ইনকাদের ভাষা। কুয়েচুয়া। মানে হচ্ছে, কি খবর! কেমন আছো তোমরা?'

বারকয়েক শব্দগুলো আউড়ে নিল ওরা। কিশোর জিজ্ঞেস করল জবাবে কি বলা উচিত।

'বলবে, "হাক্কালা, ইউসুল পেইকি।"'

রবিন বিড়বিড় করে বলল ওর দাঁত পড়ে যাবে উচ্চারণ করতে গেলে। গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'আমার পক্ষে সম্ভব না।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'আর এটার মানে কি?'

'"ভাল, ধন্যবাদ"। আর বিদায় নেবার সময় বলবে, কুটিমুনাইকিকামা। ওর মানে হলো শুভ বিদায়।'

কথাগুলো মুখস্থ করে নিল কিশোর, রবিন আর লিন্ডা। মুসা কুটিরের ভেতরটা ঘুরে দেখছে। এক দেয়ালে চোখ পড়তেই থেমে দাঁড়াল ও। অনেকগুলো রংবেরঙের সুতো দিয়ে জালের মতো জিনিসটা তৈরি, দেয়ালে ঝুলছে বেশ কয়েকটা পেরেক থেকে। ওটা কি জানতে চাইল ও।

'কুইপু,' বলল রেমারিক। 'আগের দিনের ইনকারা এগুলো দিয়েই ইতিহাস লিখে রাখত। কোন অক্ষরের বালাই ছিল না তাদের। দেখাচ্ছি কি করে এভাবে তথ্য রাখা হয়।'

বিভিন্ন রঙের সুতো বিভিন্ন জিনিসের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হতো। 'যেমন, লাল সুতোর মানে রাজা। গিঁঠগুলো থেকে বোঝা যাবে কয়টা বউ আর কয়টা বাচ্চা আছে তার।'

'তাহলে তো বউয়ের সীমা সংখ্যা ছিল না বুড়ো রাজার,' গিঁঠ দেখে মন্তব্য করল মুসা।

রেমারিক জানাল গবেষকরা এখনও কুইপুর রহস্য নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। ইনকাদের গিঁঠের সঠিক মানে যদি বের করা সম্ভব হয় তাহলে অনেক অজানা ইতিহাস মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হবে।

বাইরে থেকে লঞ্চের ভেঁপু শুনতে পেল ওরা। যাত্রীদের ডাকছে। একটু পরেই রওনা দেবে।

রেমারিককে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় চাইল ওরা। কুটির ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, এমন সময় রেমারিক বলল, 'কাযকোতে যদি যাও তাহলে মাচু পিচু

যেতে ভুলো না যেন। কাযকোর চেয়েও বড় রহস্য মাচু পিচু। কেউ জানে না ওটা যখন শহর ছিল তখন দেখতে কেমন ছিল।'

ওরা ঘাটের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মুসা, 'সাবধান!'

হাতের মুঠোর সমান বড় একটা পাথর ছুটে আসছে বনের দিক থেকে। অজান্তেই মাথা নিচু করে নিল ওরা। কিশোরের পাশে একটা গাছে আঘাত হানল পাথরটা, তারপর পিছলে এসে খটাস্ করে লাগল ওর মেরুদণ্ডে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল কিশোরের শরীর। সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ব্যথা। চোখে অন্ধকার দেখল ও। ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে।

আট

বন্ধুরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে দেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বিড়বিড় করে বলল, 'কিছু হয়নি। একটু পরেই সেরে যাবে।'

লিন্ডা গেল লঞ্চের সারেংকে জানাতে যে ওদের আসতে খানিক দেরি হবে।

কিশোরের মারাত্মক কিছু হয়নি বুঝে বনের দিকে ছুটে গেল মুসা। যে-লোক পাথর ছুঁড়েছে তাকে ধরতে পারলে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। কিছুক্ষণ খুঁজে ক্ষান্ত দিল ও। কাজটা যারই হোক, ভেগেছে এতোক্ষণে।

তবুও অপেক্ষা করল মুসা, একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে বলছে, শয়তানটাকে একবার হাতের কাছে পেলে জুডোর প্যাঁচ কাকে বলে দেখিয়ে দেব।

দু'মিনিট পরে একটা মোটরবোটের এঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ শুনতে পেল ও। আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখল একটা গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে বোট। ওটায় দু'জন লোক আছে। দু'জনেরই পিঠ ওর দিকে, তবুও মালদিনিকে চিনতে পারল। সেই একই লাল চুল, সাদা-কালো চেক জ্যাকেট!

'জানা গেল কাজটা কার,' আপন মনে বলল মুসা। বন্ধুদের কাছে ফিরে এলো।

লিন্ডাও ফিরেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কাউকে দেখলে?'

'হ্যাঁ, মালদিনি।'

কিশোরকে হাঁটতে সাহায্য করল ওরা। রবিন চিন্তিত গলায় বলল, 'মালদিনি লোকটা কিশোরকে জখম করতে চাইছে। পুলিশ তাকে ধরতে না পারলে আবার কোন্ বিপদে পড়ব কে জানে!'

'ঠিকই ধরা পড়বে,' বলল কিশোর।

লঞ্চে উঠল ওরা। সারেং আর হার্ভি দম্পতি চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কিশোরকে

সুস্থ দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ভাগ্যিস আরও কোন ক্ষতি হয়ে যায়নি।'

ওরা বলল না কাকে সন্দেহ করছে। কিশোর ঠিক করেছে পুলিশকে জানাবে।

ফেরার পথে আবার ভিক্টোরিয়া দ্বীপে থামল লঞ্চ। 'সারেং জানাল এখানে যাত্রীরা ইচ্ছে করলে এক-দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পারে। হোটেলে গিয়ে ঘর ভাড়া করল তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডা। একটু পরই চা দিয়ে গেল বেল-বয়। লিন্ডা ফোন করল পুলিশে। চায়ের পালা চুকতেই বন্ধুদের জোরাজুরিতে বিছানায় শুলো কিশোর। পিঠ ফুলে গেছে ওর। ব্যথায় টিশটিশ করছে।

'একটা ঘুম দিয়ে নাও,' পরামর্শ দিল মুসা।

শুনল কিশোর। দু'মিনিট পার হওয়ার আগেই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে লিন্ডা, মুসা আর রবিন বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। নিচতলায় বসল ওরা। লঞ্চ ছাড়ার দশ মিনিট আগে কিশোরকে ঘুম থেকে জাগাল।

'ঘুমটা দরকার ছিল,' লঞ্চে উঠে বন্ধুদের বলল কিশোর। 'মনে হচ্ছে যেন একদম সেরে গিয়েছি।'

হোটেল লাও-লাওতে ফিরে সেনিয়র পেদরোর কাছে গেল ওরা। কিশোর জানতে চাইল মালদিনি বা সেই থমাস ছেলেটার কোন খবর আছে কিনা।

'না,' বললেন সেনিয়র পেদরো। 'এখনও কোন খবর নেই।'

রাতের খাবারের সময় হয়ে আসতে কিশোর বলল, 'শরীরটা ভাল লাগছে না। তোমরা ডাইনিং রুমে যাও, আমি বরং খাবার ঘরে আনিয়ে খাব। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে চাইছি।'

'সেটাই ভাল হবে,' বলল মুসা। 'আজকে খুব ধকল গেছে তোমার ওপর দিয়ে।'

একটু পরে কিশোরকে রেখে নিচতলার ডাইনিং রুমে নামল রবিন, মুসা আর লিন্ডা। আগেই টেবিল বুক করে রেখেছে ওরা। সেটার দিকে যেতে হলে পাশ কাটাতে হয় দীর্ঘ একটা টেবিল। অনেক লোক বসেছে ওটায়। সেনিয়র পিনোশেও আছেন তাদের মধ্যে। টেবিলের এক মাথায় তাঁর আসন।

'মজা করছ তো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'কিশোর কোথায়, দেখছি না যে?'

একটু দ্বিধা করে আজকে কি ঘটেছে তাঁকে জানাল লিন্ডা। রবিন বলল, 'কিশোর সহজে হাল ছাড়বে না। আপাতত ওর বিশ্রাম দরকার। সেজন্যেই নিচে নামেনি। ওর ডিনার ওপরে পাঠিয়ে দেব আমরা।'

'পরে কথা হবে,' বললেন সেনিয়র পিনোশে। 'কাল কিন্তু পেরুতে ফিরে যাচ্ছি আমরা, সকাল সকাল উঠতে হবে। তোমরাও বিশ্রাম নিয়ে নাও।'

নিজেদের টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। কিশোরের জন্যে ওপরে খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করল। একটু পরেই খাবার সার্ভ করা হলো ওদের।

তিনরকমের মাছ ভাজা, চিকেন সালাদ, সব্জির সালাদ, অর্ধেকটা মেলোন, ক্রীম সুপ, মশলাদার আলু ভাজা আর ডেজার্ট। খাবার শেষ করল ওরা আইসক্রীম দিয়ে।

তৃপ্তির ঢেকুর তুলল মুসা। পেটে আলতো করে চাপড় দিল। 'মনে হচ্ছে পেট ফেটে যাবে!'

হাসল রবিন আর লিন্ডা। লাউঞ্জে বসল ওরা, কিছুক্ষণ নানান বিষয়ে গল্প করার পর লিন্ডা বলল, 'বুঝতে পারছি না কিশোরকে এই রহস্য সমাধান করতে কোন সাহায্য করতে পারব কিনা। মাথা ঘামিয়েও কোন উপায় তো দেখতে পাচ্ছি না।' একটু থেমে নিজের পরিকল্পনা জানাল ও।

হোটেলের দোকান থেকে বিরাট একটা স্প্যানিশ শাল আর ফ্যান কিনবে ও। পোশাকটা স্প্যানিশ নর্তকীদের। ওটা পরে সারা হোটেল ঘুরবে, মালদিনিকে খুঁজবে।

'তাকে কোথায় পাওয়া যাবে তা তো জানি না আমরা,' বলল রবিন।

'এই হোটেলের বেযমেন্টে বড় একটা ক্যাসিনো আছে,' বলল লিন্ডা। 'অনেকরকম খেলার আয়োজন আছে ওখানে।'

'তো?' আরও জানতে চাইছে মুসা।

'হয়তো মালদিনি ওখানে আসবে। আমি যদি আমার ছদ্মবেশ টিকিয়ে রাখতে পারি তাহলে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারব। হয়তো জরুরী কিছু জানাও সম্ভব হবে।'

'পুলিশের হাতে তুলে দেয়া যাবে লোকটাকে,' বলল রবিন।

'হ্যাঁ।'

'কাজটায় ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়,' ভ্রূ কুঁচকে বলল মুসা।

'আর কোন উপায় আছে?' রবিন আর মুসার ওপর চোখ বোলাল লিন্ডা। 'এক কাজ করা যায়। তোমরা আমার ওপর চোখ রেখো।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো মুসা। 'প্রথমে রবিন পাহারায় থাকুক, তারপর থাকব আমি। ক্যাসিনোর দরজায় দাঁড়ালে দেখা যায় এমন জায়গায় থেকো। আমরা ভেতরে ঢুকতে পারব না। বয়সের কারণে সবার সন্দেহ হবে।'

ছদ্মবেশের জন্যে পোশাক কিনতে চলে গেল লিন্ডা। নিজেদের ঘরে ফিরে এলো মুসা আর রবিন। একটু পরে হালকা টোকা শুনে দরজা খুলে দিল রবিন। লিন্ডাকে চিনতে কষ্ট হলো ওদের। মুখ ঢেকে রেখেছে শাল দিয়ে। মনে হচ্ছে পাকা নর্তকী।

'আমি যাওয়ার দশ মিনিট পর যাবে তুমি, রবিন।' হাত নেড়ে বিদায় নিল লিন্ডা। পাউডার রুমে গিয়ে আরও ভাল করে সাজল।

দশ মিনিট পর ক্যাসিনোর দরজার কোনায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে চমকে গেল রবিন। একেবারে বদলে গেছে লিন্ডা। চুলগুলো মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। পেছনে আটকে আছে লম্বা একটা স্প্যানিশ চিরুনি। চুলের পেছন থেকে ঝুলছে শালটা, পিঠে লুটাচ্ছে, স্প্যানিশ পোশাকের অনেকটাই ঢেকে দিয়েছে ওটা। শালের দু'প্রান্ত পড়ে আছে লিন্ডার দু'কাঁধে।

আইব্রাউ দিয়ে ভ্রূ আরও কালো করেছে ও। দীর্ঘ নকল পাপড়ি লাগিয়েছে।

দেখে মনে হচ্ছে বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে ওর। লাস্যময়ী এক নারীতে পরিণত হয়েছে।

আপন মনে হাসল রবিন। নাহ্, সাবধান থাকতে হবে। কখন কোন্ যুবক লিন্ডাকে নিয়ে ভেগে যায় কে জানে!

ক্যাসিনোর ভেতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। অনেক মানুষের ভিড়। বেশির ভাগই জুয়ার টেবিল ঘিরে। সামনে এগিয়ে যাচ্ছে লিন্ডা, টেবিলগুলো থেকে ওকে খেলার জন্যে আহ্বান করা হচ্ছে, রাজি হচ্ছে না। জিজ্ঞেস করছে, 'আমি সেনিয়র মালদিনিকে খুঁজছি। তাঁকে দেখেছেন আপনি?'

মাথা নাড়ছে সবাই। অনেকে মালদিনিকে চেনেই না। তবে কালো চুলের এক যুবক ব্যতিক্রম। লিন্ডাকে দাওয়াত দিল সে। লিন্ডা ওর প্রশ্নটা করতেই বলল, 'আরে, মালদিনি তো আমাকে বলেনি এতো সুন্দরী কারও সঙ্গে ডেট্ আছে ওর।'

অবাক হলো লিন্ডা। লোকটা ইংরেজিতে কথা বলেছে। আবার বলল, 'মালদিনি আজ রাতে আসতে পারছে না। বিকেলে একটা কাজ করতে গিয়ে হাত জখম হয়ে গেছে ওর।'

সম্ভবত কিশোরের দিকে পাথর ছুঁড়ে, মনে মনে বলল লিন্ডা।

কালো চুলের অপরিচিত লোকটা দাঁত বের করে হাসছে। বলল, 'তুমি চাইলে অবশ্য মালদিনি আর ওর বোনের কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।'

সাহস করে ক্যাসিনোর ভেতরে ঢুকে পড়েছে রবিন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে চাচাকে খুঁজতে এসেছে। লিন্ডার কাছাকাছি দাঁড়াল ও। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে দু'জনের কথা। বুঝতে পারছে লোকটার কথায় রাজি হওয়া লিন্ডার উচিত হবে না। বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়।

হতাশ হতে হলো ওকে। লিন্ডা বলল, 'মালদিনির সঙ্গে দেখা করতে পারলে ভাল হয়।'

'চলো তাহলে।'

'মালদিনি কোথায়?'

'আগে চলো তো,' হাসল কালো চুল, 'যেতে যেতে বলছি।'

ক্যাসিনোর পাশের একটা দরজা দিয়ে লিন্ডাকে নিয়ে বের হলো লোকটা। হোটেলের চত্বর পেরিয়ে লঞ্চ ঘাটের দিকে এগোল।

অনুসরণ করল রবিন। অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করছে ও। সাধ্যমতো যতোটা সম্ভব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে।

ঘাটে মৃদু ঢেউয়ে দুলছে একটা মোটরবোট। লিন্ডার হাত ধরল লোকটা বোটে উঠতে সাহায্য করবে বলে। ঠিক তখনই সিদ্ধান্ত পাল্টাল লিন্ডা। হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। যাবে না লোকটার সঙ্গে।

কিন্তু হাত ছাড়ল না লোকটা। আরও শক্ত করে বাহু চেপে ধরল। 'ওঠো!' খেঁকিয়ে উঠল কর্কশ স্বরে। 'মালদিনির বন্ধু নও তুমি। আসলে কে সেটা জেনে

তবে ছাড়ব!'

ঝটকাঝটকি করছে লিন্ডা। ওকে সাহায্য করতে দৌড়ে সামনে বাড়ল রবিন। পেছনে পায়ের শব্দ পেল।, তারপর মুসার চিৎকার। মুসাও চলে এসেছে।

তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করতে শুরু করল লিন্ডা।

ওকে ছেড়ে দিয়ে লাফ দিয়ে বোটে উঠল লোকটা, দড়ির বাঁধন খুলে বোট সরিয়ে নিল চালক। আঁধারে তাকে চেনা গেল না। এঞ্জিন স্টার্ট দিতেই গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে ছুটতে শুরু করল বোট, দেখতে দেখতে অন্ধকার লেকে মিলিয়ে গেল।

নয়

'কিছু হয়নি তো?' একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করল রবিন আর মুসা। মুসা হাঁপাচ্ছে।

'না,' ওদের দুশ্চিন্তামুক্ত করল লিন্ডা। 'হাতটা খুব শক্ত করে ধরেছিল। একটু ব্যথা করছে, এই যা।'

লিন্ডার কাপড়ে ভাঁজ পড়ে গেছে। চুল এলোমেলো। হোটেলের দিকে ফিরতে শুরু করল ওরা। ওদিকে বেশ কয়েকজন লোক ছুটোছুটি করছে।

'কে চেঁচাল? আহত হয়েছে কেউ?' উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করল একজন।

রবিন আর মুসা ইংরেজিতে বোঝানোর চেষ্টা করল, লিন্ডা স্প্যানিশে।

'গেছে কোথায় ব্যাটারা?' জিজ্ঞেস করল এক যুবক। 'ধরতে পারলে দেখিয়ে দিতাম।'

আঙুল তুলে লেক দেখাল রবিন। মোটরবোট চোখের আড়ালে চলে গেছে। 'আর ধরা যাবে না,' বলল লিন্ডা। 'চেষ্টা করে লাভ নেই।'

ভীড় করে থাকা লোকগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে এলো হোটেলের পোর্টাররা, জিজ্ঞেস করল কারা লিন্ডাকে অপহরণের চেষ্টা করছিল।

'চিনি না,' জানাল লিন্ডা।

অন্য একটা চিন্তা মাথায় আসায় মুসা বলল, 'লাল চুল আর সাদা-কালো চেক জ্যাকেট পরা কাউকে হোটেলে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল এক পোর্টার। 'গতকাল দেখেছি। তিন তলায় একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল।' মুসা, রবিন আর লিন্ডাকে চিনতে পেরেছে পোর্টার। বলল, 'তোমাদের ঘরের উল্টোদিকে একটা ঘর নিয়েছিল।'

আরও কিছুক্ষণ উত্তেজিত প্রশ্ন-উত্তর চলার পর রবিন, মুসা জানতে পারল লোকটা প্লাক চুরির সময়ে হোটেলেই ছিল। পোর্টার জানাল সেই লোক হোটেলে আরেকজনের সঙ্গে দেখা করে। তাকে পোর্টার চেনে। ব্যারিলোচেই বাড়ি।

'নামটা বলতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ফ্রেডি ওয়েন। একটা মোটরবোট আছে তার। হয়তো লালচুলের লোকটাকে সে-ই বোটে করে নিয়ে গেছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। তিনজনের মনে একই প্রশ্ন জেগেছে। মোটরবোটের চালক কি তাহলে ফ্রেডি ওয়েন? সে-ই কি অ্যারায়ানেস বনে মালদিনিকে নিয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে?

কারও কোন ক্ষতি হয়নি জানার পর ভীড় আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে গেল। রবিন, মুসা আর লিন্ডা হোটেলে ফিরল। ঘরে ফিরে দেখল জেগে গেছে কিশোর। ওকে সংক্ষেপে ঘটনা জানাল রবিন।

খাটের পাশেই সাইড টেবিলে পড়ে আছে টেলিফোন ডিরেক্টরি। ওটা খুলল কিশোর। পাতা উল্টে গেল। 'এই যে ফ্রেডি ওয়েনের ঠিকানা,' একটু পর বলল ও। 'ব্যারিলোচেই বাড়ি।'

তথ্যটা জানা হলো, এখন কি করবে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সেনিয়র পেদরোকে জানাব আমরা,' বলল কিশোর। 'তাঁকে বলব পুলিশে যোগাযোগ করতে। হাতে এটা ভাল একটা সূত্র।'

কিশোর সেনিয়র পেদরোকে খুলে বলতেই তিনি জানালেন এক্ষুণি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। প্রশংসা করে বললেন, 'বড় হলে ভাল গোয়েন্দা হবে তুমি।'

লজ্জা পেল কিশোর। বলল, 'যা জেনেছি সবই আমার বন্ধুদের কারণে। প্রশংসা আসলে ওদের প্রাপ্য।'

রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা দোলালেন সেনিয়র পেদরো। রিসিভার তুলে নিলেন, ডায়াল করলেন পুলিশের নাম্বারে।

তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডা আশা করেছিল রাতেই কোন খবর পাবে। কিন্তু তা হলো না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর কিশোর বলল, 'আমার ধারণা পুলিশের ভয়ে ওয়েনের সঙ্গে লুকিয়ে পড়েছে মালদিনি, ওয়েনের বাড়িতে থাকেনি। সময় লাগবে ওদের ধরতে।'

সকালে সাতটার সময় বেজে উঠল ফোন। কানের কাছে ক্রিং ক্রিং শুনে ঘুম ভাঙল কিশোরের। রিসিভার তুলে নিল। ব্যারিলোচের পুলিশ স্টেশন থেকে ফোন করা হয়েছে।

'কিশোর পাশা?'

'জ্বী।'

'দু'জন লোককে কাস্টোডিতে এনে রেখেছি আমরা। একজন ফ্রেডি ওয়েন। অন্যজন নাম বলছে না। বোধহয় মালদিনি।'

ডিউটিরত অফিসার কিশোরকে অনুরোধ করলেন যতো দ্রুত সম্ভব এসে লোক দু'জনকে সনাক্ত করতে। সঙ্গে যে দোকানে প্লাক পাওয়া গেছে সেটার মহিলা মালিককেও নিয়ে যেতে বললেন।

'ভদ্রমহিলার ঠিকানা জেনে নিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে আসছি আমি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।' ফোন রেখে দিল কিশোর।

রবিন আর মুসারও ঘুম ভেঙে গেছে। কিশোর তাদের জানাল কি ঘটেছে।

হোটেলের ক্লার্ক বলল রবিবার দোকান খোলা থাকে না। কিশোরের অনুরোধে ভদ্রমহিলার বাসায় ফোন করল সে। ওপ্রান্তে ধরতেই রিসিভার দিল কিশোরকে।

অপরাধী ধরা পড়েছে শুনে খুশি হলেন মহিলা। জানালেন ওদের সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে যাবেন। বললেন, 'ঠিক সাড়ে আটটার সময় তৈরি থেকো তোমরা, আমি গাড়ি করে হোটেলের সামনে থেকে তুলে নেব।'

'অনেক ধন্যবাদ। তৈরি থাকব আমরা।' ফোন রেখে দিল কিশোর।

লিন্ডাও জেগেছে। লবিতে বসে নাস্তা সেরে নিল ওরা। কাপড় পাল্টে তৈরি হয়ে নিল। ঠিক সাড়ে আটটায় হোটেলের ড্রাইভওয়েতে বেরিয়ে এলো ওরা। সেনিয়রা রোজ গাড়ি থামাতেই পেছনের সীটে উঠে বসল তিন গোয়েন্দা। লিন্ডা সামনে।

কাল রাতে লিন্ডাকে অপহরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে শুনে শঙ্কা প্রকাশ করলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, 'তোমাদের অনেক সাহস, নাহলে এমন বিপদের কাজ করতে না।'

'ভয় পেয়েছিলাম খুব,' স্বীকার করল লিন্ডা।

ওরা পুলিশ স্টেশনে উপস্থিত হওয়ার পরে বন্দিদের চীফ ফিদেলের অফিসে নিয়ে আসা হলো।

মালদিনির দিকে আঙুল তাক করে বলে উঠলেন সেনিয়রা রোজ, 'আরেহ্, এ-ই তো সেই লোক! চুরি যাওয়া প্লাকটা এ-ই আমার দোকানে বেচে দিয়ে গেছিল!'

অন্য বন্দিকে দেখালেন পুলিশ চীফ। 'একে চেনা যাচ্ছে?'

মাথা নাড়ল ওরা। 'না,' বললেন সেনিয়রা রোজ।

'ফ্রেডি ওয়েন,' বললেন চীফ। 'কেউ যদি এর বিরুদ্ধে অভিযোগ না আনে তাহলে একে আমরা আটকে রাখতে পারব না।'

তাঁর কথা শেষ হতেই এক পুলিশ অফিসার ঢুকল ঘরে। চীফকে নিচু গলায় কি যেন বলছে।

একটু পরে চীফ ফিদেল বললেন, 'আপনার বাড়িতে অনেক অ্যারায়ানেস কাঠ পাওয়া গেছে, সেনিয়র ওয়েন। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে ওই বন থেকে কাঠ সরানোর আইন নেই। কাজটা বেআইনী।'

বিড়বিড় করল ওয়েন, 'বন থেকে আমি কাঠ নিইনি। অন্য জায়গা থেকে পেয়েছি।'

'কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ। 'ওই বন ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও অ্যারায়ানেস কাঠ পাওয়া যায় না।' অফিসারকে ইশারা করলেন তিনি। 'জবানবন্দি দেবার আগে পর্যন্ত একে আটকে রাখো।' সেনিয়রা রোজ, লিন্ডা আর

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন।

'আমি সবার জবানবন্দি চাই।'

ষাঁড়ের পিঠে কি ঘটেছিল সেখান থেকে বলে গেল কিশোর। লিন্ডা ওকে সাহায্য করল। বলল প্লাকটা হোটেল থেকে চুরি যায়। কিডন্যাপ করার চেষ্টা করা হয় ওকে।

'আমার ধারণা বোটের চালক ছিল এই ওয়েন। আর মালদিনির বন্ধু হচ্ছে কিডন্যাপারটা।'

হাসলেন চীফ। 'আর্জেন্টিনায় সময়টা তোমাদের ভাল কাটেনি দেখছি। পরে কখনও ছুটি কাটাতে এসো। মজার অনেক কিছু আছে আমাদের দেশে।'

'নিশ্চয়ই আসব,' বলল মুসা।

ওদেরকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সেনিয়রা রোজ। ওরা লবিতে ঢুকে দেখল এক মহিলাকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসছেন সেনিয়র পেদরো। মহিলার নামটা জানালেন। সেনিয়রা ভ্যালেজ। ইনিই কালেক্টর, প্লাকটার জন্যে একশো পঞ্চাশ ডলার দিয়েছিলেন। চোর এখন পুলিশের হাজতে শুনে ভদ্রমহিলা খুব খুশি হলেন।

'আপনি পুলিশ স্টেশনে গিয়ে টাকা দাবী করলে ওঁরা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে পারবেন,' জানাল কিশোর।

'তাই করব।' হাসলেন মহিলা। 'ওই অদ্ভুত বাঁদরটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। ওটা হারাতে হলো বলে খারাপ লাগছে।'

নিজেদের ঘরে চলে এলো ওরা। জিনিসপত্র গুছাতে হবে। একটু পরেই ডাক পড়বে ওদের। মিস্টার পিনোশে বলেছেন সকালেই প্লেনে উঠতে চান।

'ওই অ্যারায়ানেস কাঠ যে ওয়েনের বাড়িতে পাওয়া গেল,' বলল রবিন। 'কি মনে হয়, ওই কাঠ দিয়ে কি করত লোকটা?'

'জানি না,' বলল কিশোর। 'জানতে পারলে ভাল হতো। পুলিশ হয়তো বের করতে পারবে। সান্ত্বনা এই যে প্লাকটা এতোকিছুর পরেও আমাদের হাতছাড়া হয়নি।'

'আরও একটা সান্ত্বনা আছে,' বলল মুসা। 'সহি সালামতে যে ফিরতে পারছি সেটা কম কিসে!'

ব্যাগেজ গুছিয়ে তিন গোয়েন্দার ঘরে ঢুকেছে লিন্ডা, বলল, 'গোটা ব্যাপারটা কেমন প্যাঁচ খেয়ে গেল। আমি যখন কিশোরকে তদন্ত করতে বলেছিলাম তখন ভাবতেও পারিনি এতো ঘোরপ্যাঁচ আছে ব্যাপারটার মধ্যে।'

'আমিও না,' হাসল কিশোর। 'তবে রহস্য যতো জটিল হয় তার সমাধানেও ততো মজা।'

একটু পরে এলেন সেনিয়র পিনোশে। গাড়ি করে এয়ারস্ট্রিপে গেল ওরা। ওখানে আগেই অপেক্ষা করছিল দলের বাকিরা। ব্যস্ত সবাই, যাত্রার আগেও মগ্ন হয়ে আছে ব্যবসায়ীক আলাপে।

ব্যাগ ব্যাগেজ প্লেনে তোলার পর যার যার সীটে বসলেন সবাই। পাইলট এঞ্জিন স্টার্ট দিল। টাওয়ার থেকে ক্লিয়ারেন্স দিতেই ছুটতে শুরু করল ছোট্ট প্লেন, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল আকাশে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রহস্যের নানাদিক নিয়ে চিন্তা করল কিশোর, তারপর বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। একটু হাঁটাহাঁটি করবে। প্যাসেঞ্জার কেবিনের শেষ প্রান্তে একটা খোলা দরজা, পাইলটকে দেখা যাচ্ছে ওটার ওপাশে। বন্ধ সাইড ডোরের কাছে থেমে কৌতূহল নিয়ে পাইলট আর কো-পাইলটকে দেখল কিশোর। সামনে এক গাদা সুইচ, বাতি, বোতাম আর ডায়াল নিয়ে বসে আছেন তাঁরা।

অনেক ওপরে উঠে এসেছে প্লেন। একটানা এগিয়ে চলেছে পেরুর আকাশসীমার দিকে।

হঠাৎ করে কোন কারণ ছাড়াই খুলে যেতে শুরু করল কিশোরের পাশের দরজাটা। বাতাসের বাড়িতে দড়াম করে খুলে গেল! তীব্র বাতাস কামড় বসাল কিশোরের গায়ে। ওকে টেনে প্লেন থেকে বের করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে!

একেবারে শেষ মুহূর্তে লাগেজ হার্নেস ধরে ফেলতে পারল কিশোর। তবে শেষ রক্ষা হবে কিনা কে জানে! বাতাসের জোরের কাছে ক্রমেই হেরে যাচ্ছে কিশোর। হাত পিছলাতে শুরু করেছে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে খোলা দরজার দিকে চলে যাচ্ছে ও। ভয়ে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল।

বড়রা ব্যবসায়ের কাগজপত্র পড়ছিলেন। বাতাসের কারণে মুখ তুলে তাকালেন অনেকে। মুহূর্তে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। সবাই বুঝতে পারছে কিশোর প্লেন থেকে পড়ে যাচ্ছে।

সেনিয়র পিনোশে আর তাঁর এক সঙ্গী লাফ দিয়ে সীট ছাড়লেন, খপ করে ধরে ফেললেন কিশোরের হাত। একই সমস্যায় তাঁদেরও পড়তে হলো। বাতাসের টানে দেহ বাইরে চলে যেতে চাইছে। আরও দু'জন ছুটে এসে সাহায্য করলেন তাঁদের। তিনজনকেই খোলা দরজার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হলো।

ধপ করে ওর সীটে বসল কিশোর, মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে।

ক্রুদের সতর্ক করা হয়েছে। কো-পাইলট উঠে এসে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। ঠিক তখন মড়াৎ করে কব্জা ছিঁড়ে ছিটকে উড়ে গেল দরজাটা। পরক্ষণে প্লেনের পেছনে ঘটাং করে একটা ধাতব আওয়াজ হলো। দুলে উঠল গোটা প্লেন। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল।

'কি হলো?' চিৎকার করে জানতে চাইলেন পাইলট।

'দরজা!' চেঁচালেন কো-পাইলট। 'ভেঙে গেছে। ফিউজিলাজে গিয়ে লেগেছে। ফিউজিলাজ ছিঁড়ে দিয়েছে!'

'স্ট্যাবিলাইযারে বাড়ি খেয়েছে,' জানালেন উত্তেজিত পাইলট। 'লেজটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এখনও সামান্য নিয়ন্ত্রণ আছে।'

যাত্রীদের সীট বেল্ট আটকে অক্সিজেন মাস্ক হাতের কাছে তৈরি রাখতে

নির্দেশ দিলেন পাইলট। দ্রুত নির্দেশ পালিত হলো। মাস্ক থেকে কয়েকবার তাজা অক্সিজেন টেনে নেয়ার পর মাথাটা একটু পরিষ্কার হলো কিশোরের।

নতুন দুশ্চিন্তায় মুখ কালো হয়ে গেছে সবার। আগের চেয়ে অনেক বেশি দুলছে প্লেনটা। কাঁপুনিও বেড়ে গেছে। আড়ষ্ট হয়ে সীটে বসে আছে যাত্রীরা—যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

কণ্ঠস্বর যতোটা সম্ভব শান্ত রেখে পাইলট ঘোষণা করলেন, 'আমরা লিমায় পৌছানোর চেষ্টা করব।'

দশ

শঙ্কিত গম্ভীর চেহারায় যার যার সীটের হাতল আঁকড়ে ধরে বসে আছে সবাই। প্লেনটা অনেক নিচে নামিয়ে আনছেন পাইলট। দু'পাশে দুলতে দুলতে নামছে প্লেন, কাঁপছে লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত। মনে হচ্ছে মাঝখান থেকে মড়াৎ করে ভেঙে যাবে। ধাতব গোঙানি ছাড়ছে গোটা কাঠামো।

নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন পাইলট। তাঁর সাহসের প্রশংসা না করে পারল না কিশোর। ভদ্রলোক হয়তো বিচলিত হয়েছেন, তবে ঠাণ্ডা মাথায় প্লেনটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এখন পর্যন্ত।

মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল পেরিয়ে যাচ্ছে, তারপর বাঁক নিতে শুরু করল উড়োজাহাজ।

'অক্সিজেন মাস্ক খুলে ফেলতে পারেন,' ঘোষণা দিলেন পাইলট। 'একটু পরেই মাটিতে নামব আমরা। কন্ট্রোল টাওয়ারে রেডিয়ো মেসেজ পাঠিয়েছি, তারা রানওয়ে ফাঁকা রাখবে।'

রানওয়ের দিকে যাচ্ছে উড়োজাহাজ, কাঠামোর গোঙানি বাড়ল আরও। অনেক কষ্টে প্লেনটাকে সঠিক অবস্থানে নিয়ে এলেন পাইলট, দক্ষ হাতে নামিয়ে আনলেন রানওয়েতে। মাটি স্পর্শ করেই লাফিয়ে উঠল প্লেন, তারপর আবার নামল মাটিতে, গড়িয়ে এগোতে শুরু করল। গতি কমে আসতে পার্কিং র‍্যাম্পের দিকে এগোল ওটা। একটা ক্র্যাশ ট্রাক আর একটা অ্যাম্বুলেন্স এলো পেছন পেছন।

স্বস্তির শ্বাস ফেললেন যাত্রীরা। বিপদ কেটে গেছে। কথায় কথায় লিন্ডা জানাল সেনিয়র পিনোশের কোম্পানি তাদের প্লেন এঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা করায়। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। এখন মনে হচ্ছে দরজাটা ইচ্ছে করে নষ্ট করে রাখা হয়েছিল। নিজেকে দায়ী মনে হলো ওর।

আমি এমন একটা রহস্যের সমাধান করতে চাইছি যেটার সমাধান হোক চাইছে না একদল বদমাশ লোক, মনে মনে বলল কিশোর। এই কেসটা যদি

হাতে না নিতাম তাহলে আজকে এই বিপদ ঘটত না হয়তো।

চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল কিশোর। বড় কথা হচ্ছে ওরা কেউ মারা যায়নি। দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ও।

উড়োজাহাজটা থেমে দাঁড়াতে ওরা খেয়াল করল বেশ কয়েকজন লোক ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সীট বেল্ট খুলল যাত্রীরা, পাইলটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যুবক পাইলট লাজুক হাসলেন।

'আমাকে জানতে হবে দরজাটা কেন ওভাবে খুলে এলো,' প্রসঙ্গ প্রান্টাতে বললেন তিনি।

প্লেনের গায়ে সিঁড়ি লাগতেই নেমে এলো ওরা। অপেক্ষমাণ লোকরা উত্তেজিত ভঙ্গিতে স্প্যানিশে কথা বলছে। মেকানিকরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল সমস্যা কোথায় জানতে। দরজা পরীক্ষা করে গম্ভীর চেহারায় ফিরে এলো তারা, স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করল।

লিন্ডা অনুবাদ করল ইংরেজিতে।

'ইচ্ছে করে কেউ দরজার বল্টু আর কব্জা নষ্ট করে রেখেছিল, যাতে প্লেন আকাশে উড়তেই দরজা খুলে আসে।'

'কি সাঙ্ঘাতিক!' ভ্রূ কুঁচকাল মুসা।

সেনিয়র পিনোশে জানালেন শরীর খারাপ লাগাছে তাঁর, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিতে চান।

লিমুজিনে চেপে বাড়ির পথে রওনা হয়ে গেল ওরা। মাঝপথে আসার পর মুখ খুলল কিশোর। 'আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমাদের শত্রুরাই দরজাটা নষ্ট করে রেখেছিল। প্লাক রহস্য যাতে সমাধান করতে না পারি সেজন্যে যা খুশি তাই করতে পারে লোকগুলো।'

রবিন শিউরে উঠে বলল, 'কিন্তু ওরা জানবে কি করে যে ঠিক ওই সময় তুমি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে?'

'ওরা জানত না,' বলল গম্ভীর কিশোর। 'ভেবেছিল প্লেনটা ক্র্যাশ করবে। আমরা একজনও বাঁচব না।'

বাড়ি ফিরতেই উদ্বিগ্ন চেহারায় ছুটে এলেন সেনিয়রা পিনোশে। রেডিয়োতে আসন্ন বিপর্যয়ের খবর শুনেছেন তিনি। সবাইকে সুস্থ দেখে হাসি ফুটল তাঁর মুখে। বললেন, 'আমি খবরটা শুনেই এয়ারপোর্টে ফোন করি। ওখান থেকে বলল আমি যেন না যাই, খারাপ কিছু ঘটলে সইতে পারব না। ঘরে বসে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার।'

'জীবনে কখনও এতো উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে সময় কাটেনি,' বলল মুসা।

রবিন, কিশোর আর লিন্ডা ওর কথায় সায় দিল।

মুসা বলল, 'কিশোর, বুঝতে পারছ তো, তোমার শত্রুর সংখ্যা এক নয়, বহু। তিনজনের কথা আমরা জানি। দু'জন আর্জেন্টিনায় গ্রেফতার হয়েছে। আমেরিকায় গ্রেফতার হয়েছে চিমসে হেনরি ওয়াল্টার। তার মানে চতুর্থ কেউ

প্লেনের দরজা নষ্ট করে রেখেছিল।'

'ওরা শুধু কিশোরের শত্রু নয়, আমাদেরও শত্রু,' বলল রবিন।

আস্তে করে মাথা দোলাল মুসা। কিশোর বলল, 'এব্যাপারে এখন কথা থাক। পরে আলাপ করা যাবে।'

সেনিয়রা পিনোশে ডিনারের আয়োজন করছেন। খাবার দিতে দেরি হবে বুঝে লিন্ডাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, বাড়িতে মডেলিং ক্লে আছে কিনা।

'ভাবছি প্লাকটার ওপরে খানিকটা লেপে দেখব নতুন কিছু ফুটে বেরোয় কিনা।'

কি ফুটে বেরোবে জিজ্ঞেস করল না লিন্ডা, চলে গেল বাবার স্টাডিতে মডেলিং ক্লে আনতে। একটু পরেই খানিকটা কাদার মতো থকথকে জিনিস নিয়ে ফিরল ও।

শব্দফাঁদের ওপর জিনিসটা লেপল কিশোর। কিছুক্ষণ রেখে তারপর তুলে ফেলল। মনোযোগ দিয়ে দেখল নতুন কোন অক্ষরের ছাপ ফুটেছে কিনা।

'কাজ হয়েছে!' হাতের ইশারায় ডাকল ও সবাইকে। 'নতুন শব্দ পাওয়া গেছে!'

ঝুঁকে এলো সবাই। সেনিয়র পিনোশে ঘরে ঢুকেছেন। তিনিও মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। শব্দফাঁদের নিচের অংশে আড়াআড়ি একটা শব্দ দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে।

'শব্দটা মেসা,' বলল কিশোর। 'আর বাকি থাকল শুধু ওপরের একটা শব্দ। হয়তো ওটা জানতে পারলেই রহস্যটা আর রহস্য থাকবে না।'

আন্ডস্তো পিনোশে কোন্ মেসার কথা লিখে রেখে গেছেন কে জানে!

'পেরুতে উঁচু সমতল জমির অভাব নেই,' বললেন সেনিয়র পিনোশে। 'তবে হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়ল। যে ইন্ডিয়ান লোকটা প্লাক দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল সে কুয়েচুয়া ভাষায় কথা বলত। মেসাটা সম্ভবত মাচু পিচুর কাছে কোথাও হবে।'

'তারমানে কাযকোর কাছে,' উত্তেজিত স্বরে বলল লিন্ডা। 'আব্বু, আর্জেন্টিনার আমাদের একজন বলেছে কাযকো দেখতে যেতে। সেখানে মাহোপানি নামের এক ইন্ডিয়ানের সঙ্গে কথা বললে নাকি অনেক কিছু জানা যাবে।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়,' মৃদু হাসলেন সেনিয়র পিনোশে, 'যদি আমি তোমাদের কাযকো যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই? আমার মন বলছে ওখানে গেলে কিছু একটা হবেই। হয়তো এমন কিছু তোমরা আবিষ্কার করে ফেলবে যে দারুণ ব্যাপার হবে।'

একটু দ্বিধায় ভুগল কিশোর। ভদ্রলোকের অনেক খরচ হবে। কথাটা আমতা আমতা করে বলেই ফেলল। কিশোরের কাঁধে হাত রাখলেন সেনিয়র পিনোশে, তারপর হাসিমুখে বললেন, 'ওসব নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। এই

সুযোগে লিন্ডারও জায়গাটা দেখা হয়ে যাবে। আগে কখনও ওখানে যায়নি ও।

'দারুণ!' খুশি হয়ে বলল মুসা।

'ইশ্, কখন যে যাব!' বলল লিন্ডা। 'শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা।'

পরদিন সকালে সেনিয়র পিনোশে লিন্ডাকে বললেন বন্ধুদের নিয়ে লিমার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখিয়ে আনতে। 'এক কাজ করো না, টোর ট্যাগল প্রাসাদে চলে যাও। মুরদের তৈরি প্রাসাদ, একেবারে অন্যরকম। অবশ্য পুরোটা ঘুরে দেখতে পারবে না, বেশিরভাগটাই মিনিস্ট্রি অভ ফরেইন অ্যাফেয়ার্সের অফিস হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।'

তিন গোয়েন্দাকে প্রাচীন প্রাসাদে নিয়ে গেল লিন্ডা। চারপাশে ব্যবসা কেন্দ্র। প্রাসাদের ভেতরে ঢোকার আগে বাইরে থেকে দেখল ওরা। বাইরেটা কারুকার্যময় কাঠের তৈরি, তবে দুর্ভেদ্য। তিনতলার জানালার সামনে বারান্দা, অপূর্ব সুন্দর।

রাস্তার দিকে একবার ফিরে তাকাল লিন্ডা, ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর। একটা লোক দাঁড়িয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। কপালের ওপর হ্যাট টেনে রেখেছে, চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

কিশোরকে দেখাল। দৈহিক আকৃতি দেখে সেনিয়র ভালদেজের দোকানের অ্যাসিস্টেন্স মরিয়েন্তোস বলে মনে হলো ওদের। মুসা আর রবিন তাকানোতে গটগট করে হেঁটে একটা বাঁক ঘুরে চলে গেল লোকটা।

এখানে লোকটা কি করছিল, ভাবল কিশোর। চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে বন্ধুদের সঙ্গে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকল।

'যারা এখানে থাকত তারা কি পরিমাণ বিলাসিতা প্রিয় ছিল!' না বলে পারল না মুসা।

প্রাসাদের মাঝখানে একটা চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। চারপাশে বারান্দা।

'দারুণ তো!' আঙুল তুলে এক কোনায় রাখা একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখাল রবিন। পুরোনো দিনের জিনিস, কিন্তু এখনও ঝকমক করছে।

'অভিজাত জিনিস,' মন্তব্য করল মুসা।

গাড়ির জানালাগুলোয় ঝুলছে লাল মখমলের মোলায়েম পর্দা। বন্ধ কুঠুরির সামনে চালকের কারুকার্যময় আসন। ওটাও লাল মখমলে মোড়া।

'চার ঘোড়ায় টানা গাড়ি,' জানাল লিন্ডা।

মুসা বলল, 'ইশ, আমি যদি চালাতে পারতাম!'

'আমি বরং যাত্রী হতেই পারলেই খুশি,' বলল কিশোর।

গাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল লিন্ডা, ঠাট্টার সুরে বলল, 'আমি স্পেনের রানী ইসাবেলা। জলদি গাড়ি ছোটাও কোচম্যান, পার্টিতে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

মুসা হাসল। 'এক মিনিট, ইয়োর ম্যাজেস্টি। একটা ছবি তুললে কেমন হয়?'

'পরে,' বলল লিন্ডা। 'আগে চলো, একটা বারান্দা দেখাব তোমাদের।'

বারান্দা ধরে ওর পিছু পিছু এগোল তিন গোয়েন্দা। ছায়াময় একটা ঘর পেরিয়ে আরেকটা বারান্দায় বেরিয়ে এলো। রাস্তা থেকে ওরা যে কাঠের শাটার

দেখেছিল ওগুলো দিয়ে জায়গাটা দৃষ্টির আড়াল হয়ে আছে।

লিন্ডা জানাল আগের জামানায় অভিজাত মহিলারা সহজে রাস্তায় বের হতো না। কিন্তু লোকজন দেখতে ভালবাসত। এখানে বসে নিজে চোখের আড়ালে থেকে রাস্তার মানুষ দেখত তারা।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে শাটারের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। পরমুহূর্তে অন্যদের ডাক দিয়ে রাস্তার উল্টোপাশটা দেখাল। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মরিয়েন্তোস!

'আবার ফিরে এসেছে,' বিড়বিড় করল লিন্ডা।

'আমাদের ওপর নজর রাখছে বোধহয়,' বলল রবিন। মুসার ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

শিউরে উঠল লিন্ডা। 'সত্যি ভাবা যায় না আমাদের পেছনে লেগেছে লোকটা। কিন্তু আর কোন ব্যাখ্যাও তো মাথায় আসছে না।'

'বের হলেই আমাদের পিছু নেবে,' বলল রবিন।

'তাতে কি,' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'ওর জন্যে সারাদিন এখানে আটকে পড়ে থাকব নাকি আমরা! তুমি কি বলো, কিশোর? লোকটাকে ভয় দেখিয়ে খেদিয়ে দেয়া যায় না?'

'কি করে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'এভাবে।' শাটার ফাঁক করে মাথা বের করে দিল মুসা, সরাসরি তাকাল মরিয়েন্তোসের চোখে।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল লোকটা। একটু ইতস্তত করে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল। বাঁক ঘুরে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল আবার।

'চলো বেরিয়ে পড়ি,' তাগাদা দিল লিন্ডা।

'চলো,' সায় দিল কিশোর, পরমুহূর্তে বলল, 'কিন্তু বাড়ি যাচ্ছি না আমরা। আগে যাব সেনিয়র ভালদেজের দোকানে। দেখতে চাই মরিয়েন্তোস সম্পর্কে ভদ্রলোক কি বলেন।'

দ্রুত গাড়ি ছোটাল লিন্ডা, পনেরো মিনিট লাগল সেনিয়র ভালদেজের দোকানের সামনে পৌঁছতে। ওরা ভেতরে ঢুকতে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন ভদ্রলোক। লিন্ডা জানাল ওরা অ্যারায়ানেস বনে গিয়েছিল, ওখানে কোন সূত্র পায়নি।

'দুঃখজনক,' মাথা নাড়লেন সেনিয়র ভালদেজ।

কিশোর জানতে চাইল মরিয়েন্তোস দোকানে আছে কিনা।

'না,' বললেন ভালদেজ, 'কেন আসেনি বুঝতে পারছি না। ফোনও করেনি। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

লিন্ডা জানাল মরিয়েন্তোস অসুস্থ নয়। বলল টোগল প্রাসাদের সামনে তাকে দেখেছে।

কেন কি ঘটেছে বুঝতে পারলেন না সেনিয়র ভালদেজ।

কিশোর আন্দাজ করল ওদের অনুসরণ করবে বলে আজকে কাজে আসেনি লোকটা। কিন্তু কেন? কোন জবাব খুঁজে পেল না ও। হয়তো প্লাকের সঙ্গে ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক আছে। মনে পড়ল লোকটা নক্সা নকল করার চেষ্টা করেছিল। হয়তো ব্যাপারটা স্রেফ কৌতূহল ছিল না, উদ্দেশ্য আছে কোন।

'ভাল সহকারী মরিয়েন্তোস,' বললেন ভালদেজ, 'কিন্তু নিজের ব্যাপারে কখনোই মুখ খোলে না। চাপা স্বভাবের লোক।' কিশোরদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকালেন তিনি। 'তোমরা ওর ব্যাপারে এতো খোঁজ নিচ্ছ কেন জানতে পারি? কোন সমস্যা করেছে ও?'

'না,' বলল লিন্ডা, 'সমস্যা করেনি কোন।'

একই চিন্তা তিন গোয়েন্দার মাথায় খেলে গেল। আরেকজন বিপজ্জনক শত্রুর পরিচয় কি জানতে পেরেছে ওরা?

এগারো

'এসো বাড়ির সবার জন্যে কিছু কিনি,' প্রস্তাব করল মুসা।

মাথা থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলল কিশোর, মৃদু হাসল। 'ভাল বলেছ। খুশি হবে সবাই।'

ছোট ছোট কমদামী বেশ কয়েকটা শখের জিনিস কিনল ওরা। অ্যাশট্রে, ফুলদানী, প্লেট, চামচ-ইত্যাদি। সালাদের একটা সুন্দর বোল কিনল কিশোর মেরি চাচীর জন্যে।

ঠিকানা লিখে দিল ওরা। পরে সেনিয়র পিনোশের বাড়িতে জিনিসগুলো পাঠিয়ে দিতে বলল। সেনিয়র ভালদেজের কাছে দোকানের পেছনের ঘরে যাওয়ার অনুমতি চাইল কিশোর। ওখানেই কাঠের তৈজসপত্র খোদাই করা হয়। খুশি মনে রাজি হলেন ভালদেজ। রবিন, মুসা আর লিন্ডা দোকানের সামনে সাজানো জিনিস দেখতে ব্যস্ত।

মরিয়েন্তোস যে বেঞ্চে বসে কাজ করে ওটার সামনে থামল কিশোর। বেঞ্চের ওপর কোয়েনার কাঠের অসম্পূর্ণ একটা ট্রে পড়ে আছে।

মেঝেতে চোখ পড়ল ওর। আরেকটা অসম্পূর্ণ খোদাই কাজ দেখতে পেল। তুলে নিল ওটা। ভ্রূ কুঁচকে গেল। বোঝার চেষ্টা করছে জিনিসটা কিসে রূপ দেয়া হতে পারে।

সেনিয়র ভালদেজ ঘরে ঢোকায় জিনিসটা কি জিজ্ঞেস করল ও। ওর হাত থেকে কাঠের টুকরোটা নিলেন ভালদেজ, ভ্রূ কুঁচকে দেখলেন। মাথা নাড়লেন আপন মনে। 'না, বুঝতে পারছি না এটা দিয়ে কি বানাচ্ছিল ও।'

জিনিসটা আট ইঞ্চি দীর্ঘ, পুরুত্ব পোনে এক ইঞ্চি। ঠিক মাঝখানের ফাঁকা

জায়গায় একটা টিউব।

'দেখে তো মনে হচ্ছে আমরা যেরকম সালাদের চামচ তৈরি করি সেরকম। কিন্তু তাও নয়। সালাদের চামচে হাতলের জায়গাটা আমরা ফাঁকা রাখি না।'

'এটা মরিয়েন্তোসের বেঞ্চের নিচে পেয়েছি,' জানাল কিশোর। 'জিনিসটা বোধহয় তারই।'

ভ্রূ আরও কুঁচকে গেল ভালদেজের। বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার কেনা কাঠ দিয়ে তৈরি নয়। এটা অ্যারায়ানেস কাঠের জিনিস।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। বুঝতে পারছি না এলো কোত্থেকে। নিশ্চয়ই মরিয়েন্তোস নিয়ে এসেছে। ফিরলে জিজ্ঞেস করব।' কাঠের টুকরোটা পকেটে পুরলেন ভালদেজ।

দ্রুত চিন্তা করছে কিশোর। বলল, 'হয়তো হাতলের ফাঁপা অংশে কিছু রাখতে চেয়েছে মরিয়েন্তোস।'

'হয়তো,' সায় দিলেন ভালদেজ। 'কিন্তু সেটা কি হতে পারে? জবাবটা জানতে হবে আমার।'

ফেরার পথে কি ঘটেছে সবাইকে জানাল কিশোর। মুসা বলল, 'আমার মন বলছে লোকটা খারাপ কোন কাজের সঙ্গে জড়িত।'

পরদিন কাযকো রওনা হওয়ার আগে সেনিয়র ভালদেজের দোকানে ফোন করল কিশোর। বিরক্ত মনে হলো ভদ্রলোককে। বললেন, 'মরিয়েন্তোস এখনও আসেনি। কোন খবরও পাঠায়নি। বাসায় ফোন করেছিলাম, কেউ ধরেনি।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল তাঁর দোকান থেকে কিছু হারিয়েছে কিনা। সেনিয়র ভালদেজ বললেন এমন কিছু তাঁর মাথাতেই আসেনি। 'ফোনটা একটু ধরো, প্লীজ, আমি চেক করে দেখছি,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। দু'মিনিট পরেই আবার তুললেন রিসিভার। 'হ্যালো? কিশোর পাশা? মরিয়েন্তোস আমার অনেকগুলো যন্ত্রপাতি সরিয়েছে! কি ভয়ানক! এ যে অবিশ্বাস্য! অনেক যন্ত্রই খুব দুষ্প্রাপ্য। ওসব আর জোগাড় করতে পারব না কখনও!'

'সত্যি দুঃখিত,' আন্তরিক সুরে বলল কিশোর। 'নিশ্চয়ই পুলিশকে চুরির খবরটা জানাবেন?'

'নিশ্চয়ই! অবশ্যই! অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, মাস্টার পাশা। তুমি না বললে হয়তো আরও অনেকদিন ব্যাপারটা আমার নজরেই আসত না।'

ফোন রেখে বন্ধুদের জানাল কিশোর চুরির ঘটনাটা। রবিন বলল, 'আশা করি পুলিশ মরিয়েন্তোসকে ধরতে দেরি করবে না। লোকটা আমাদের পিছু লাগলে কি করে বসবে কে জানে! খারাপ লোক।'

'আমি বুঝতে পারছি না অ্যারায়ানেস কাঠ সে পেল কোত্থেকে,' বলল কিশোর। 'এটাও জানি না ওই কাঠ দিয়ে সে কি করে। মনে আছে ব্যারিলোচে ওয়েনের বাড়িতে পুলিশ অ্যারায়ানেস কাঠ পেয়েছিল? এখন মনে হচ্ছে সে মরিয়েন্তোসকে ওই কাঠ সরবরাহ করত।'

'তাই হবে,' বলল রবিন। 'এরা একই দলের লোক। প্রশ্ন হচ্ছে, অ্যারায়ানেস কাঠ দিয়ে করেটা কি?'

গাড়ি করে ওদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলেন সেনিয়র পিনোশে। পুরোনো একটা প্লেন কাযকো যায়। ভেতরটা প্রেশারাইযড নয়।

আকাশে ওড়ার একটু পর পাইলট ঘোষণা দিলেন আন্দিজ পর্বতমালা পেরোনোর জন্যে অনেক উঁচুতে উঠতে হবে তাঁকে। বাতাস ওখানে পাতলা, অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক কম। স্টুয়ার্ডেস প্রত্যেক যাত্রীর জন্যে একটা করে অক্সিজেন টিউব নিয়ে এলো। ওটা মুখের কাছে ধরে শ্বাস টানতে হবে, যাতে অক্সিজেনের অভাবে জ্ঞান হারাতে না হয়।

নিচের প্রাকৃতিক দৃশ্য অসাধারণ। পাহাড়ী খাদ, চুড়ো, ঘন সবুজ জঙ্গল—শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য। আড়াই ঘণ্টা পর পাইলট জানালেন অক্সিজেন টিউবের আর দরকার নেই। কাযকোর ওপর চক্কর মেরে নামতে শুরু করল ওদের প্রাচীন লক্কড় মার্কা প্লেন।

আকাশ থেকে শহরটার আকৃতি দেখে অবাক হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডা। ওরা ভেবেছিল আকারে অনেক ছোট হবে।

'ভাবো একবার, সমুদ্র সমতল থেকে বারো হাজার ফুট ওপরে বাস করছ,' বলল মুসা।

'বইতে পড়েছি কাযকোকে পাহাড় চুড়োর উপত্যকা বলা হয়,' জানাল রবিন। 'যারা শতশত বছর আগে এখানে বাস করত তাদের বলা হতো উপত্যকার মানুষ।'

প্লেন নামার পর ট্যাক্সি পেতে ঝামেলা হলো না ওদের। লিন্ডা প্রস্তাব করল হোটেলে যাওয়ার আগে শহরটা একটু ঘুরে যেতে। রাজি হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

কপাল ভাল যে ড্রাইভার ইংরেজি জানে। ট্যুরিস্টদের ঘুরিয়ে দেখাতে অভ্যস্ত। আঙুল দিয়ে পুরোনো বাড়িগুলোর ফাউন্ডেশন দেখিয়ে কথা শুরু করল সে। 'ওগুলো ইনকাদের তৈরি। তারপর যখন স্প্যানিশরা এলো, মন্দির আর প্রাসাদগুলো ভেঙে ফেলল তারা। ভিত্তি নষ্ট করেনি, সেই একই ভিত্তির ওপর গড়ে তুলল নিজেদের বাড়ি-ঘর।'

হাসল ড্রাইভার। 'তবে সূর্যদেবতা এজন্যে তাদের শাস্তি দিয়েছিল। ভয়ঙ্কর একটা ভূমিকম্প হলো। সেই ভূমিকম্পে স্প্যানিশদের বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়ল, কিন্তু প্রাচীন ভিত্তিগুলোর কোন ক্ষতি হলো না।'

এরপর ইনকাদের সরু একটা রাস্তা দেখাল সে। দু'ধারে পাথরের দেয়াল। গাড়ি থামাল সে। তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডাকে সুযোগ করে দিল খানিক হাঁটার। বারো ধারওয়ালা পাথরটা দেখারও সুযোগ হলো ওদের। গুনে গুনে দেখল ওরা। ঠিক বারোটাই দিক আছে পাথরটায়। প্রাচীন শিল্পীদের দক্ষতায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। মূল পাথরটা ছোট ছোট অনেকগুলো পাথর দিয়ে ঘেরা।

এতো নিখুঁত ভাবে বাইরের দিকের পাথরগুলো বসানো হয়েছে যে সামান্যতম ফাঁকও নেই কোথাও। ভূমিকম্পেও বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি চমকপ্রদ এই শিল্প।

আরেক জায়গায় থামল ড্রাইভার। ওখানে প্রাচীন ইনকা ভিত্তির ওপর আধুনিক একটা চার্চ তৈরি করা হয়েছে। 'এখানেই ছিল সূর্যদেবতার মন্দির,' ব্যাখ্যা করল সে। 'এর পেছনে সেসময় ছিল চমৎকার এক পার্ক। পার্কে ছিল অসংখ্য রকমের গাছ আর সোনার তৈরি মূর্তি। শেষপ্রান্তে ছিল একটা প্রাসাদ।'

'ইশ্, যদি দেখতে পেতাম,' আফসোস ঝরল মুসার কণ্ঠে।

হাসল ড্রাইভার। 'তুমি যদি ইনকা জাতির লোক হতে তাহলে তোমার পরনে থাকত আলপাকার পশমে তৈরি পোশাক।'

'আর মেয়েরা কি পড়ত?' জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

'আলপাকার পশমের তৈরি এক পিসের ড্রেস। চুল বাঁধা থাকত উলের তৈরি বিভিন্ন রঙা রিবন দিয়ে। পায়ে থাকত স্যান্ডেল। মাথা ঢাকা থাকত দীর্ঘ একটা শাল দিয়ে। ওটার শেষ প্রান্ত পেছন থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নামত।'

'খুব সুন্দর ড্রেস মনে হচ্ছে!'

'সুভ্যেনির হিসেবে কিনতে পারো ইচ্ছে করলে,' জানাল ড্রাইভার। 'ওধরনের ড্রেস এখনও কিনতে পাওয়া যায়।'

কিনতে চাইল লিন্ডা। পোশাকের দোকানে ওদের নিয়ে গেল ড্রাইভার। কিশোর, মুসা গাড়িতেই বসে থাকল। রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করল রবিন। একটু পরেই ড্রেস কিনে হাসতে হাসতে ফিরে এলো লিন্ডা। উলের দুটো পোশাক কিনেছে ও, বুকের কাছে লামার ছবি বোনা।

এবার ওদের হোটেলে পৌঁছে দিল ট্যাক্সি। বিদায় নেয়ার আগে ড্রাইভার সতর্ক করে দিল। বেশি তাড়াহুড়ো করে কোন কিছু করা ঠিক হবে না। শরীরকে আগে উচ্চতায় অভ্যস্ত করে নিতে হবে, নইলে অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। এমনকি হাঁটতেও হবে আস্তে।

ধন্যবাদ দিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বিদায় দিল ওরা। হোটেলে দুটো ঘর নিল। দুপুরের খাওয়া শেষ করে কিশোর বলল বুড়ো ইন্ডিয়ান মাহোপানিকে খুঁজে বের করা দরকার। ডেস্কের ক্লার্কের কাছে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল বুড়োকে শহরের সবাই চেনে। রীতিমতো বিখ্যাত লোক। মাহোপানির বাড়িতে যাবার রাস্তা বাতলে দিল সে।

বাড়িটা একটা ছোট রাস্তার ধারে। আধুনিক বাড়ি।

হাসল লিন্ডা, বলল, 'আমি আশা করেছিলাম পাথরের তৈরি কোন কুটিরে বাস করবে মাহোপানি, ছাদটা হবে খড় দিয়ে তৈরি।'

'আমি পড়েছি এখনকার ইন্ডিয়ানরা আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত,' বলল রবিন। 'অনেকের কাছেই রেডিয়ো আছে। দুনিয়া থেকে আর বিচ্ছিন্ন নয় তারা।'

দরজায় টোকা দিল কিশোর। দরজা খুলে গেল। উঁকি দিল একদা সুদর্শন

একটা মুখ। চেহারা দেখেই বোঝা যায় ইনকাদের বংশধর। উচ্চতা মাঝারি, দোহারা গড়ন, হাতগুলো অস্বাভাবিক দীর্ঘ, কিন্তু কব্জি সরু। চোয়ালের হাড়গুলো উঁচু। নাকটা বাজপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা। কালো চোখে মায়াময় দৃষ্টি, যেন নীরবে হাসছে সারাক্ষণ।

'সেনিয়র মাহোপানি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাসল ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ। 'মুনানকি! ইমায়ন্যান কাস্কিয়ানকুই।'

কৌতুকে চকচক করে উঠল কিশোরের চোখ। জবাব দিল ও। 'হাক্কালা। ইউসুল পেইকি।'

মাহোপানিকে দেখে মনে হলো আকাশ থেকে পড়েছে, এখনও কিছু বুঝতে পারছে না। সামলে নিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কুয়েচুয়া ভাষা জানো? এসো এসো; কি অভদ্রতা, বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি তোমাদের।'

ভেতরে ঢুকল ওরা। কিশোর জানাল কুয়েচুয়া জানে না ও। অ্যারায়ানেস জঙ্গলের বনরক্ষী রেমারিকের কাছে মাহোপানির কথা শুনে এসেছে। সে কয়েকটা শব্দ শিখিয়ে দিয়েছে। বলল, 'সবার চেয়ে ইনকাদের ইতিহাস আপনি অনেক ভাল জানেন।'

'ও বেশি বেশি প্রশংসা করে,' লাজুক হাসল মাহোপানি। 'তবে তোমরা আসাতে খুশি হয়েছি। যেকোন প্রশ্নের জবাব দেব, যদি আমার জানা থাকে।'

কাঁপড়ের মোড়ক খুলে প্লাকটা বের করল কিশোর। প্রাচীন ইতিহাস মাহোপানিকে জানাল লিন্ডা।

'আপনি কি শব্দফাঁদ মেলাতে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন?'

প্লাকের যেদিকে বাঁদরের ছবি আছে সেদিকটায় আগে মনোযোগ দিল মাহোপানি। হঠাৎ কাঁপতে শুরু করল গোটা বাড়ি। দেয়ালে ঝোলানো নানা জিনিস ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলছে!

সামনের টেবিলে প্লাকটা নামিয়ে রাখল মাহোপানি। জিনিসটা ঝাঁকুনি খেয়ে পিছলে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল কিশোর। মৃদু স্বরে কুয়েচুয়া ভাষায় একটানা কি যেন আওড়াতে শুরু করল মাহোপানি।

'কি ব্যাপার!' চারপাশে তাকাল মুসা। গলা কেঁপে গেল ওর।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লিন্ডার চেহারা, বড় করে দম নিয়ে বলল, 'ভূমিকম্প!'

বারো

বাড়ছে কাঁপুনির পরিমাণ। মন্ত্র আওড়ানো বন্ধ করে ইশারা করল মাহোপানি। পেছনে যেতে বলছে। রান্নাঘরে চলে এলো ওরা। মাহোপানি জানাল এটা ইনকাদের তৈরি ঘর, ছাদটা শুধু পরবর্তীতে বানানো হয়েছে।

'আশা করি এখানে আমাদের বিপদ হবে না,' বলল মাহোপানি। 'পুরোনো দেয়ালগুলো সত্যিই খুব মজবুত।'

বাইরে থেকে মানুষের চিৎকার আর জিনিসপত্র পড়ে যাওয়ার আওয়াজ আসছে। মাহোপানির অনুকরণে মেঝেতে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল ওরা। কথা বলছে না কেউ। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই থেমে গেল ভূমিকম্প।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল ওরা। লিন্ডা বলল, 'আবার ভূমিকম্প শুরু না হলে বাঁচি।'

'বলা যায় না, আবার শুরু হতে পারে,' বলল মাহোপানি। 'তবে আপাতত আর বোধহয় হবে না।'

রাস্তায় বেরিয়ে কি ঘটেছে দেখতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে ওরা। 'সাবধান কিন্তু,' সতর্ক করল মাহোপানি।

দরজার ঠিক বাইরেই উপুড় হয়ে শুয়ে আছে একটা ছেলে। এপাশ ওপাশ করছে আর বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলেছে।

'আর ভয় নেই,' বলল কিশোর।

চোখ বন্ধ করে রেখেছে ছেলেটা, কানে কথা ঢুকেছে বলে মনে হলো না। একই কথা আউড়ে চলেছে।

'কি বলছে?' মাহোপানির কাছে জানতে চাইল কিশোর।

বিভ্রান্ত মনে হলো মাহোপানিকে। অনুবাদ করল। 'বলছে, "ও, মহামান্য বিড়াল, আমি পারব না! সূর্যদেবতা ইঙ্গিত দিয়েছেন। আপনি বলছেন ছেলেগুলো গুপ্তচর? না, না···আপনি চলে যান, মহামান্য বিড়াল! আপনার হয়ে আর কোন কাজ আমি করব না।"'

'কি মানে এর?' ভ্রূ কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'যতোসব ফালতু প্যাচাল!'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল মাহোপানি। উবু হয়ে ছেলেটাকে ঝাঁকি দিল। চোখ মেলল ছেলেটা, চারদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাল। তাকে উঠে বসতে সাহায্য করল মাহোপানি, তারপর কুয়েচুয়া ভাষায় জিজ্ঞেসাবাদ শুরু করল।

হঠাৎ করেই ছেলেটার চেহারায় তীব্র আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। কিশোরদের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলল। তারপর লাফ দিয়ে উঠেই ঝড়ের গতিতে দৌড় দিল। বাঁক ঘুরে চলে গেল চোখের আড়ালে।

'ধাওয়া করে ধরে আনব?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'চলো!' পা বাড়াল কিশোর।

ওর হাত ধরে ফেলল মাহোপানি। শান্ত গলায় বলল, 'না, ছেলেটা তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি। তাছাড়া ভূমিকম্পের পরপরই এভাবে যেখানে সেখানে তাড়াহুড়ো করে যাওয়া ঠিক নয়।'

'কিন্তু ওর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে,' বলল লিন্ডা। 'ওই ছেলে "বিড়াল" শব্দটা উচ্চারণ করেছে।'

'আমার ধারণা ছেলেটা এল গ্যাটোর হয়ে কাজ করত,' বলল কিশোর। 'এল

গ্যাটোকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে লোকটা। ছেলেটা হয়তো তাকে গিয়ে জানাবে আমরা কোথায় আছি, কি করছি।'

'সত্যি আমি দুঃখিত যে তোমাদের থামিয়েছি,' বলল মাহোপানি। 'কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর ওকে ধরা যাবে না।'

কিশোর মাহোপানিকে জিজ্ঞেস করল দস্যু এল গ্যাটোর নাম সে আগে শুনেছে কিনা।

'না।' মাথা নাড়ল মাহোপানি। 'ছেলেটাকেও চিনলাম না। কাযকোর সব ইন্ডিয়ানকে আমি চিনি। ছেলেটা এখানে নতুন।'

'হয়তো তাকে কাযকোতে পাঠিয়েছে এল গ্যাটো,' বলল লিন্ডা।

মনে মনে সায় দিল কিশোর, তারপর বলল ভূমিকম্পের কারণে ছোকরা যেরকম ভয় পেয়েছে তাতে হয়তো এল গ্যাটোর হয়ে আর কোন কাজ করতে রাজি হবে না।

'খুব খারাপ কথা,' মাথা দোলাল মাহোপানি। 'সাবধান থাকতে হবে তোমাদের।'

আবার কেবিনে ফিরে এলো ওরা। প্লাকের ওপর মনোযোগ দিল মাহোপানি। দীর্ঘ সময় ধরে দু'পিঠ দেখে হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল, জানাল কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

'তবে একটা কথা বলতে পারি,' বলল মাহোপানি, 'হয়তো তথ্যটা তোমাদের কাজে লাগবে। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার নানীর মায়ের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম। লোকের মুখে মুখে চলে আসছে গল্পটা। হয়তো ওই কাহিনীর সঙ্গে লিন্ডার পূর্বপুরুষ আগুস্তো পিনোশের কোন সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।

'কাহিনীটা এক স্প্যানিশ শিল্পীকে নিয়ে। সে প্রথমে আসে কাযকোয়, তারপর চলে যায় মাচু পিচুতে। তাকে সাদরে গ্রহণ করে ওখানকার লোক। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে শিল্পী। কিন্তু কিছুদিন পরে তাকে ইন্ডিয়ানরা বন্দি করে। কেন তা জানি না।

'কতোদিন বন্দি ছিল তাও আমার জানা নেই। তবে পরে এক ইন্ডিয়ান সহযোগীর সহায়তায় পালায় সে। কাযকোতে ফিরে আসে।

'ইন্ডিয়ান সহকারীর সঙ্গে পরিচয় ছিল কাযকোর এক ইনকা যাজকের। তারই সহায়তা পায় দু'জন। কিন্তু ইনকা যাজক যখন জিজ্ঞেস করে কেন শিল্পীকে বন্দি করা হয়েছিল তখন কিছুতেই মুখ খোলেনি সে। এর ক'দিন পর উধাও হয়ে যায় দু'জন। তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

থামল মাহোপানি। দম নিয়ে আবার শুরু করল। 'স্প্যানিশরা যখন ইনকাদের কাছে সোনা দাবী করল তখন ইনকা রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন কিছুতেই তাদের হাতে দেশের সম্পদ তুলে দেবেন না। বিশ্বস্ত একশোজন সৈনিকের হাতে তুলে দেয়া হলো সমস্ত সোনা আর দামী পাথর। সেগুলো নিয়ে তারা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করল। কোথায় গেল কেউ জানে না। তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া

যায়নি। ফেরেনি কেউ। এটা সেই স্প্যানিশ শিল্পী উধাও হওয়ার কয়েকদিন আগের ঘটনা। দুটোর ভেতরে কোন সম্পর্কও থাকতে পারে, জানি না।'

'এ কাহিনীর সেই শিল্পীর নাম কি আগুস্তো ছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়ল মাহোপানি। 'আমি শুধু তার কুয়েচুয়া নামটা শুনেছিলাম। সেই নামটাও আজ আর মনে নেই।'

লিন্ডা আপন মনে বলল, 'কি কারণে বন্দি হয়েছিল যাজককে সে-কথা বলেনি কেন শিল্পী?'

একই প্রশ্ন তিন গোয়েন্দার মনেও জেগেছে। মুসা বলল, 'হয়তো সে এমন কোন গোপন কথা জেনে ফেলেছিল যা বলতে চায়নি।'

'হতে পারে এই শিল্পীই আমার পূর্বপুরুষ আগুস্তো,' বলল লিন্ডা।

'আমারও তাই ধারণা,' সায় দিল কিশোর। 'সেসময় ক'জন ইউরোপীয় শিল্পী ছিল এখানে!'

'তোমরা বলছ প্লাকটার সঙ্গে মূল্যবান কিছুর সম্পর্ক থাকতে পারে,' বলল মাহোপানি। 'কি আশা করো তোমরা? ইনকাদের সোনা?'

'কি জানি,' বলল মুসা। 'হয়তো পেয়ে যাব গুপ্তধন, যদি প্লাকের রহস্যটা সমাধান করতে পারি।'

মাচু পিচুর ধ্বংসাবশেষ ঘুরে দেখতে পরামর্শ দিল মাহোপানি। 'শহরটা কি করে ধ্বংস হলো সেটা বিরাট একটা রহস্য। হয়তো ওখানেই কোথাও আছে তোমাদের সেই গুপ্তধন।'

সহায়তা করার জন্যে বুড়ো ইন্ডিয়ানকে ধন্যবাদ দিল ওরা। ওরা বিদায় নেবে, তার আগে মাহোপানি জিজ্ঞেস করল ওরা আগামীকাল তার সঙ্গে সাকসাহুয়ামানের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাবে কিনা। 'জায়গাটা শহরের ঠিক বাইরে। মজা পাবে গেলে। সাকসাহুয়ামান আসলে একটা দুর্গ ছিল।'

খুশি মনে রাজি হয়ে গেল ওরা। মাহোপানিকে জানাল আগামীকাল সকাল ঠিক দশটার সময় তৈরি হয়ে থাকবে ওরা।

ঠিক দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে গাড়ি নিয়ে হাজির হলো মাহোপানি। সাকসাহুয়ামানে পৌঁছুতে মিনিট বিশেক লাগল।

অবাক হয়ে গেল কিশোররা।

'কী অসাধারণ!' বিড়বিড় করল মুসা।

পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে মজবুত ভাবে তৈরি করা হয়েছে দুর্গের সামনের প্রাচীর।

মাহোপানি জানাল দেয়ালটা আট ফুট চওড়া, ষাট ফুট উঁচু। দৈর্ঘ্যে পুরো আঠারোশো ফুট।

'কোনও কোনও পাথরের ওজন দুশো টনেরও বেশি,' বলল মাহোপানি। কোনরকমের যন্ত্রপাতি ছাড়াই ওগুলো দূরদূরান্ত থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। গাছের গুঁড়ি ব্যবহার করে ওগুলোকে বসানো হয়েছে জায়গামতো। বছরের পর

বছর কাজ করেছে হাজার হাজার শ্রমিক।'

'কিন্তু একটা পাথরের ওপর আরেকটা ওঠাল কি করে!' মাথা নাড়ল মুসা, বিশ্বাস করতে পারছে না এও সম্ভব।

মাহোপানি জানাল একটা করে পাথর বসানো হয়ে গেলেই ওটার চারপাশে মাটি ফেলে ঢালু একটা পথ তৈরি করা হতো। সেই ঢালু মাটির ওপর দিয়ে গাছের গুঁড়ির সাহায্যে গড়িয়ে তোলা হতো নতুন পাথর। আগেরটার ওপর বসিয়ে দিয়ে আবার মাটি উঁচু করতে শুরু করত শ্রমিকরা। এভাবেই অত উঁচু প্রাচীরটা তৈরি হয়েছে।

'অদ্ভুত স্থাপত্য কীর্তি,' প্রশংসা না করে পারল না কিশোর।

রবিন বলল, 'মিশরের পিরামিডও এভাবেই তৈরি করা হয়েছিল।'

'চলো, ওপরে উঠে দেখি,' পা বাড়াল কিশোর।

ওর পিছু নিল বাকিরা। মাহোপানি নড়ল না। পেছন থেকে সতর্ক করল, 'সাবধান কিন্তু। পিছলে পড়লে সর্বনাশ। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।'

কিশোর লক্ষ করল দুর্গের সামনে ঘাসে ছাওয়া লনে একটা গাড়ি এসে থেমেছে। ভেতর থেকে কেউ বের হলো না। আবার চলতে শুরু করল গাড়ি। থামল গিয়ে দুর্গের দেয়াল যেখানে শেষ হয়েছে তার কাছাকাছি, ছেলেদের থেকে পাঁচশো ফুট দূরে।

অন্যরাও খেয়াল করেছে। ওরা ধারণা করেছিল গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু একটু পরেই পেছনের দরজা খুলে নামল একজন লোক, দ্রুত হেঁটে দুর্গের দেয়ালের আড়ালে চলে গেল। জ্যাকেটের আড়ালে কি যেন একটা ধরে রেখেছিল লোকটা, আংশিক দেখা গেছে। ভাব দেখে মনে হলো চাইছিল না কেউ জিনিসটা দেখে ফেলুক।

'কি আছে লোকটার কাছে?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

'দেখে তো মনে হলো ছোট একটা পিপের মতো,' বলল কিশোর।

পাথুরে দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট গর্ত খুঁজে ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা। দুর্গের ভিত্তি এখনও অনেক ওপরে। প্রথমে উঠল মুসা, বাহু ধরে লিন্ডাকে উঠতে সাহায্য করল। রবিন আর কিশোরও উঠে পড়ল। সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল ওরা।

একটু পর মুসা বলল বিশ্রাম নেবে। রবিনও বসতে চাইছে। লিন্ডা হাঁপাচ্ছে। কিশোর বলল, 'আমি তাহলে দ্বিতীয় স্তরে উঠে দেখে আসি।'

আপত্তি করল না কেউ। মুসা বলল, 'আমরা এখানেই থাকব। তাড়াতাড়ি এসো।'

দ্বিতীয় স্তরে উঠল কিশোর। এখন আর ওকে দেখতে পাচ্ছে না লিন্ডা, মুসা আর রবিন।

চারপাশে চোখ বুলাল ও। বুঝতে পারল এই দুর্গ দখল করা প্রায় অসম্ভব ছিল। শত্রু কাছেই আসতে পারবে না। ওপর থেকে তাদের ওপর ফুটন্ত পানি,

পাথর, তীর-বর্শা ছুঁড়ে কাবু করে ফেলতে পারবে ওপরের প্রহরীরা।

এগিয়ে চলল কিশোর, দেয়ালের শেষ প্রান্তে এসে নিচের দিকে তাকাল। মাথা ঘুরে উঠতে চায়। সরু একটা ঢালু পথ নিচে নেমে গেছে আড়াআড়ি ভাবে। ওপথে নামা যাবে। নামতে শুরু করল ও। মাটি থেকে আর বিশ ফুট উঁচুতে আছে এমন সময়ে চোখের কোণে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল। চট করে ঘাড় ফেরাল। পাথরের আড়ালে একটা পা সরে যেতে দেখল। বিস্ময়ে দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর। ওপরের বড় একটা পাথরে লাল কালিতে বিরাট করে একটা বিড়ালের মুখ আঁকা হয়েছে।

এল গ্যাটো!

তেরো

হয়তো লোকটা এল গ্যাটো স্বয়ং, নিজের চিহ্ন রেখে সাবধান করে গেল, কেউ তার পেছনে লাগলে ছাড়বে না।

গাড়ির দিকে তাকাল কিশোর, লোকটা এখনও গাড়ির কাছে ফেরেনি, অপেক্ষা করছে ড্রাইভার।

ওপর দিকে তাকাল। লোকটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে কিনা ভাবছে। কোনা ঘুরে একটা হাত বেরিয়ে আসতে দেখল। পরমুহূর্তে চোখের আড়ালে চলে গেল। ফিরে এলো আবার। এবার ওই হাতে একটা বালতি ধরা। বালতির ধার থেকে লাল রং গড়িয়ে নামছে।

অবাক হলো কিশোর। লোকটা কি তার আঁকা ছবিতে আরও কিছু যোগ করতে চাইছে?

না।

হাতটা হঠাৎ করে ওপরের দিকে উঠে গেল, তারপর প্রচণ্ড জোরে বালতিটা ছুঁড়ে দিল সরাসরি কিশোরের মাথা লক্ষ্য করে!

দ্রুত বেগে নেমে আসছে বালতি।

চারপাশে তাকানোর সময় নেই। কিশোর আগেই দেখেছে সরু এই ঢালু পথ ছাড়া আর কোথাও সরার উপায় নেই। মাথা বাঁচাতে হলে একটা কাজই করতে পারে ও, লাফ দিতে হবে।

সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়ে যেতেই আর দেরি করল না কিশোর, বিশ ফুট ওপর থেকে মাটি লক্ষ্য করে লাফ দিল। আশা করছে ঘাসে মোড়া নরম মাটিতে পড়বে।

কিশোরের মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে শুধু পড়ছেই ও। মনটাকে তৈরি করে নিল ঝাঁকির জন্যে। তবে এতো ব্যথা পাবে ভাবতে পারেনি। মাটিতে

পড়তেই মনে হলো শরীরের সমস্ত হাড় গুঁড়ো হয়ে গেছে। চোখে অন্ধকার দেখল ও। বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে। থম মেরে বসে থাকল কিছুক্ষণ। একটু দূরেই পড়ে আছে আঠালো লালরং ভরা বালতিটা। আরেকটু হলে কিশোরের মাথা ফাটিয়ে দিত ওটা।

একটা গাড়ির এঞ্জিন চালু হবোর আওয়াজ কানে এলো ওর। ঝট করে গাড়ির পেছনের সীটে উঠে বসল এক লোক। তার পেছনটা শুধু দেখতে পেল কিশোর। দ্রুত ছুটতে শুরু করল গাড়ি, একটা বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।

'কিশোর!' দৌড়ে আসছে মুসা। বুঝতে পেরেছে খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। 'কি হয়েছে তোমার?'

ওর পেছন পেছন দৌড়ে এলো লিন্ডা আর রবিন। তিনজনের চেহারাতেই আশঙ্কার ছাপ।

কিশোর দুর্বল গলায় জানাল কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিতে পারবে, কিছু হয়নি ওর। পাঁচ মিনিট পরে ওপরের ছবি-আঁকা পাথরটা দেখাল ও, কি ঘটেছে জানাল।

'এল গ্যাটো!' বিস্মিত গলায় বলে উঠল লিন্ডা। 'এখানেও সে! আমাদের ফলো করে এসেছে নিশ্চয়ই! কোথাও আমরা নিরাপদ নই!'

'কিশোরের ক্ষতি করতে চাইছে লোকটা,' বলল চিন্তিত রবিন। 'কখন যে খারাপ কিছু ঘটে যায়!'

'ওই বিড়ালের ছবিটা সাবধান করে দেয়ার জন্যে এঁকেছে,' সায় দিল কিশোর। 'অবশ্য অন্য কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।'

বিড়ালের মুখের ছবি নিল লিন্ডা। পরে কিশোর মনোযোগ দিয়ে দেখার সুযোগ পাবে। হয়তো এমন কিছু ওর চোখে পড়বে যেটা ওদের চোখ এড়িয়ে গেছে।

কিশোরকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল মুসা। এখন কিছুটা ভাল বোধ করছে কিশোর। মাহোপানির কাছে ফিরে এলো ওরা। কি ঘটেছে শুনে ভ্রূ কুঁচকে গেল বুড়ো ইন্ডিয়ানের।

'আগে যদি জানতাম তাহলে গাড়িটার নাম্বার টুকে নিতাম। তবে অন্যভাবে হয়তো তোমাদের সাহায্য করতে পারব আমি। কাযকোর দোকানে জিজ্ঞেস করব কে লাল রং কিনেছে। শহরে রঙের দোকান মাত্র একটাই।'

একটু চিন্তা করে মাহোপানি বলল, 'আজকে আর মাছ পিচুতে গিয়ে কাজ নেই। আগামীকাল যাওয়া যাবে। আজ শুধু বিশ্রাম।'

কথাটা গুরুত্বের সঙ্গে নিল কিশোর। ঠিক করল হোটেলের ক্লার্ককে বলবে যাতে ওরা যে হোটেলেই আছে সেটা বাইরের কাউকে না জানায়।

হোটেলে পৌঁছে প্রথমেই ক্লার্কের কাছে গেল কিশোর। লোকটা কথা দিল কাউকে কিছু জানাবে না।

লিফটে করে ওপরে উঠল ওরা। তিন গোয়েন্দার ঘরে বসল লিন্ডা। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝরছে অঝোর ধারায়। দেখতে দেখতে শীত পড়ে গেল। শিউরে উঠে মুসা বলল, 'গরম জামা পরতে হবে দেখছি! অথচ একটু আগেও গরম লাগছিল।'

ঘরে একটা হীটার আছে। জানালাগুলো বন্ধ করে দিল রবিন। মুসা হীটার চালু করল। একটু পরেই ঘরের তাপমাত্রা আরামদায়ক হয়ে উঠল।

দরজায় ঝোলানো একটা কাগজ মনোযোগ দিয়ে পড়ছে কিশোর। হোটেল কর্তৃপক্ষ লিখেছে এই উচ্চতায় ট্যুরিস্টদের কি করতে হবে আর কি করা উচিত হবে না।

'বলছে জানালা খোলা রাখতে হবে,' জানাল কিশোর। 'হীটার যতো সম্ভব কম ব্যবহার করতে লিখেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন। আবারও জানালাগুলো খুলে দিল। মুসা বন্ধ করল হীটার। বিড়বিড় করে বলল, 'ঠাণ্ডায় জমিয়ে মারবে বোধহয়!'

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'আরেকটা কথা আছে এখানে। লিখেছে যতোটা সম্ভব হালকা খাবার খেতে হবে।' মুসার চেহারা গোমড়া হয়ে উঠতে দেখে আবার শুরু করল ও। 'যদি শরীর বেশি খারাপ লাগে তাহলে রুম সার্ভিসকে ডাক দিতে হবে। সে প্রয়োজনে বাড়তি অক্সিজেনের ব্যবস্থা করবে।'

দু'ঘণ্টা পরে ওদের দরজায় টোকার আওয়াজ হলো। দরজা খুলল রবিন। মাহোপানি এসেছে।

কিশোরের পাশে চেয়ারে বসে বলল, 'রঙের দোকানে খোঁজ নিয়ে জেনেছি এক আগন্তুকের কাছে লাল রং বেচেছে দোকানদার। লোকটার চেহারার বর্ণনা দিলো। কালো চুল, ছোট ছোট চোখে চঞ্চল দৃষ্টি, হাতগুলো লোমে ভরা। হালকা পাতলা মানুষ। চেনো তোমরা লোকটাকে?'

'মরিয়েন্তোস,' একই সঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর রবিন।

'কোত্থেকে এসেছে লোকটা?'

'লিমা,' জানাল লিন্ডা।

কিশোর বলল, 'আমার ধারণা এই লোকই নিজেকে এল গ্যাটো বলে পরিচয় দেয়।'

ভ্রু কুঁচকে গেল মুসার। 'মরিয়েন্তোস জানবে কি করে এখানে আমরা এসেছি? এটাই বা কিভাবে জানবে যে প্রাচীন দুর্গে যাব আমরা?'

'জেনেছে কোনভাবে,' বলল রবিন।

'হয়তো আমাদের পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছিল,' বলল কিশোর। 'মরিয়েন্তোসই এল গ্যাটো হলে লোকের অভাব হওয়ার কথা নয় তার। ঠিকই বের করে ফেলেছে আমরা কোথায়। মাচু পিচুতে লোকটাকে দেখলেও অবাক হবো না আমি।'

'তাহলে আমি বাবা মাচু পিচুতে যাচ্ছি না,' বলল লিন্ডা। 'আবার আমাদের

ওপর হামলা হতে পারে।'

মাহোপানি হাসল। 'বাছা, মাচু পিচু না দেখে ফেরা তোমাদের বোকামি হবে। দুনিয়ার সেরা ধ্বংসাবশেষের একটা ওই মাচু পিচু। আমি বরং পুলিশকে সতর্ক করে দেব। পুলিশ ওই লোককে খুঁজবে। ট্রেনের ওপরও নজর রাখবে, যাতে সে আমাদের পিছু নিয়ে মাচু পিচুতে যেতে না পারে। চিন্তা কোরো না, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। বুড়ো বয়সে একা একা কোথাও যেতে আর ভাল লাগে না। তোমাদের সঙ্গে গেলে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।'

অন্তর থেকে বৃদ্ধ ইন্ডিয়ানকে ধন্যবাদ দিলো তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডা। কিছুক্ষণ বসে গল্প করে চলে গেল মাহোপানি, বলে গেল কাল সকালে আবার আসবে।

পরদিন সকালে মাহোপানির সঙ্গে রেলগাড়িতে চাপল ওরা। হাতের ছোট ব্যাগটাতে প্লাকটা নিয়ে নিয়েছে কিশোর।

মজা পাচ্ছে ওরা সবাই। আগে কখনও এমন ট্রেন দেখেনি। একটা মাত্র বগি আছে ট্রেনে। সেটা দেখতে বড়সড় একটা ট্রলি কারের মতো। শহর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ট্রেন।

পরবর্তী দু'ঘণ্টায় বারবার পাহাড় থেকে বেরোল আবার ঢুকল ট্রেন। অনেকগুলো পাহাড় পড়ল যেগুলোর চুড়ো বরফ দিয়ে ঢাকা। ওগুলোর পাদদেশে ভুট্টার চাষ করা হয়েছে। ওসব জায়গা উষ্ণ। তারপর একটা উপত্যকা ধরে এগোল ট্রেন। লাইনের পাশে পাশে এঁকেবেঁকে চলেছে উরাবাম্বা নদী। নদীর ওপর দিয়ে কয়েকটা সেতুও পার হলো ওরা।

ছোট ছোট কয়েকটা স্টেশনে অল্প সময়ের জন্যে থামল ট্রেন। স্টেশনের ধারেই দেখা গেল ঝোপ আর কাদামাটিতে তৈরি ইন্ডিয়ানদের কুটির। উজ্জ্বল চোখের চঞ্চল ইন্ডিয়ান বাচ্চারা ছুটোছুটি করে খেলছে। খুশি মনে যাত্রীদের দেয়া লজেন্স আর চকোলেট নিচ্ছে।

ট্রেন শেষপর্যন্ত মাচু পিচুর ছোট্ট স্টেশনে ঢুকে থেমে দাঁড়াল। স্টেশনের বাইরে ট্যুরিস্টদের জন্যে ঝরঝরে একটা বাস অপেক্ষা করছে। হোটেলে নিয়ে যাবে পাহাড়ী পথ দিয়ে। হোটেলটা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের কাছেই।

আকাশটা হঠাৎ করেই কালো হয়ে গেল। একটু পরেই শুরু হলো তুমুল বর্ষণ।

'কি দুর্ভাগ্য,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিন্ডা, 'আমরা এতো কষ্ট করে এখানে এলাম, আর এখন কিছুই দেখতে পাবো না।'

মাহোপানি হাসল। 'পাহাড়ে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, কিন্তু থাকে না বেশিক্ষণ। হয়তো দেখবে পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই সূর্য বেরিয়ে আসবে। চিন্তা কোরো না, মাচু পিচু না দেখে ফিরছি না আমরা।'

দেখতে দেখতে হোটেলে পৌঁছে গেল ওরা। প্রাকৃতিক দৃশ্য এতোই চমৎকার যে হোটেলের ভেতরে ঢুকতে সায় দিল না কিশোরের মন। অনেক নিচে দেখা

যাচ্ছে উরুবাম্বা নদী, এঁকেবেঁকে সাপের মতো এগিয়েছে, এতো ওপর থেকে দেখে বাদামী একটা ফিতের মতো লাগছে। ওপরে পাহাড়ের সারি। এখানে ওখানে ফুল আর সব্জির বাগান। প্রাচীন ইনকারা ওসব জায়গায় চাষ করত।

'বৃষ্টির মধ্যে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না,' তাগাদা দিল মুসা। 'ভেতরে চলো, নাম রেজিস্ট্রি করাই।'

ইচ্ছের বিরুদ্ধেই হোটেলে ঢুকল কিশোর। ক্লার্ক ওদের নাম খাতায় তুলে নিল। দোতলায় তিনটে ঘর নিয়েছে ওরা। একটায় থাকবে তিন গোয়েন্দা, একটায় লিন্ডা, অন্যটায় মাহোপানি। ক্লার্ক জানাল একটু পরেই দুপুরের খাবার দেয়া হবে। ট্যুরিস্ট বেশি আসায় দুবারে খাওয়ার আয়োজন করতে হচ্ছে। ওদেরকে বলল প্রথম ব্যাচে বসে পড়তে।

'নিশ্চয়ই!' বলল মুসা। 'আপনি যখন বলছেন!'

মুসার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'কাযকোর হোটেলে কি লেখা ছিল ভুলে যেয়ো না। হালকা খাবার খেতে হবে।'

'তাই বলে না খেয়ে মরব নাকি!' আপত্তি করল মুসা। আত্মপক্ষ সমর্থন করল, 'পাহাড়ে উঠতে হলে জোর লাগবে না?'

ওপরে নিজেদের ঘরে চলে এলো ওরা। একটু পরে দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকল মাহোপানি। তার খানিক পরে পোশাক বদলে এলো লিন্ডা। প্লাকটা বের করে ব্যুরোর নিচের ড্রয়ারে রাখল কিশোর।

একসঙ্গে নিচে নেমে এলো ওরা। জানালার সামনে একটা টেবিল বাছল মাহোপানি। জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসল মুসা আর লিন্ডা, অন্যদিকে কিশোর, রবিন আর মাহোপানি।

প্রথম কোর্সে এলো পেরুর গ্রাম্য খাবার। ভুট্টা সেদ্ধ আর সেই সঙ্গে বিরাট পনিরের ধবধবে সাদা টুকরো। দারুণ সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

বিরাট একটা হাঁ করল মুসা ওর পনিরের বেশিরভাগটা মুখে পোরার জন্যে, আর ঠিক তখনই রবিন চিৎকার করে উঠল।

'মুসা! সাবধান! কামড়ে দেবে তোমাকে!'

চোদ্দো

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল মুসা, এক ঝটকায় সরে এলো জানালার কাছ থেকে। হাসতে শুরু করল মাহোপানি।

'তোমার ভয়ঙ্কর জন্তু কিন্তু খুবই নিরীহ আর মিশুক,' এখনও হাসছে মাহোপানি। 'এটা একটা আলপাকা। মহা পেটুক ঘাসখোর।'

কথাটা প্রমাণ করার জন্যে পাশের খালি টেবিলে পড়ে থাকা একটা প্লেট

থেকে খানিকটা সালাদ নিয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মাহোপানি। এগিয়ে এলো আলপাকা, মুহূর্তের মধ্যে দুই চিবুনি দিয়ে গিলে ফেলল। এগিয়ে এলো আরও। জুলজুল করে তাকাচ্ছে। ভাব দেখে মনে হলো আশা করছে এখানে আরও সুস্বাদু সব খাবার মিলবে।

এক টুকরো লেটুস পাতা বাড়িয়ে ধরল মুসা। মুহূর্তে পেটের ভেতর চালান করে দিল আলপাকা, জিভ বের করে মুসার হাত চেটে দেখল। পছন্দ হলো না। তবে সরলও না। আশায় আশায় আছে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কোর্স নিয়ে হাজির হয়েছে ওয়েটার। হাতের ট্রে টেবিলে নামিয়ে রেখে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, হাত তালি দিয়ে স্প্যানিশে বলল চলে যেতে। অলস ভঙ্গিতে একদিকে রওনা হলো আলপাকা।

'ওটার পরিবার পরিজনও আছে দেখছি,' বলল মুসা।

হোটেলের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে আলপাকা। তার সঙ্গে দুটো বাচ্চা।

'কি মিষ্টি দেখতে,' ঠাট্টা করে বলল রবিন।

'আমি পরে ওদের ছবি তুলব,' জানাল লিন্ডা।

মাহোপানি বলল আলপাকার লোম দামী জিনিস। 'সাধারণত লোমের রং সাদা হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বাদামী আর ধূসর রংও মিশে থাকে। লোম থেকে যে উল তৈরি হয় সেটা বেশ নরম, কাপড় পরতেও আরাম। তবে খুব দামী।'

'আলপাকার উলই কি সবচেয়ে দামী?' জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

মাথা নাড়ল মাহোপানি। 'দুনিয়ায় সবচেয়ে মিহি উল হচ্ছে ভিকিউনিয়া। দেখতে ওরা আলপাকার মতোই, কিন্তু আকারে একটু ছোট। লোমগুলো হয় নরম আর মসৃণ।

'ইনকাদের আমলে শুধু অভিজাতদেরই ভিকিউনিয়ার উল ব্যবহারের অধিকার ছিল। সাধারণ মানুষ ভিকিউনিয়ার উল পরতে পারত না। কিংবদন্তী আছে, স্বয়ং ইনকা রাজা ভিকিউনিয়ার উল দিয়ে তৈরি পোশাক পরতেন। তবে একবার পরার পরেই সেসব কাপড় পুড়িয়ে ফেলা হতো।'

'কি অপচয়,' বিড়বিড় করল রবিন।

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল মাহোপানি। 'ওগুলো ওভাবে নষ্ট না করলে হয়তো কিছু থেকে যেতো, পরবর্তী আমলের মানুষরা দেখতে পেত।'

বুড়ো ইন্ডিয়ান জানাল তিন নম্বর যে প্রাণী থেকে উল পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে লামা। 'আলপাকা আর ভিকিউনিয়ার চেয়ে লামা আকারে বড়।'

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লামাকে ভার বহনকারী জন্তু হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 'খুব কর্কশ আর তৈলাক্ত হয় লামার উল। ভারী কম্বল, বস্তা, দড়ি এসব জিনিস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন আমল থেকে গরীবদের পোশাকও তৈরি হচ্ছে লামার উল দিয়ে।'

'চামড়া দিয়ে বোধহয় স্যান্ডেল বানায়,' বলল লিন্ডা। সায় দিল মাহোপানি।

ওদের খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই থেমে গেল বৃষ্টি। বাইরে যাওয়ার জন্যে সবাইকে তাগাদা দিল লিন্ডা, আলপাকার ছবি তুলবে ও। কয়েকটা ছবি তুলে কিশোরের হাতে ক্যামেরাটা ধরিয়ে দিল লিন্ডা।

'আমি আলপাকার পিঠে উঠছি, গোটা কয়েক ছবি তুলে দাও। দেখো, কেউ যেন আবার জন্তুটার পেছনে চাপড় না মারে।'

ধীর পায়ে এগিয়ে শান্ত হয়ে ঘাস চিবুতে থাকা উদাস উদাস চেহারার আলপাকার পিঠে চড়ে বসল লিন্ডা। নিচু গলায় বলল; 'আমি রেডি!'

হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল আলপাকা। ন্যা-ন্যা করে তারস্বরে চিৎকার শুরু করল।

'ওঠ্, শয়তান!' ভ্রূ কুঁচকে গেল লিন্ডার। 'ওঠ্ বলছি!'

আলপাকার মধ্যে নির্দেশ পালনের কোন ইচ্ছে দেখা গেল না। হাসতে হাসতে ওই অবস্থাতেই ছবি তুলে ফেলল কিশোর।

মাহোপানি সামনে বেড়ে বলল, 'সেনিয়রিটা লিন্ডা, তোমার ওজন একশো পাউন্ডের বেশি। একশো পাউন্ড হচ্ছে আলপাকার শেষ সীমা। এর বেশি বহন করতে পারে না ওরা। যতোই পটাও উঠবে না ও। নেমে পড়ো তারচেয়ে।'

হেসে নেমে পড়ল লিন্ডা, আসলে ওর ওজন কতো সেব্যাপারে কিছু বলল না। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল। 'চলো মাচু পিচুর ছবি তুলি গিয়ে।'

কিশোরও রাজি। শুধু যে ধ্বংসাবশেষ দেখার ইচ্ছেয় তা নয়, ও আশা করছে ওখানে হয়তো শব্দফাঁদের সমাধান করার মতো সূত্রও পাওয়া যেতে পারে।

মাহোপানি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। একটা স্ট্যান্ডের সামনে থামতে হলো ওদের। সামান্য ফী দিয়ে ঢুকল সংরক্ষিত এলাকায়। এবার শুরু হলো পাহাড়ী পথ বেয়ে ওপরের দিকে যাওয়া।

ওদের বামদিকে খাড়া ভাবে উঠে গেছে পাহাড়। তার গায়ে তিন থেকে পাঁচ ফুট উঁচু অসংখ্য টেরেস। একেকটা পনেরো থেকে তিরিশ ফুট চওড়া। টেরেসগুলোর পাশে অনেক সিঁড়ি। সিঁড়ি গিয়ে মিশেছে সরু সরু পথে। ওই পথের দু'পাশে পাথরের তৈরি কুটির। কোনটা আস্ত, কোনটা ধসে গেছে। মাহোপানি জানাল আসলে এই কুটিরগুলো ছিল আট থেকে দশ ফুট উঁচু। ছাদ ছিল খড় আর ঝোপঝাড়ে কাদা মাখিয়ে তৈরি।

'আর্কিয়োলজিস্টরা বিশ্বাস করে শহরের একদিকে বাস করত মজুররা, অন্যদিকে অভিজাতরা। তাদের এ ধারণার কারণ শহরের একটা দিক অন্যদিকের চেয়ে অনেক বেশি যত্ন দিয়ে তৈরি। সব বাড়ির শেষে ওপরের দিকে আছে একটা চমৎকার বাড়ি। ওটা সূর্যদেবতার মন্দির ছিল। ওখানে থাকত চিরকুমারী উপাসিকারা। সর্বক্ষণ প্রার্থনার কাজে ব্যস্ত রাখা হতো তাদের। অনেকটা আজকের দিনের নানের মতো। কুমারীরা অবসরে তৈরি করত উলের জামা।'

ডানদিকে তাকাল মুসা। ওদিকটা খাড়া নেমে গিয়েছে কয়েকশো ফুট, মিশেছে গিয়ে নদীর সঙ্গে। শিউরে উঠল ও। 'পা পিছলালে সোজা গিয়ে পানিতে

পড়তে হবে। নির্ঘাত মরণ!'

'নিচের দিকে তাকিয়ো না,' পরামর্শ দিল রবিন।

মাহোপানির পেছনে এগোল ওরা। সরু প্রাচীন রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। কিশোর কল্পনা করার চেষ্টা করল আজ থেকে শতশত বছর আগে ঠিক কেমন ছিল ইনকাদের এই সদাব্যস্ত নগরী।

অন্যান্য বাড়ির চেয়ে বড় একটা বাড়িতে ঢুকল কিশোর। চারপাশটা ঘুরে দেখল। অন্যরা এগিয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না আর ওদের। ওরা কাছের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নেমেছে মনে করে একেকবারে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ও। একদম নিচে নেমেও কারও দেখা পেল না। শহরের শেষ কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে ও। একটা ঢালের শেষ প্রান্ত এটা। নিচের দিকে তাকাল কিশোর। তিন-চারশো ফুট নিচে একটা সবুজ উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। ঘন জঙ্গল জন্মেছে ওখানে।

শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কানে একটা খচমচ আওয়াজ পেল কিশোর। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অজান্তেই ঢোক গিলল ঘনঘন। বিরাট একটা খড়ের আঁটি সরাসরি ওকে লক্ষ্য করেই গড়িয়ে নেমে আসছে! যদি ওটা পেছন থেকে এসে ধাক্কা লাগাত তাহলে কয়েকশো ফুট নিচের উপত্যকায় আছড়ে পড়ত ও। ফলাফল: নিশ্চিত মৃত্যু। ক্রমেই গতি বাড়ছে আঁটির। ঘুরে দাঁড়াল কিশোর, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর লাফ দিয়ে ওটা পেরোল।

শেষ গড়ান দিয়ে খাদের নিচে অদৃশ্য হলো আঁটি। কিশোর খেয়াল করল এতোক্ষণ শ্বাস আটকে রেখেছিল। বড় করে দম নিল। ওপর থেকে শুনতে পেল এক লোকের গলা। ওপরে তাকিয়ে দেখল এক ইন্ডিয়ান মজুর ব্যস্ত হয়ে পাথরের তৈরি একটা বাড়ির ছাদে খড় বিছাচ্ছে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে ওপরের সিঁড়ি দেখাল সে। চেঁচিয়ে উঠল, 'সেনিয়র!'

ওপরের দিকে তাকিয়ে আর কাউকে দেখতে পেল না কিশোর। বুঝতে পারল না কেউ ইচ্ছে করেই ওর দিকে খড়ের আঁটি গড়িয়ে দিয়েছে কিনা।

মজুর এখনও উত্তেজিত হয়ে আঙুল নাচাচ্ছে আর সেনিয়র সেনিয়র করছে।

কিশোর বুঝতে পারল লোকটা কাউকে ওর দিকে খড়ের গাদা গড়িয়ে দিতে দেখেছে। দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে লোকটার কাছে পৌঁছে গেল ও, জিজ্ঞেস করল, 'কে লোকটা? বলতে পারবেন দেখতে কেমন?'

অসহায় ভাবে হাত নাড়ল মজুর; বোঝাতে চাইল সে ইংরেজি জানে না।

'এসপ্যানিওল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। সামান্য স্প্যানিশ জানে ও।

আবার হাত নাড়ল মজুর। লোকটা বোধহয় শুধু কুয়েচুয়াই জানে। আগে মাহোপানিকে খুঁজে বের করতে হবে, তারপর জিজ্ঞেসাবাদ করা যাবে একে। তখন হয়তো বোঝা যাবে চলে যাওয়া লোকটা কে।

অন্যদের খুঁজে বের করতে অনেক সময় লেগে গেল কিশোরের। ওকে দেখে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল মুসা আর রবিন।

মুসা বলল, 'শয়তান মরিয়েন্তোসের পেছনে যাব বলে অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে খুঁজছি আমরা।'

'মানে?' ভ্রূ কুঁচকাল কিশোর। 'দেখা গেছে তাকে?'

ঘনঘন মাথা দোলাল লিন্ডা। 'হ্যাঁ। একটু আগে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে।'

কিশোরের কি ঘটতে যাচ্ছিল শুনে মাহোপানি এবং অন্যরা নিশ্চিত হয়ে গেল যে খড়ের আঁটি গড়িয়ে দেয়া ওই মরিয়েন্তোসেরই কাজ।

'শয়তানটা যদি এখানে কোথাও থেকে থাকে তাহলে ঠিকই তাকে খুঁজে বের করব আমরা,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল মুসা। 'এসো, সবাই ছড়িয়ে পড়ি। কারও না কারও চোখে লোকটা ধরা পড়তে বাধ্য।'

পনেরো

দ্রুত পায়ে তিনদিকে রওনা দিল মুসা, রবিন আর লিন্ডা। কিশোর পা বাড়াবার আগে মাহোপানিকে বলল, 'আপনি কি ওই মজুরের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন? আমার ধারণা কুয়েচুয়া ভাষায় কথা বলে সে। জানা দরকার যাকে সে দেখেছে সে-লোকটা দেখতে কেমন।'

'যাচ্ছি,' বলল মাহোপানি। 'তারপর ওই মরিয়েন্তোসকে আমিও খুঁজতে বের হবো। ফাজলেমি নাকি! পাহাড় থেকে ফেলে দেবে!'

ধ্বংসাবশেষ দেখতে হাজির হয়েছে বেশ কয়েকজন ট্যুরিস্ট। রবিন, মুসা, কিশোর আর লিন্ডা সামনে যাদের পেল তাদেরই মরিয়েন্তোসের বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল তাকে দেখেছে কিনা। দেখেনি কেউ।

একটা সিঁড়ির মাথায় ওঠার পর দু'জন লোককে আলাপ করতে শুনল মুসা। এগিয়ে আসছে কথার আওয়াজ। স্পষ্ট হলো আরও। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখন। প্রথমে মুসা গুরুত্ব দেয়নি, ভেবেছিল ট্যুরিস্টদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে। কিন্তু গলাটা পরিচিত ঠেকল ওর। তারপর শুনতে পেল লোকটা বলছে, 'কিশোর পাশাকে যেভাবে হোক পেরু ছাড়া করতে হবে।'

লোকটা যে মরিয়েন্তোস নিঃসন্দেহ হয়ে গেল মুসা। ভেবে পেল না কি করবে। সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? বলবে তার কথা শুনে ফেলেছে? লোকটা বিপজ্জনক। কি শুনেছে কিশোরকে সেটা জানানো দরকার। মরিয়েন্তোস ধরতে পারলে সে সুযোগ ওকে দেবে না।

ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল মুসা। দূরে সরে এসে গলা উঁচিয়ে কয়েকবার কিশোরের নাম ধরে ডাকল। জবাব পেল না। আরেকটা চিন্তা মাথায় খেলে গেল ওর। মরিয়েন্তোস হয়তো হোটেলে ফিরে গিয়ে প্লাকটা চুরি করতে পারে। লোকটা হয়তো জানে ব্যারিলোচে হোটেলের গিফট শপ থেকে ওটা উদ্ধার করেছে

কিশোর। মনে হলো ওরা যা জেনেছে তার বেশি প্লাকের নক্সা থেকে আর কিছু বের করতে পারেনি লোকগুলো। সেকারণেই বোধহয় ভয় পাচ্ছে ওদের আগে কিশোরই রহস্যের সমাধান করে ফেলবে। ঠিক করে ফেলল মুসা, ওর প্রথম কাজ হোটেলে গিয়ে প্লাক ছিনতাই ঠেকানো।

প্রায় দৌড়ে হোটেলে ফিরল মুসা, ক্লার্কের কাছ থেকে ঘরের চাবি নিয়ে চলে এলো নিজেদের রুমে। দরজা লক করে দিল। শ্বস্তির শ্বাস ছাড়ল এতোক্ষণে। যাক্, বাবা, পাহারা দেয়া যাবে এবার।'

একটা চেয়ারে বসে পড়ল মুসা। দম নিয়ে নিচ্ছে। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ আসছে না। বোধহয় ভুল ভেবেছিল, মনে হলো মুসার। একটু পরেই পায়ের আওয়াজ পেল, এগিয়ে আসছে। ওদের দরজার সামনে এসে থামল।

দম বন্ধ করে অপেক্ষায় থাকল মুসা। তালায় কোন চাবি ঢোকানো হলো না। দরজার নব ঘুরল। এবার একটা ধাতব আওয়াজ শুনতে পেল ও।

দরজা খোলার চেষ্টা করছে কে যেন! লম্বা একটা সরু ফাইল বেরিয়ে এলো দরজা আর পাল্লার ফাঁক দিয়ে। আর একটু পরেই ভেতরে ঢুকে পড়বে আগন্তুক। কি করবে ভেবে পেল না মুসা। ঘরে টেলিফোনও নেই যে ক্লার্ককে জানাবে। চেয়ার ছাড়ল ও, দরজার কাছে গিয়ে ফাইলটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। মোটা ফাইলটা চলে এলো ওর হাতে।

রাগী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও দরজার ওপাশে, বিড়বিড় করে গাল বকছে। দরজায় লাথি মারল কে যেন, তারপর দৌড়ে চলে গেল সিঁড়ির দিকে। আপাতত আর আসবে না। ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল মুসা, হাতে এখনও ফাইল।

এদিকে অন্যরা এখনও মরিয়েন্তোসকে খুঁজছে, ট্যুরিস্টদের জিজ্ঞেস করছে তাকে দেখা গেছে কিনা। রবিনের সঙ্গে দেখা হলো চওড়া কাঁধের এক মহিলার। গলা শুনলে মনে হয় মেঘ ডাকছে।

দু'এক কথায় পরিস্থিতি জানাল রবিন, মরিয়েন্তোসের চেহারার বর্ণনা দিল। বড় বড় হয়ে গেল মহিলার চোখ। 'তাই? সত্যি? আসলেই? লোকটা চোর? তাকে তো দেখেছি আমি!'

'লিমার পুলিশ লোকটাকে খুঁজছে।'

হোটেলের দিকে আঙুল তাক করল মহিলা। 'লোকটা ওদিকে যাচ্ছিল। ধরতে হলে পা চালাতে হবে তোমাকে।'

মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন। ক্লার্কের কাছে শুনল মুসা চাবি নিয়ে গেছে। ওপরে উঠে দরজায় টোকা দিল ও।

'কে?' ভেতর থেকে জানতে চাইল মুসা।

'আমি। রবিন।'

দরজা খুলে গেল। রবিন ঢোকার পর আবারও বন্ধ। হাতের ফাইলটা দেখিয়ে কি ঘটেছে ওকে জানাল মুসা।

আস্তে করে মাথা দোলাল রবিন। 'মহিলা ঠিকই বলেছিল। মরিয়েন্তোসই

এসেছিল।'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে।' একটু থেমে মুসা বলল, 'আমাদের কপাল ভাল যে সে চলে গেছে।'

'মানে?'

'জানালা দিয়ে দেখলাম একটা গাড়িতে চেপে চলে গেল লোকটা।' সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কি শুনেছে জানাল মুসা, তারপর বলল, 'জানি না তার সঙ্গের লোকটা কে। সে হয়তো এখানেই আছে এখনও। সুযোগ পেলে কিশোরের ক্ষতি করবে।'

'ঠিক,' সায় দিল রবিন। 'কিশোরকে সাবধান করতে হবে।' ফাইলটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখল ও। 'আরে, এটাতে সেনিয়র ভালদেজের নাম লেখা দেখছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। 'তার মানে এটা তাঁর কাছ থেকে চুরি করা জিনিস।'

'মরিয়েন্তোসের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে।'

মাথা নাড়ল মুসা। 'আমাদেরটাও আছে।' উঠে দাঁড়াল। 'চলো, যাওয়া যাক। কিশোরকে সতর্ক করে দিতে হবে।'

সূর্যটা হঠাৎই চলে গেল মেঘের আড়ালে। পরমুহূর্তে কড়কড়কড়াৎ করে বাজ পড়ল। শুরু হলো বজ্রসহ বৃষ্টি।

দরজায় টোকার শব্দ। দরজা খুলল রবিন। লিন্ডা এসেছে।

'ঠিক সময়ে পৌঁছে গেছি,' বলল লিন্ডা, 'নইলে বৃষ্টিতে ভিজতে হতো। নিচে মাহোপানি অপেক্ষা করছে। বলল ভারী বৃষ্টি হবে।' প্রসঙ্গ পাল্টাল ও। 'মজুরের দেয়া বর্ণনা পুরোপুরি মিলে গেছে মরিয়েন্তোসের সঙ্গে।'

মুসা আর রবিনও জানাল এদিকে কি ঘটেছে। শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেল লিন্ডার চেহারা। রবিন থামার পর জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর তাহলে কোথায়?'

'জানি না,' বলল মুসা।

কাঁধ ঝাঁকাল রবিন। 'হয়তো নিচে, বৃষ্টির কারণে ফিরে আসা ট্যুরিস্টদের কাছে মরিয়েন্তোস সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে।'

দরজায় তালা দিয়ে নিচে নেমে এলো ওরা। লবিতে অনেক লোকের ভীড়। তাদের মধ্যে কিশোর নেই। কোনার দিকে একটা চেয়ারে বসে আছে মাহোপানি। বৃদ্ধ যখন শুনল কিশোর ফেরেনি তখন চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল তার চেহারায়।

'মরিয়েন্তোস গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু আবার পায়ে হেঁটে যদি ফিরে আসে? হয়তো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কিশোরকে পেয়ে যাবে।'

'তাছাড়া আছে মরিয়েন্তোস যার সঙ্গে কথা বলছিল সে-লোকটা,' বলল রবিন।

'চলো,' তাগাদা দিল মুসা। 'এমনিতেই অনেক দেরি করেছি আমরা।'

বৃষ্টির মধ্যে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। সামনে বিশ গজ দূরেও নজর চলে না।

ষোলো

প্রাচীন শহরে পৌঁছে কিশোরের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল ওরা। জবাব দিল না কেউ। ওদের কণ্ঠস্বরই প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো বাররার।

লিন্ডার চোখ ছলছল করে উঠল। 'ইশ্ না জানি কি হয়েছে ওর।'

'বুদ্ধি করে বিপদ কাটাতে জানে কিশোর,' সান্ত্বনা দিল রবিন। ওর গলার ভেতরেও কি যেন হয়েছে। মনে হচ্ছে একটা গুঁটলি আটকে গেছে। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে।

মুসা গম্ভীর। ও আর মাহোপানি আগে আগে চলল। মাঝে মাঝেই কিশোরের নাম ধরে ডাকছে। সাড়া দিচ্ছে না কেউ।

কিছুক্ষণ পর লিন্ডা বলল, 'মরিয়েন্তোস যখন গাড়িতে উঠে চলে গেল তখন কি গাড়ির ভেতরে ছিল কিশোর? বন্দি? আমাদের বোধহয় পুলিশে রিপোর্ট করা উচিত।'

মাহোপানি বলল, 'আগে যখন আমরা এদিকে এলাম তখন চুড়ো পার হয়ে ওদিকে আর যাইনি। পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে চলো ওদিকে খুঁজে দেখি।'

সরু খাড়া পথ করে মাহোপানির পেছনে এগোল ওরা। চুড়োয় উঠে নিচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল কিশোরকে।

'ওই যে ও!' বলে উঠল লিন্ডা। চেহারায় স্বস্তির ছাপ পড়ল সবার।

নিচের সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঢালের গোড়ায় চমৎকার একটা দৃশ্য। চারটে কলামের ওপর একটা পঞ্চো ফেলা হয়েছে। দেয়ালবিহীন তাঁবু। তাঁবুর নিচে বুড়ো এক ইন্ডিয়ানের সঙ্গে বসে আছে কিশোর। ব্যস্ত হয়ে বুড়োর কথাগুলো লিখে নিচ্ছে ও, কোনদিকে খেয়াল নেই।

ঢালু পিছলা উৎরাই বেয়ে যতো দ্রুত সম্ভব নেমে এলো রবিন, মুসা, লিন্ডা আর মাহোপানি।

'কিশোর!' জোরে ডাক দিল লিন্ডা।

মুখ তুলল গোয়েন্দা প্রধান, ওদের দেখে হাসল। বলল, 'দারুণ সব সূত্র পাচ্ছি।' মাহোপানির দিকে তাকাল ও। 'আপনি কি লেখাগুলো একটু দেখবেন? এই ভদ্রলোক শুধু কুয়েচুয়া জানেন। আমি উচ্চারণগুলো লিখে নিয়েছি।'

সঙ্গীর সঙ্গে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। ইন্ডিয়ান কায়দায় পরস্পরকে অভিবাদন জানাল মাহোপানি আর পাম্পিটিবু।

সবাই বসার পর রবিন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বললে কুয়াচুয়া ছাড়া আর কিছু জানে না পাম্পিটিবু। তাহলে তাকে দিয়ে কথা বলাচ্ছিলে কি করে!'

হাসল কিশোর। 'আমি বললাম, "মুনানকি! ইমায়ন্যান কাস্কিয়ানকুই।" মনে

নই? হ্যালো! হাউ আর ইউ?'

হাসল ওরা। মাহোপানিও। 'তারপর কি করলে?' জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

'জিজ্ঞেস করলাম আগে কখনও আগুস্তো পিনোশের নাম শুনেছে কিনা।'

'তারপর?'

'তারপর আমার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল পাঙ্গিটিবু। দ্রুত কথা বলতে শুরু করল। বারবার আগুস্তো পিনোশে নামটা উচ্চারণ করল। চিন্তা করলাম শব্দগুলোর উচ্চারণ লিখে ফেলা দরকার। মাহোপানি হয়তো অর্থোদ্ধার করতে পারবে।'

নতুনদের কিছুই বলেনি পাঙ্গিটিবু, কিন্তু আগুস্তোর নাম শুনেই আবার কথা বলতে শুরু করল। বলছে মাহোপানিকে।

'ওয়্যার্ম ক্যাট্ ক্যাচুয়াসুয়া।'

'দাঁত পড়ে যাবে আমার,' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'বলে কি ব্যাটা?'

হাসল মাহোপানি। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'ও জিজ্ঞেস করছে ছেলেটা গুপ্তচর কিনা।'

ওদের পরিচয় দিল মাহোপানি। এবার দুই ইন্ডিয়ান একনাগাড়ে কথা বলতে শুরু করল। পাঙ্গিটিবু ঘনঘন হাত নেড়ে ধ্বংসাবশেষ দেখাচ্ছে। মাহোপানি বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে। কথা শেষ হবার পর অনুবাদ করল মাহোপানি।

'পাঙ্গিটিবুর পরিবারে একটা কিংবদন্তী চালু আছে। ওর এক পূর্বপুরুষ আগুস্তো নামের এক স্প্যানিয়ার্ডের চাকর ছিল। স্প্যানিয়ার্ড লোকটা কিভাবে যেন মাচু পিচুর খোঁজ পেয়ে এখানে আসে।'

আগে কখনও সাদা মানুষ দেখেনি বলে তখনকার ইন্ডিয়ানরা আগুস্তোকে দেবতা মনে করেছিল। খানিকটা তার গায়ের চামড়ার জন্যে, বাকিটা খুব ভাল আঁকতে পারত বলে। কাগজ, কলম কালি আর ব্রাশ সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সে। ইনকা রাজা আর অভিজাতদের নিখুঁত ছবি এঁকে দেয়।

'কিন্তু কিছুদিন পরেই আগুস্তোর জনপ্রিয়তায় ক্ষমতাসীনরা ভয় পেয়ে গেল। যাজকরাও তাদের কথায় সায় দিল। সবাই মিলে বন্দি করল আগুস্তোকে। ওদের ভয় ছিল আগুস্তো ক্ষমতা দখল করে নেবে।'

'দুঃখজনক,' বিড়বিড় করল কিশোর।

হাসল মাহোপানি। 'আগুস্তো খুব চালাক ছিল। বেশিদিন তাকে বন্দি জীবন কাটাতে হয়নি। পালিয়ে যায় সে, আর ফিরে আসেনি। পাঙ্গিটিবুর পূর্বপুরুষও তার সঙ্গে যায়। সে-ও আর ফেরেনি।'

'দারুণ রোমাঞ্চকর কাহিনী,' মন্তব্য করল রবিন। নোটবুকে কথাগুলো টুকছে।

মাথা দোলাল লিন্ডা। 'এখন আমরা জানি মাহোপানির বলা সেই শিল্পী আসলে আমার পূর্বপুরুষ আগুস্তো পিনোশে।'

মাহোপানির দিকে ফিরল কিশোর। 'আপনি কি জিজ্ঞেস করে দেখবেন সেই

শিল্পী আর তার চাকরের সঙ্গে গুপ্তধনের কোন গল্প জড়িয়ে আছে কিনা?'

জিজ্ঞেস করল মাহোপানি। জবাবে মাথা নাড়ল পাম্পিটিবু। না, তার কিছু জানা নেই।

'আর একটা প্রশ্ন,' বলল কিশোর। 'পাম্পিটিবু কি জানে কিভাবে ধ্বংস হলো মাচু পিচু?'

বুড়ো ইন্ডিয়ান জবাব দেয়ার আগেই আবার বাড়ল বৃষ্টির বেগ। কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। সেই সঙ্গে শুরু হলো ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি। চার খুঁটি সহ পঞ্চোটা উড়াল দিল বাতাসে। গুঙিয়ে উঠল পাম্পিটিবু। বয়স হয়েছে, এখন আর দৌড়াদৌড়ি পোষায় না তার।

'আমি ধরছি ওটা!' লাফ দিয়ে উঠে ছুট দিল মুসা। ও বুঝতে পেরেছে বৃদ্ধ ইন্ডিয়ানের কাছে আশ্রয়টা কতোখানি মূল্যবান।

খুঁটিগুলো মাটিতে পড়ে গেছে, খাড়া ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে। কিশোররাও ছুটল মুসার পেছনে।

বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে পাক খাচ্ছে পঞ্চো, ধরা গেল না সহজে। কপাল ভাল যে বাতাসের ঝাপটায় নিজেই ওটা চলে এলো মুসার হাতের কাছে। শক্ত করে ধরে ফেলল মুসা, গোটাতে শুরু করল। কিশোর, রবিন আর লিন্ডা খুঁটি উদ্ধার করছে। রবিন পেল একটা, লিন্ডা একটা আর কিশোর দুটো।

বাতাসের বেগ আরও বাড়ছে। নতুন করে তাঁবু খাটানো সম্ভব হবে বলে মনে হলো না। পাম্পিটিবু আর মাহোপানির কাছে ফিরে এলো ওরা। কিশোর মাহোপানিকে জানাল পাম্পিটিবু ওদের সঙ্গে হোটেলে গেলে খুশি হবে ওরা।

কথাটা শুনে মাথা নাড়ল ইন্ডিয়ান। কিশোর আবার মাহোপানিকে জানাল পাম্পিটিবু এলে প্লাকটা দেখাত ও। হয়তো কিছু বলতে পারবে পাম্পিটিবু। হয়তো কোন সঙ্কেতের মানে বুঝতে পারবে। উপকার হবে তাহলে ওদের।

এবার বৃদ্ধ ইন্ডিয়ান রাজি হলো।

বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে হোটেলে পৌঁছুল ওরা। নিজেদের ঘরে পাম্পিটিবুকে নিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। লিন্ডা ওর ঘরে গেল কাপড় বদলাতে। তিন গোয়েন্দা আর মাহোপানিও পোশাক বদলে নিল। তোয়ালে দিয়ে গা মুছল পাম্পিটিবু। একটা শুকনো কম্বল দেয়া হলো তাকে। ওটা গায়ে জড়িয়ে আয়েস করে বিছানার ধারে বসল সে, কুয়েচুয়া ভাষায় মাহোপানির সঙ্গে কথা বলছে। একটু পরেই এলো লিন্ডা। সোয়েটারের ভেতর থেকে প্লাকটা বের করে পাম্পিটিবুর সামনে রাখল কিশোর।

মুসা বলল, 'তাহলে কি পাহারা দিচ্ছিলাম আমি?'

হাসল কিশোর। 'বারেবারে প্লাক চুরির সুযোগ দেব ভেবেছ নাকি!'

'তোমরা জানতে চেয়েছিলে মাচু পিচু কিভাবে ধ্বংস হলো,' ওরা চুপ করে যাওয়ায় বলল মাহোপানি।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল লিন্ডা। নীরব কৌতূহল কিশোরের। রবিন আর মুসাও

মাহোপানির দিকে চেয়ে আছে।

'পান্সিটিবুর পরিবারের এ আরেক কিংবদন্তী,' শুরু করল মাহোপানি। 'আগুস্তো পিনোশে পালানোর কিছুদিন পরেই মাচু পিচুতে এসে হাজির হলো বেশ কয়েকজন স্প্যানিয়ার্ড। তাদের সঙ্গে ছিল স্প্যানিশ রীতিতে অভ্যস্ত ইন্ডিয়ানরা। শহর অবরোধ করল তারা। একসময় আক্রমণ করে বসল। ভয়ঙ্কর খারাপ একটা সময় গেল মাচু পিচুর মানুষদের। মহিলা আর বাচ্চাদের কেড়ে নিয়ে দাস বানানো হলো। পুরুষগুলোকে বেশিরভাগই খুন করা হলো। নদীতে ফেলে দেয়া হলো তাদের লাশ।'

'কি ভয়ঙ্কর!' বিড়বিড় করল মুসা।

বলে চলল মাহোপানি, 'কিছুই আস্ত রাখল না তারা। একটা চিত্রকর্মও রেহাই পেল না, ধ্বংস করে দেয়া হলো সমস্ত শিল্পকর্ম। জানার আর কোন উপায়ই রইল না একদা কেমন ছিল সৌন্দর্যের জন্যে বিখ্যাত এই শহর।'

'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না,' বলল কিশোর। 'ইন্ডিয়ানরা তাদের বাড়ি-ঘর, প্রাসাদ আর মন্দির বানাতে যে বড় বড় পাথরগুলো এনেছিল সেগুলোর কি হলো।'

পান্সিটিবুর কাছে জিজ্ঞেস করল মাহোপানি, তারপর তার কথা শুনে মাথা দোলাল। কিশোরকে বলল, 'পরে যারা এখানে আসে তারাই পাথরগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়। মাচু পিচু ছিল পবিত্র নগরী, কাজেই তাদের ধারণা হয়েছিল এশহরের পাথর বাড়িতে ব্যবহার করলে তা সৌভাগ্য বয়ে আনবে।'

মাহোপানির কথা শেষ হতে সোয়েটার সরিয়ে প্লাকটা বের করল কিশোর।

'একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন হারিয়ে যাওয়া অক্ষরগুলো সম্বন্ধে পান্সিটিবু কিছু জানে কিনা।'

কুয়েচুয়ায় শব্দগুলো উচ্চারণ করল মাহোপানি।

কয়েক মিনিট গভীর মনোযোগে প্লাকটা দেখল পান্সিটিবু, কি যেন বলল মাহোপানিকে।

মাহোপানি রবিনের দিকে তাকাল। 'কাগজ-কলম।'

নোটবুকটা দিল রবিন, কলম বাড়িয়ে ধরল। পান্সিটিবু নিল ওগুলো। ধীরে ধীরে যত্নের সঙ্গে প্লাকের অক্ষরগুলো কাগজে লিখতে শুরু করল।

মোনো কোলা মেসা।

শ্বাস আটকে অপেক্ষা করছে ওরা। আরও কিছু কি লিখবে পান্সিটিবু?

সতেরো

'শেষ শব্দটা চায়না!' সশব্দে শ্বাস ছাড়ল লিন্ডা।

'শব্দটা দিয়ে কি বোঝায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অনেক কিছু। চাইনিজ, চায়না, পোর্সেলিন—এমনকি নুড়ি পাথরও।'

'নুড়ি পাথর!' বিড়বিড় করল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এলো ওর গলা। 'আমাদের বোধহয় এমন একটা মেসা, মানে পাহাড়ের ওপরের সমতল মাঠ খুঁজে বের করতে হবে যেখানে নুড়ি পাথর আছে।'

'সেই সঙ্গে বাঁদরের কাটা লেজ,' যোগ করল রবিন।

নীরবতা নামল ঘরে। সবাই ওরা ভাবছে আগুস্তো পিনোশে চায়না লিখে কি বোঝাতে চেয়েছেন। ওই মেসায় কি চাইনিজদের বাস আছে? নাকি ওখানে পোর্সেলিন তৈরি হয়?

কি যেন বলল পাম্পিটিবু। মাহোপানির চেহারায় উত্তেজনার ছাপ পড়ল। দ্রুত কথা বলতে শুরু করল দু'জন।

কথা শেষ করে কিশোরের দিকে তাকাল মাহোপানি। 'পাম্পিটিবু বোধহয় তোমাদের রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে। নাস্কান লাইন্সের নাম শুনেছ কখনও?'

'পড়েছি,' বলল রবিন। 'ভাল করে অবশ্য তেমন কিছু জানি না।'

মাহোপানি ব্যাখ্যা করল, 'লিমা থেকে দুশো মাইল দক্ষিণে একটা মরুভূমি আছে। নুড়ি পাথর ভরা একটা সমতলভূমিও আছে ওখানে, সমুদ্র সমতল থেকে বারোশো ফুট ওপরে। সাগর থেকে দূরত্ব হবে পঞ্চাশ মাইল।

'প্রাচীন আমলে, ঠিক কতো আগে তা কেউ জানে না, ওখানে বিরাট বিরাট সব পাথরের মূর্তি বানিয়েছিল মানুষ। ছবিও এঁকেছিল। এখনও ওসব শিল্প দেখা যায়। কাছেই নাস্কানদের বাসনপত্র পাওয়া গিয়েছিল বলে ওগুলোকে বলে নাস্কান লাইন্স। ওখানে আমি কখনও যাইনি, তবে শুনেছি উড়োজাহাজ থেকে সব নাকি স্পষ্ট দেখা যায়। প্লাকে যেরকম লাইন আর বাঁদরের ছবি আছে ঠিক তেমনই আছে নাস্কান অঞ্চলে।'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের পাগলা নাচ অনুভব করল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। 'আমরা ঠিক এমন একটা সূত্রই খুঁজছিলাম।'

ইংরেজিতে পাম্পিটিবুকে ধন্যবাদ জানাল ও। ওর বক্তব্য অনুবাদ করে শোনাল মাহোপানি। হেসে মাথা দোলাল পাম্পিটিবু। তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডা জিজ্ঞেস করল কিছু দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারে কিনা ওরা। জবাবে আবারও হাসল পাম্পিটিবু, জানাল সাধক মানুষ সে, জগতের কোনকিছুর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই বললেই চলে।

মুসার আবার সাধুদের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা। বিড়বিড় করে বলল, 'এমন মানুষের দেখা পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।'

কথাটা অনুবাদ করল মাহোপানি। অত্যন্ত লজ্জিত চেহারা হলো পাম্পিটিবুর। বিদায় চাইল সে।

'এক মিনিট,' তাকে থামাল কিশোর। মাহোপানির মাধ্যমে জানাল পাম্পিটিবু ওদের সঙ্গে খেলে খুব খুশি হবে।

শুনে মাথা নাড়ল পাম্পিটিবু, কুয়েচুয়া ভাষায় কি যেন বলল।

মাহোপানি ইংরেজিতে জানাল লজ্জা পাচ্ছে পাম্পিটিবু, কিছুতেই ডাইনিং রুমে অতো লোকের সামনে খেতে পারবে না। তাছাড়া যেসব খাবার দেয়া হবে সেগুলোতেও সে অভ্যস্ত নয়।

'ঠিক আছে,' বলল কিশোর। 'আর মাত্র একটা প্রশ্ন করব, যদি উনি বিরক্ত না হন।'

'করে ফেলো,' বলল মাহোপানি, 'ও বিরক্ত হবে না।'

'আমরা যে অক্ষর ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়েও দেখতে পেলাম না সেটা এতো বয়সে পাম্পিটিবু দেখতে পেলেন কি করে?'

'এর জবাবটা আমিই দিতে পারব,' হাসল মাহোপানি। 'ইনকা ইন্ডিয়ান যারা পাহাড়ে বসবাস করে জন্মগত ভাবেই তাদের চোখের দৃষ্টি হয় বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ। পাম্পিটিবু কাছ থেকে যেমন সূক্ষ্ম জিনিস দেখতে পায় তেমনি একটু বড় কিছু হলে পরিষ্কার দেখতে পাবে পোনে একমাইল দূর থেকেও।'

লিন্ডা বলল, 'বিশ্বাস হতে চায় না।'

পাম্পিটিবুকে বিদায় জানাতে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। কুয়েচুয়া ভাষায় কি যেন বলল মাহোপানি। সঙ্গে সঙ্গে দূরে তাকাল পাম্পিটিবু। এক মুহূর্ত পরেই মাহোপানিকে কি যেন বলল।

মাহোপানি অনুবাদ করে দিল, 'পাম্পিটিবু নদীর ধারের একটা গাছের ওপর কন্ডো বসে থাকতে দেখেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা পাচ্ছ?'

একে একে মাথা নাড়ল ওরা সবাই। গাছটাই ভাল করে দেখা যায় না তার আবার পাখি।

একটু পরে বোঝা গেল পাম্পিটিবু ঠিকই দেখেছে। বিশাল ডানা মেলে উড়াল দিল একটা কন্ডো, ঘুরতে ঘুরতে উঠে গেল পাহাড়ের চুড়োয়।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল মুসা। 'আমার যদি ওরকম চোখ থাকত!'

'নির্ঘাত ভূত দেখতে তুমি,' ফোড়ন কাটল রবিন।

মাহোপানির কথা শুনে হাসল পাম্পিটিবু, বিদায় চাইল তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডার কাছে।

পেছন থেকে কিশোর বলল, 'কুটিমুনাইকিকামা।'

ঘাড় ফিরিয়ে আন্তরিক চওড়া হাসি হাসল পাম্পিটিবু। খুশি হয়েছে ওর নিজের ভাষায় বিদেশী ছেলেটা ওকে শুভ বিদায় জানানোয়। পা বাড়াবার আগে সেও সবার শুভ কামনা করল, তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে চলল নিজের আস্তানার দিকে।

পরদিন সকালে মাচু পিচু ছাড়ার জন্যে তৈরি হয়ে নিল সবাই। প্রথমে ট্রেনে করে কাযকো এলো ওরা, তারপর মাহোপানির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্লেনে চড়ে লিমায়। রহস্যটা নিয়ে লোকজনের সামনে কোন কথা হলো না ওদের। প্রত্যেকেই

চোখ-কান খোলা রেখেছে। তবে মরিয়েন্তোসকে দেখতে পেল না কেউ।

'তুমি কি বাড়ি গিয়েই পুলিশে খবর দেবে?' ট্যাক্সিতে উঠে জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'আগে যাব সেনিয়র ভালদেজের দোকানে, তাঁর ফাইলটা ফেরত দেব। জানা দরকার উনি মরিয়েন্তোসের কাছ থেকে কোন খবর পেয়েছেন কিনা।'

ড্রাইভারকে ঠিকানা বাতলাল লিন্ডা।

ওদের দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেনিয়র ভালদেজের চেহারা। কিন্তু কি ঘটেছে কাযকো এবং মাচু পিচুতে শুনে ছায়া ঘনাল পরে। জানালেন মরিয়েন্তোসের কাছ থেকে কোন খবরই পাননি। লোকটা যেন স্রেফ উধাও হয়ে গেছে।

'সেনিয়র ভালদেজ,' বলল কিশোর, 'আপনি বলেছেন যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কিছু চুরি যায়নি। এখনও কি একই কথা বলবেন, না অন্য কিছু চুরি করেছে মরিয়েন্তোস?'

সেনিয়র ভালদেজ জানালেন এখনও দেখার সময় করে উঠতে পারেননি। ওদের আসতে ইশারা করে মরিয়েন্তোস যেখানে কাজ করত সেই পেছনের ঘরে চলে এলেন তিনি। পর পর দুটো ড্রয়ার খুললেন।

তাঁর চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ করল ওরা। 'আশ্চর্য!' বললেন সেনিয়র ভালদেজ, 'আমার সমস্ত ড্রয়িং গায়েব। নিশ্চয়ই মরিয়েন্তোস নিয়ে গেছে!'

কিশোরের তীক্ষ্ণ চোখে একটা ড্রয়ারের পেছনের প্যানেল ধরা পড়েছে। ওটা খুঁটিয়ে দেখার অনুমতি চাইল ও।

'নিশ্চয়ই! অবশ্যই! দেখো।'

পুরোটা ড্রয়ার বের করে এনে ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর রাখল কিশোর। বোঝা গেল সমান আকারের ড্রয়ারের তুলনায় এটার ভেতরে জায়গা কম। পেছনদিকে একটা তক্তা দিয়ে ড্রয়ারটা আরও মজবুত করা হয়েছে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। সেনিয়র ভালদেজের কাছ থেকে ফেরত আনা ফাইলটা চেয়ে নিল। ওটা ঢোকাল কাঠের সরু ফাটলে। চাড় দিতেই খসে এলো আলগা তক্তা। পেছনে পাওয়া গেল বেশ কয়েকটা চিঠি।

একটা খাম তুলে নিল কিশোর। লিমায়, মরিয়েন্তোসের বাড়ির ঠিকানায় লেখা হয়েছে।

'আচ্ছা!' বিড়বিড় করল ও, বাকিদের দেখাল। চিঠি পাঠিয়েছে হেনরি ওয়াল্টার।

'হেনরি ওয়াল্টার!' গলা চড়ে গেল লিন্ডার। 'সেই আমদানীকারক, যে প্লাকটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল!'

মুসা খুলে বলল সেনিয়র ভালদেজকে। এদিকে কিশোর ব্যস্ত। আরেকটা চিঠির ভাঁজ খুলেছে ও। চারপাশ থেকে ওর দিকে ঝুঁকে এলো সবাই। পড়ল কিশোর। চমকে গেল প্রত্যেকে।

সম্বোধন করা হয়েছে "ডিয়ার এল গ্যাটো" বলে। চিঠিতে জানানো হয়েছে মাল ঠিকমতোই পৌঁছে গেছে। চেক পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। চিঠির শেষে এল গ্যাটোর চাতুর্যের প্রশংসা করা হয়েছে।

সেনিয়ার ভালদেজের দিকে ফিরল কিশোর। 'আপনি জানতেন মরিয়েন্তোসের আরেক নাম এল গ্যাটো?'

'না,' ঘন ঘন মাথা নাড়লেন সেনিয়র ভালদেজ।

'পুলিশের হুলিয়া আছে লোকটার নামে,' জানাল কিশোর।

'এক্ষুণি আমি হেডকোয়ার্টারে ফোন করে জানাচ্ছি।' ভালদেজ ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিশোর মরিয়েন্তোসের ওয়ার্কবেঞ্চের অন্য ড্রয়ারগুলো এই সুযোগে ঘেঁটে দেখতে শুরু করল। বিড়বিড় করে বলল, 'হয়তো জানা যাবে কি মাল পাচার করত মরিয়েন্তোস।'

অন্যরা হাত লাগানোয় কাজটা দ্রুত এগোল। প্রতিটা ড্রয়ার ওরা সতর্ক চোখে দেখছে। কিশোর খেয়াল করল একটা ড্রয়ারের তলা অন্যগুলোর চেয়ে পুরু। ফাইলটা আবার ব্যবহার করল ও। সহজেই খসে এলো ড্রয়ারের তলা। ওটার নিচে ড্রয়ারের আসল তলা। দুটো তক্তার মাঝখানে পাওয়া গেল একটা সালাদের চামচ আর একটা কাঁটাচামচ।

'অ্যারায়ানেস কাঠ দিয়ে তৈরি,' ভ্রূ কুঁচকে বলল লিন্ডা।

'হাতলগুলো নির্ঘাত ফাঁপা,' মন্তব্য করল মুসা।

কিশোর চেষ্টা করল হাতল খোলার। প্যাঁচ আছে হাতলে। সহজেই ঘুরতে শুরু করল। খুলে যাচ্ছে। খুলে গেল। ভেতরে তাকিয়ে সাদা পাউডার দেখতে পেল ওরা।

দোকানে ঢুকলেন দু'জন পুলিশ অফিসার। সেনিয়র ভালদেজ তাঁদের পথ দেখিয়ে দোকানের পেছনের ঘরে নিয়ে এলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অফিসারদের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

চামচের হাতলটা তুলে অফিসারদের দেখাল কিশোর। 'আমার বিশ্বাস এল গ্যাটো চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত।'

একজন অফিসার হাতলটা নিয়ে ভেতরের পাউডারের গন্ধ শুঁকলেন। চেহারা কঠোর হয়ে গেল তাঁর। 'পিয়োর কোকেন! তবু পুলিশ ল্যাবোরেটরিতে দেব নিশ্চিত হওয়ার জন্যে।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই জানালার দিকে তাকাল মুসা। জানালার চৌকাঠ পেরিয়ে একটা হাতকে ভেতরে ঢুকতে দেখল ও। এবার লোকটার চেহারাও দেখতে পেল।

মরিয়েন্তোস!

মুসা হাঁ করার আগেই জ্বলন্ত সলতেসহ একটা বোমা ঘরের ভেতর ছুঁড়ে মারল লোকটা।

'শুয়ে পড়ুন সবাই!' চিৎকার বেরিয়ে এলো মুসার কণ্ঠ চিরে।

মুসার গলায় এমন কিছু ছিল যে সময় নষ্ট না করে ঝট করে মাটিতে শুয়ে পড়ল সবাই। বোমাটা মরিয়েন্তোসের ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর পড়ল। বুম্! করে ফাটল বোমা। চারদিকে উড়ে গেল কাঠ, রং, বার্নিশ। ধুলোর আস্তরণে চেহারা পাল্টে গেল সবার।

আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই দেখে একে একে উঠে দাঁড়াল সবাই। উত্তেজিত ভালদেজ আধা স্প্যানিশ আর আধা ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করলেন।

জানালাটা আঙুল দিয়ে দেখাল মুসা। 'বোমাটা মরিয়েন্তোস, মানে এল গ্যাটো মেরেছে।'

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দুই পুলিশ অফিসার। 'আহত হয়েছ কেউ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কারও বড় ধরনের কোন জখম হয়নি। ওদের কপাল ভাল যে বাড়িতে বানানো বোমাটা খুব শক্তিশালী ছিল না। সবারই সামান্য কেটেছড়ে গেছে, তার বেশি কিছু নয়।

স্পষ্ট বুঝতে পারল কিশোর, তার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করার জন্যেই বোমা মেরেছে এল গ্যাটো।

'লোকটা বোধহয় এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের পিছু নিয়েছিল,' বলল ও। 'সঙ্গে বোমা ছিল।

'পুলিশ লোকটাকে ধরতে পারলে বাঁচি,' কেঁপে গেল লিন্ডার গলা। সেনিয়র ভালদেজকে কিশোরের দিকে বালতি ছুঁড়ে মারার আগে বিড়ালের মুখ আঁকা–সব খুলে বলল ও।

কিশোর ব্যস্ত অন্য চামচটার হাতল নিয়ে। ওটার ভেতরেও সাদা পাউডার পাওয়া গেল। ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর, নিচু গলায় বলল, 'কতোখানি পাচার করেছে কে জানে! পুলিশ অফিসাররা ফিরলেই তাঁদের বলতে হবে যাতে রকি বীচের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কাস্টম্স্ অফিসারদেরও সতর্ক করতে হবে।'

আঠারো

'পুলিশ আর কাস্টম্স্ যাতে হেনরি ওয়াল্টারের আমদানী করা জিনিসের ওপর চোখ বুলাতে পারে?' পায়ের ভর বদল করল রবিন।

পুলিশ অফিসারদের দু'জনের একজন ফিরে এলেন, জানালেন এল গ্যাটোকে ধরা যায়নি, পালিয়েছে আগেই।

চিঠি দেখাল কিশোর। 'হয়তো লোকটাকে এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।'

মাথা নাড়লেন ভালদেজ। 'আমার এখানে যখন চাকরি নিল তখন কিন্তু

আমাকে এই ঠিকানা দেয়নি মরিয়েন্তোস। পরে তাহলে বাসা বদলেছে।'

'ধরা পড়ার ভয়ে কোথাও বোধহয় বেশিদিন থাকে না,' বলল কিশোর।

'তবে ধরা ওকে পড়তেই হবে,' জোর দিয়ে বললেন পুলিশ অফিসার। চিঠিগুলো নিলেন কিশোরের হাত থেকে। অন্যজনও চলে এসেছেন। হাতলগুলো কাঁটাচামচ আর চামচে আটকে পকেটে পুরলেন তিনি। 'ল্যাবোরেটরির রিপোর্ট জানিয়ে দেব সেনিয়র ভালদেজকে। ইচ্ছে করলে তাঁর কাছ থেকে তোমরাও জেনে নিতে পারবে।'

পুলিশ অফিসাররা চলে যাবার পর ট্যাক্সি নিয়ে সেনিয়র পিনোশের বাসায় চলে এলো ওরা। পাহাড়ে এবং দোকানে কি কি ঘটেছে শুনে অবাক হয়ে গেলেন লিন্ডার বাবা-মা। লিন্ডার মা'র মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বুকে হাত ভাঁজ করে প্রার্থনা করলেন তিনি, তারপর বললেন, 'প্রথম থেকেই তোমাদের সবার জন্যে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার।' স্বামীকে দেখালেন। 'ভাবছি ওঁকে বলে তোমাদের গোপনে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া যায় কিনা।'

সুযোগ পেয়ে নাস্কান লাইন্সের কথাটা তুলল কিশোর। ওখানে গোপনে গেলে এল গ্যাটোর খপ্পরে পড়ার সম্ভাবনা কম।

সব শুনে রাজি হয়ে গেলেন সেনিয়র পিনোশে। 'আমার তো মনে হচ্ছে এটা গুড আইডিয়া,' বললেন তিনি। 'কিছুদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা তোমাদের জন্যে ভালই হবে। আমি ভাবছি মরুভূমিতে একটা ক্যাম্পিং ট্রিপের আয়োজন করে ফেললে কেমন হয়।'

খুশিতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল লিন্ডা। 'হয়েছে, থাক!' কপট রাগ দেখালেন সেনিয়র পিনোশে।

ঠিক হলো সেনিয়র পিনোশের কোম্পানির বিল্লট হেলিকপ্টারটা কিছুদিনের জন্যে ধার নেয়া হবে। আর্জেন্টিনায় যাওয়ার একটা কারণ ছিল বিশ্রাম নেয়া, সেটা হয়ে ওঠেনি কাজের চাপে, ফলে সেনিয়র পিনোশেও ছুটি কাটাতে যাবেন ওদের সঙ্গে। সেনিয়রা অবশ্য রাজি হলেন না। মরুভূমির গরম সহ্য হয় না তাঁর।

কয়েকটা চিঠি এসেছে তিন গোয়েন্দার কাছে। কিশোর পেল মেরি চাচীর চিঠি। তিনি জানতে চেয়েছেন সময় কেমন কাটছে ওর। ঠাট্টা করে লিখেছেন, তোর লেজকাটা বাঁদরের কি হলো? 'তোরটা আছে তো?'

মনের মধ্যে খচ করে উঠল কিশোরের। আরেহ্, তাই তো! বাঁদরের লেজটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অথচ ওখানেই হয়তো আছে আসল রহস্যের সমাধান। প্লাকটা আবার ভাল করে দেখল ও। মুসা, রবিন আর লিন্ডা গল্প করছে, সেদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিল না।

একটু পরে সুফলও পেল। প্লাকের উল্টোদিকে যে রেখা গেছে, সেটা হতে পারে বাঁদরের লেজের বাকি অংশ! সেটা শেষ হয়েছে গিয়ে শব্দফাঁদের ঠিক মাঝখানে।

বন্ধুদের মনোযোগ আকর্ষণ করল ও, বলল, 'বোধহয় নতুন একটা জিনিস

জানা গেল। বাঁদরের লেজ যেখানে শেষ সেখানে ক্যাম্প করব আমরা। ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখতে চাই।' ওর ধারণা সংক্ষেপে খুলে বলল।

'আগে আসল বাঁদরটা খুঁজে বের করতে হবে,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'পারব আমরা,' দৃঢ় গলায় বলল রবিন।

ডিনারের পুরোটা সময় আসন্ন যাত্রা নিয়ে আলাপ হলো। সেনিয়র পিনোশে জানালেন কোম্পানির পাইলটই নিচ্ছেন। পাইলট থাকছে আর্নেস্তোশিও বুচাগালি আর কো-পাইলট ক্যানিযিয়ো মন্তানা।

কি কি নিতে হবে তার একটা লিস্ট করে ফেলেছেন সেনিয়র পিনোশে। তাঁবু তার মধ্যে অন্যতম। মরুভূমিতে তাঁবু ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। কয়েকটা নেয়া হবে। ছেলেমেয়েরা যেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে চাইবে সে-জায়গার ওপর একটা টাঙিয়ে দেয়া হবে। কোম্পানির বাবুর্চিকেও নিচ্ছেন সেনিয়র পিনোশে। শুনে মুসার মুখে চওড়া হাসি দেখা দিল।

ডিনারের পরপরই পুলিশের ফোন এলো। ধরলেন সেনিয়র পিনোশে। ওপ্রান্তের বক্তব্য শুনে রিসিভার নামিয়ে বললেন, 'হাতলের ভেতরে যা পাওয়া গেছে তা খাঁটি কোকেন। ইউনাইটেড স্টেটসে পাচার হতো। ওখানে এক অসাধু কেমিস্ট হেনরি ওয়াল্টারের মাধ্যমে কিনত, তারপর কোকেন থেকে হেরোইন তৈরি করত। তার অধীনে কাজ করত পঞ্চান্নজন বিক্রেতা। কেমিস্টকে গ্রেফতার করেছে রকি বীচ পুলিশ। খুচরা বিক্রেতাদেরও অনেকে ধরা পড়েছে।

'চোরাচালানের পরে অ্যারায়ানেস কাঠ প্রচুর দামে বিক্রি করত হেনরি ওয়াল্টার।'

'অ্যারায়নেস কাঠ লাগত কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'ওই কাঠ তো অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।'

জবাবটা কিশোর দিল। 'প্রচুর জিনিস আমদানী করত হেনরি ওয়াল্টার। কিন্তু ওয়াল্টারের জন্যে শুধু অ্যারায়ানেস কাঠের ভেতরে কোকেন ভরে সাপ্লাই দিত এল গ্যাটো, ওরফে মরিয়েন্তোস, যাতে চিনে নিতে সুবিধে হয়।'

'সেই কেমিস্ট ধরা পড়ল কি করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'পুলিশ জামিনে ছেড়ে দেয় হেনরি ওয়াল্টারকে,' বললেন সেনিয়র পিনোশে। 'তার ওপর চোখ রাখতে থাকে। পরে হেনরি ওয়াল্টার ওই কেমিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই পুলিশী অভিযান চালানো হয়। প্রচুর কোকেন পাওয়া যায় কেমিস্টের কাছে। সেই সঙ্গে হেরোইন। তার জবানবন্দি অনুযায়ী পরে অন্যান্যদের গ্রেফতার করা হয়।'

'মরিয়েন্তোস ধরা পড়েছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না,' বললেন পিনোশে। 'চিঠিতে লিমার যে ঠিকানা ছিল সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ওখানে কয়েকদিনের জন্যে ভাড়া ছিল লোকটা। গত এক সপ্তাহে সেখানে সে যায়নি।'

মুসা বলল, 'লোকটার সঙ্গী-সাথীরা সব ধরা পড়ে গেছে। হয়তো ভয় পেয়ে

পালাবে এল গ্যাটো। আমাদের আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার তা মনে হয় না। আরও ক্ষেপে যাবে লোকটা। মরিয়া হয়ে উঠবে।'

'আমাদের সঙ্গে আরেকজন যাবেন,' বললেন সেনিয়র পিনোশে। 'তাঁর কথা তোমাদের বলা হয়নি। তিনি একজন আর্কিওলজিস্ট। ডক্টর বেনেভাইল।'

পরদিন ভোরে ওদের নিয়ে ব্যক্তিগত একটা এয়ারফিল্ডে চলে এলেন সেনিয়র পিনোশে। এয়ারফিল্ডটা তাঁর কোম্পানির। ওখানে অপেক্ষা করছিলেন ডক্টর বেনেভাইল। পরিচয় পর্ব সারার পর বিরাট একটা সবুজ রঙের হেলিকপ্টারে উঠে পড়ল ওরা।

একটু পরেই দক্ষিণ পেরু লক্ষ্য করে ছুটল হেলিকপ্টার। দু'ঘণ্টা পরে পাইলট তাঁর মাইকে জানালেন নাস্কান লাইন্সের কাছে চলে এসেছেন তাঁরা। জানালা দিয়ে উঁকি দিল সবাই।

'থাইসে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কত্তোবড় মূর্তি, দেখেছ!'

মাটিতে শুয়ে থাকা এক লোকের মূর্তি দেখাল ও। কো-পাইলট জানালেন ওটা আটশো ফুট দীর্ঘ।

'ওই যে একটা মাছ,' বলে উঠল রবিন। 'ওটার মাঝ দিয়ে গেছে চওড়া একটা রাস্তা।'

কো-পাইলট জানালেন নাস্কান লাইন্সের গুরুত্ব সম্বন্ধে ভালমতো জানার আগেই ওই রাস্তা তৈরি করা হয়, প্যান আমেরিকান রোড। বর্তমানে অব্যবহৃত।

'আমি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা একটা বাঁদর দেখতে পাচ্ছি,' বলল লিন্ডা। কো-পাইলট জানালেন ওই মূর্তিটা দুশো বাষট্টি ফুট উঁচু।

'অসাধারণ একটা শিল্প,' মন্তব্য করলেন সেনিয়র পিনোশে, 'তবে ওটা আমাদের সেই বাঁদর নয়।'

অবাক হয়ে দেখছে সবাই। মরুভূমির বুকে এ যেন চওড়া সব রাস্তার ছড়াছড়ি। এখানে ওখানে প্রকাণ্ড মূর্তি।

'আগে কখনও আর্কিওলজির এমন নজির দেখিনি,' বললেন সেয়িনর পিনোশে।

সায় দিলেন ডক্টর বেনেভাইল। 'পুরোটা এক মস্ত রহস্য। কেউ জানে না কেন ইন্ডিয়ানরা তাদের শিল্পগুলো এতো বড় করে তৈরি করেছিল।'

তাঁর কথা মাত্র শেষ হয়েছে এমন সময়ে মুসা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, 'আরেহ্! ওই তো! ওই তো প্লাকের সেই বাঁদর!'

উনিশ

জানালা দিয়ে উঁকি দিল সবাই। ঠিকই বলেছে মুসা। লেজকাটা বাঁদরটা ঠিক নিচেই দেখা গেল।

'ওখানেই নামব আমরা,' বলল কিশোর।

সেনিয়র পিনোশে পাইলটকে জানাতে মূর্তিটার ওপর বারকয়েক চক্কর মারল কপ্টার, তারপর ধীরে ধীরে এক পাশে নামতে শুরু করল।

বাঁদরের পাশেই একটা বিড়ালের মূর্তি। 'ওটা দেখে মরিয়েন্তোসের কথা মনে পড়ে গেল আমার,' বিড়বিড় করল লিন্ডা।

শুনে ফেলেছে কো-পাইলট, জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে তুমি? মরিয়েন্তোস?'

'হ্যাঁ।'

কো-পাইলট জানাল কয়েক বছর আগে পেরুভিয়ান ফ্লাইং স্কুলে যখন সে পড়ত তখন মরিয়েন্তোস নামের এক ক্লাসমেট ছিল। 'ওর বামহাতে বিড়ালের একটা উল্কি আঁকা ছিল।'

'আরও কিছু জানেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। সবার চোখ কো-পাইলটের ওপর।

'খুব ভাল প্যারাশুটিস্ট ছিল সে। কিন্তু মানুষ হিসেবে ভাল ছিল না। নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়। তারপর আর কোন খবর জানি না।' লিন্ডা আর কিশোরের ওপর ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। 'তোমরা তাকে চেনো?'

'হ্যাঁ,' জানাল কিশোর। সংক্ষেপে মরিয়েন্তোসের কীর্তি বলল। 'যদি লোকটার কোন খবর পান তাহলে দয়া করে পুলিশকে জানাবেন।'

নেমে পড়েছে হেলিকপ্টার। সিঁড়ি নামানো হলো। নেমে পড়ল সবাই।

'গরম!' ভ্রূ কুঁচকে গেল রবিনের।

ডক্টর বেনেভাইল জানালেন মরুভূমিতে তাপের তারতম্য নেই বললেই চলে। একটু পরেই শরীর এই তাপ মানিয়ে নেবে।

'মাঝে মাঝে ভোরের দিকে সামান্য কুয়াশা পড়ে এখানে,' তবে বৃষ্টি কখনোই হয় না।'

আর্কিওলজিস্ট ঠিকই বলেছেন। একটু পরে গরমটা আর তেমন অসহ্য মনে হলো না কারও কাছে। চারপাশে খুঁটি পোঁতা হলো, তার ওপর বিছিয়ে দেয়া হলো তারপুলিন। তৈরি হয়ে গেল অস্থায়ী তাঁবু। কপ্টার থেকে খোঁড়াখুঁড়ির যন্ত্রপাতি নামানো হলো। তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডা ব্যস্ত হয়ে উঠল। তর সইছে না ওদের। লাঞ্চ শেষ করেই নিজেদের ইচ্ছের কথা জানাল ওরা।

ছেলেমেয়েরা কোথায় খুঁড়তে চায় জিজ্ঞেস করলেন আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোক। কিশোর নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিল বাঁদরের লেজ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে।

ওখানেও খুঁটি পুঁতে তারপুলিন দিয়ে তাঁবু বানানো হলো।

কাজ শুরু করল কিশোররা। নুড়ি পাথর মাত্র দু'ইঞ্চি পুরু। তারপর বাদামী-সাদা পাথরের স্তর। আগুস্তো পিনোশে যদি এখানে কিছু রেখেও থাকেন তাহলে বেশি গভীরে নেই জিনিসটা।

কয়েক ফুট করে খুঁড়ে বিশ্রাম নিচ্ছে একেকজন, তার জায়গা নিচ্ছে অন্যজন। লিন্ডাও বসে থাকল না, সমানে সমান কাজ করছে।

আর্কিওলজিস্ট আর সেনিয়র পিনোশে পাইলটদের নিয়ে জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখছেন। বাবুর্চি রান্নার কাজে লেগে গেছে।

'ধূর! কিছু পাবো না!' দু'ঘণ্টা পেরোবার আগেই হতাশ হয়ে পড়ল মুসা।

সন্ধে ছয়টায় সেনিয়র পিনোশে বললেন একদিনের জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে ওরা, এবার বিশ্রাম নেয়া উচিত। ঠিক তখনই চেঁচিয়ে উঠল লিন্ডা।

'দেখো! মমি! একটা মমি পেয়েছি আমি!'

দ্রুত পায়ে লিন্ডার চারপাশে হাজির হয়ে গেল সবাই, এমনকি বাবুর্চিও। মমির মাথাটা শুধু বের করেছে লিন্ডা। মরুভূমির শুকনো আবহাওয়ায় কোন ক্ষতি হয়নি লাশটার। চেহারাটা এখনও স্পষ্ট বোঝা যায়। সবাই হাত লাগানোয় অগভীর কবর থেকে পুরোটা দেহ বের করে আনা সম্ভব হলো।

গভীর মনোযোগে লাশ দেখলেন ডক্টর বেনেভাইল। 'এটা প্রাচীন কোন ইন্ডিয়ানের মমি নয়। সাদামানুষের মমি।'

কাপড় দেখে মনে হলো লোকটা স্প্যানিশ।

'কবর যে দিয়েছে সে যত্নের সঙ্গে করেছে কাজটা,' মন্তব্য করলেন আর্কিওলজিস্ট।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, সেনিয়র পিনোশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কি মনে হয়, এই দেহটা সেনিয়র আগুস্তো পিনোশের হতে পারে?'

কথাটা শুনে সবাই মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল। সামলে নিলেন সেনিয়র পিনোশে। চিন্তা করে দেখেছেন ছেলেটার কথা ঠিক হবার সম্ভাবনাই বেশি। যে ইন্ডিয়ান চাকর প্লাকটা লিমায় দিয়ে গিয়েছিল সে-ই হয়তো ওঁর পূর্বপুরুষকে কবর দেয়।

'পরিচয় জানার মতো কিছু হয়তো পাওয়া যাবে,' বললেন আর্কিওলজিস্ট। তাঁর নির্দেশে কবরের মাটি আরও খোঁড়া হলো। বেরিয়ে এলো একটা ছোট বাক্স। ভেতরে আছে কিছু কাগজ আর কয়েকটা সোনার ছোট মূর্তি। কাগজগুলো শুকনো মুচমুচে হয়ে গেছে। ভয় হয় ধরলে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

খুব সাবধানে একটার ভাঁজ খুললেন ডক্টর বেনেভাইল। ভাল স্প্যানিশ জানেন তিনি, কাজেই অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া লেখা পড়তে খুব একটা অসুবিধে হলো না। জোরে জোরে পড়লেন:

"সম্মানের সঙ্গে ক্যাপ্টেন আগুস্তো পিনোশেকে স্প্যানিশ সেনাবাহিনী হতে অবসর দেয়া হলো।"

মমিটা আবার গভীর মনোযোগে দেখল লিন্ডা আর ওর বাবা। সেনিয়র পিনোশে আবেগ সামলে নিয়ে বললেন, 'দেহটা আপাতত এখানেই থাকুক। পরে আমরা সরানোর ব্যবস্থা করব।'

'মূর্তিগুলো ইনকাদের আমলের,' মন্তব্য করলেন আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোক। 'আমাদের জাতীয় সম্পদ।'

মমির হাতের মুঠোয় একটা কাপড়। আর কেউ লক্ষ করেনি। কিশোর ওটা সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে খুলল।

একটা মানচিত্র। মরুভূমিটা দেখানো হয়েছে। পশ্চিমে একটা পাহাড়শ্রেণী আঁকা হয়েছে। একটা গিরিখাদ বড় করে দেখানো আছে মানচিত্রে। ওটার এক জায়গায় একটা ক্রস চিহ্ন। পাইপের মতো কি যেন আঁকা হয়েছে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। কোনও গুহা?

কাপড়টা সেনিয়র পিনোশেকে দিল ও। গভীর মনোযোগে ওটা দেখলেন তিনি, তারপর ডক্টর বেনেভাইলকে দিলেন। আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোক কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'বুঝতে পারছি না। মরুভূমির ওই অংশে খনি থাকার কথা নয়। অন্তত আমাদের জানা নেই। কিন্তু মানচিত্রে খনির কথা বলছে। পরিত্যক্ত খনি। তার মানে ইনকাদের আমলেই পরিত্যক্ত হয়।'

আপাতত এ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না কেউ। কবরে আবার শুইয়ে দেয়া হলো আগুস্তো পিনোশেকে। নুড়ি পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো দেহটা। সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে। রাতের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ল ওরা।

পরদিন সূর্য ওঠার আগে ঘুম ভাঙল সবার। মাত্র নাস্তা শেষ করেছে ওরা, এমন সময় দূরে একটা প্লেনের আওয়াজ শুনতে পেল। ঘড়ঘড় আওয়াজটা ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। একটু পর দিগন্তের কাছে ছোট্ট প্লেনটাকে দেখা গেল। একটা বালির ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

নিচু দিয়ে উড়ছে, কাছে চলে এসেছে। প্যারাশুট নিয়ে ওটা থেকে ঝাঁপ দিল এক লোক। ফুলে গেল প্যারাশুট। ধীরে ধীরে ক্যাম্পের কাছেই নামল লোকটা।

'কি চায়?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে মুসার।

আরও তিনজন লোক প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ দিল প্লেন থেকে। মাটিতে নেমে দ্রুত হাতে ব্যাঙের ছাতার মতো কাপড়গুলো গুছিয়ে নিল তারা, এগিয়ে আসতে শুরু করল ক্যাম্পের দিকে।

প্যারাশুটিস্টদের নেতা হালকা-পাতলা লোক, মুখ ভরা দাড়ি। কালো চুলগুলো ঘাড়ের ওপর লুটাচ্ছে। গম্ভীর স্বরে সে বলল, 'আমি আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু পেরুভিয়ান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাদের গ্রেফতার করা হলো। কপ্টারে উঠুন সবাই। আমার লোকরা আপনাদের লিমায় নিয়ে যাবে।'

মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে গেল সবাই, তারপর সামলে নিয়ে ডক্টর বেনেভাইল বললেন, 'কিন্তু আমরা তো সরকারী অনুমোদন নিয়ে এসেছি! এখানে খোঁড়াখুঁড়ির পারমিট দেয়া হয়েছে আমাদের।'

'পারমিট বাতিল করা হয়েছে,' বলল দাড়িওয়ালা। 'ঝামেলা করবেন না। আমরা আপনাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতে চাই না। যা আছে তা এখানেই থাকবে, আপনারা কপ্টারে উঠুন।' পিস্তল বেরিয়ে এলো লোকটার হাতে।

দাড়িওয়ালার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। কুতকুতে চোখ। ঘন ঘন নড়ছে মণি। গভীর সন্দেহ হলো ওর, এই লোকই ছদ্মবেশে মরিয়েস্তোস ওরফে এল গ্যাটো নয় তো? সন্দেহের কথাটা নিচু গলায় পাইলট আর কো-পাইলটকে জানাল ও।

দু'জনের কেউই বসে থাকার বান্দা নয়, বোঝা গেল উত্তেজনার খোরাক পেলে সুযোগ হারাতে রাজি নয়। সামনে বেড়ে খপ্ করে দাড়িওয়ালার দু'হাত ধরে ফেলল দু'জন। ঝাঁকি খেয়ে পিস্তলটা দূরে গিয়ে পড়ল। চট করে ওটা তুলে নিলেন সেনিয়র বেনেভাইল। হাত পেছনে নিয়ে জিনিসটা লুকালেন।

কো-পাইলট লোকটার শার্টের হাতা গোটাতে ব্যস্ত। 'এবার দেখি তোমার হাতে বিড়ালের উল্কি আছে কিনা।'

'চুল আর দাড়ি নকল হলে খসে আসবে,' যোগ করলেন পাইলট। দাড়ি ধরে হালকা এক টান লাগালেন তিনি। চড়চড় করে উঠে এলো খানিকটা দাড়ি।

'বাপরে!' করে উঠল দাড়িওয়ালা।

'ছাড়ুন ওকে!' তেড়ে আসার ভঙ্গিতে সামনে বাড়ল দাড়িওয়ালার তিন সঙ্গী। 'খবরদার!'

ঠিক তখনই হাতটা ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে কো-পাইলটকে ঘুসি মেরে বসল দাড়িওয়ালা। তার সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল কো-পাইলট আর পাইলটের ওপর।

গলা ছেড়ে দিলেন সেনিয়র পিনোশে। থামুন আপনারা! আমরা কোন ঝামেলা চাই না।'

দীর্ঘদেহী এক ঢ্যাঙা প্যারাশুটিস্ট ডক্টর বেনেভাইলের দিকে যাচ্ছিল, ডক্টর পিস্তলটা উল্টো করে ধরে মাথার ওপরে তুললেন। 'দেবো এক বাড়ি!'

সিদ্ধান্ত বদলে রবিনের দিকে ফিরল লোকটা। রবিন মুসার অনুকরণে হাত নেড়ে ইয়াহ্হু বলে এক বিকট চিৎকার ছাড়ল। করে কি! অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল কিশোর। এদিকেও সুবিধে হবে না ভেবে লোকটা এবার লিন্ডাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল, তারপর ছুটে চলে গেল কপ্টারের কাছে। চিৎকার করে বলল, 'শোনো! আমার কথা শোনো। যা বলছি তাই করতে হবে। নইলে মেয়েটাকে আমি জিম্মি হিসেবে নিয়ে যাব!'

বিশ

'এতো সহজ নয়!' প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল কো-পাইলট, তারপর ভীষণ ঝটকায় দুই প্যারাশুটিস্টকে ছিটকে ফেলে দিল আট-দশ হাত দূরে। কি ভয়ানক শক্তি সে শরীরে রাখে তা না দেখলে বিশ্বাস করার নয়।

পাইলট তখনও দাড়িওয়ালার সঙ্গে যুঝছে। মুসাও বসে নেই, দৌড়ে কপ্টারের কাছে পৌঁছে গেছে ও, বসে পড়েই লম্বু লোকটার দু'হাঁটু ধরে সামনে টান দিল। লোকটা ভেবেছিল তাকে পেছনে ঠেলা দেয়া হবে, তৈরি হয়ে ছিল, কিন্তু সামনে টান দেয়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। লাফ দিয়ে আগেই মাটিতে নেমেছে লিন্ডা, দ্রুত সরে গেল। দড়াম করে লম্বুর কাঁধে এক জুডো চপ বসিয়ে দিল মুসা। কাঁধ চেপে মুসার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল লম্বু, ভাব দেখে মনে হলো কিশোর একটা ছেলে এতো ব্যথা দিতে পারে সে ব্যাপারে তার কোন ধারণাই ছিল না। কপ্টার থেকে নাইলনের দড়ি এনে লোকটাকে বাঁধল লিন্ডা।

টানাহ্যাঁচড়ায় মরিয়েন্তোসের নকল চুল-দাড়ি খসে পড়েছে। ফকফকা চেহারা, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। শার্টের একটা হাতা ছিঁড়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে তার নীল রঙের বিড়ালের উল্কি।

সেদিকে কো-পাইলটের খেয়াল নেই, সে তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে যাওয়া এক প্যারাশুটিস্টকে বাঁধছে।

বাকি লোকটা মাথার ওপর দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করল। পাইলট তাকে বেঁধে ফেললেন দড়ি দিয়ে। মরিয়েন্তোস ওরফে এল গ্যাটো বুঝে গেছে আর কোন আশা নেই, ঘুরে দাঁড়িয়েই দৌড়াতে শুরু করল সে। ভুল করল।

দৌড়ে মুসার ধারে কাছে না তার গতি। মাত্র দশ সেকেন্ডে লোকটাকে ধরে ফেলল মুসা। পাশ থেকে ল্যাং মারল, দড়াম করে নুড়ি পাথরে পড়ল লোকটা। সেনিয়র পিনোশে চলে এসেছেন ততোক্ষণে, মরিয়েন্তোসের দু'হাত পিছমোড়া করে ধরে রাখলেন তিনি। কিশোর দড়ি দিয়ে কব্জি বাঁধল।

শুয়ে থেকেই মরিয়েন্তোস প্রস্তাব দিল, 'আমাদের ছেড়ে দাও। কারও কোন ক্ষতি করব না আমরা। কপ্টার নিয়ে চলে যাব। পরে তোমাদের নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়ে দেব।'

ক্ষেপে বোম হয়ে গেল কো-পাইলট, 'কতোবড় সাহস শয়তানটার!'

'পুলিশে দেয়া হবে তোমাকে,' বললেন সেনিয়র পিনোশে। 'আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিলে তুমি। প্লেনের দরজা লোক দিয়ে নষ্ট করে রেখেছিলে।'

আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোক এতোক্ষণ চোখ বড় বড় করে ঘটনা দেখছিলেন, তিনি এবার এগিয়ে এলেন। পিস্তলটা দিলেন সেনিয়র পিনোশের হাতে।

ব্যাখ্যা করলেন সেনিয়র পিনোশে, 'একে পুলিশ খুঁজছে অনেকদিন হলো। চোরাকারবারী। কোকেন পাচার করে।'

পরিচয় গোপন নেই বুঝে মুখ কালো হয়ে গেল মরিয়েন্তোসের। অন্যদিকে চেহারা ফিরিয়ে নিল। কিশোরের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার। চোখ জ্বলে উঠল। বলল, 'শুধু তুমি যদি না থাকতে, ডেঁপো ছোকরা! খুন না করে ভুল করেছি। আমার লোকজন একে একে ধরা পড়ল তোমারই শয়তানিতে।'

কপ্টারের ভেতরে গিয়ে ঢুকল কো-পাইলট। কিশোর বুঝতে পারল, ফেডারাল পুলিশকে খবর দিচ্ছে ক্যানিযিও মন্তানা। এবার মরিয়েন্তোস মুখ খুলতে বাধ্য হবে। ধরা পড়বে তার বাকি সঙ্গী-সাথীরা।

ঠিক হলো হাত-পা ভালোমতো বেঁধে এখানেই বন্দিদের রেখে যাওয়া হবে একটা তাঁবুর তলায়। পুলিশকে জানানো হয়েছে। তাদের কপ্টার এসে এদের নিয়ে যাবে।

কাজটা সারতে বেশি সময় লাগল না। লাঠি হাতে লোকগুলোর পাহারায় রয়ে গেল ক্যানিযিয়ো মন্তানা। পিস্তলটা তার কাছে দিয়ে দিলেন সেনিয়র পিনোশে। ওটা কোমরে গুঁজে নিল কো-পাইলট। কোমরে পিস্তল আর হাতে লাঠি নিয়ে পায়চারি শুরু করল গম্ভীর চেহারায়।

আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোক অস্থির হয়ে উঠেছেন। মানচিত্র অনুযায়ী সত্যি পরিত্যক্ত কোন খনি আছে কিনা জানতে উদ্‌গ্রীব।

কিশোর ভাবছে ওখানে কি আছে মাহোপানির বলা সেই মূল্যবান সম্পদ সত্যি আছে?

আধঘণ্টা পর রওনা হলো ওরা।

দেড় ঘণ্টা লাগল পাহাড়শ্রেণীটার কাছে পৌঁছুতে। গিরিখাদটা খুঁজে বের করতে বেশ ঝামেলা হলো। একবার ওটা পেয়ে যাওয়ার পর শুধু গিরিখাদ ধরে অনুসরণ করা।

বেশ চওড়া খাদ। এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। ক্রমেই ঢুকে গেছে পাহাড়ের আরও গভীরে। পাথুরে মেঝে, বড় বড় পাথর পড়ে আছে এখানে ওখানে। খুব নিচু দিয়ে উড়ছে কপ্টার। অধৈর্য বোধ করছে সবাই।

আর কতোদূর?

পেরিয়ে গেল আরও আধঘণ্টা, তারপর পর্বতমালার যেখানটা ম্যাপে দেখানো হয়েছে সেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে অপেক্ষাকৃত সমতল একখণ্ড জমিতে কপ্টার নামালেন পাইলট।

নামল তিন গোয়েন্দা, লিন্ডা, ডক্টর বেনেভাইল আর সেনিয়র পিনোশে। মানচিত্রে আরেকবার চোখ বুলাল কিশোর। 'হ্যাঁ, এখানেই খনিটা। ওটার কাছেই আছে সেই গুহা।'

'গত কয়েকশো বছরে কেউ এখানে আসেনি,' বললেন সেনিয়র পিনোশে। 'আসা সম্ভবও ছিল না। পরিত্যক্ত এই খনির আশেপাশের কয়েকশো মাইলের মধ্যে পানি নেই। স্বেচ্ছায় মরতে চাইবে কে! এতোকাল পর আমরাই প্রথম এলাম।'

'আশ্চর্য!' বললেন বেনেভাইল। 'আসলেই এখানে খনি ছিল!'

খনি-মুখ পেরিয়ে সামান্য দূরেই মানচিত্রে আঁকা প্রাকৃতিক সেই রত্নগুহা। যেন কোন দানবের হাঁ করা কালো মুখ। মুখের কাছে পড়ে আছে বড় বড় কয়েকটা পাথর। ওগুলো দিয়ে বোধহয় মুখ বন্ধ করা হয়েছিল, পরে সরিয়ে ভেতরে ঢোকেন আগুস্তো পিনোশে। পাথরগুলো আর জায়গামতো রাখেননি।

ভেতরে ঢুকতেই ভ্যাপসা একটা গন্ধ এলো নাকে। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল ওরা। বিরাট গুহায় আধুনিক টর্চের আলোও একেবারে অপর্যাপ্ত। কেমন যেন একটা ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

'খাইসে!' হঠাৎ আঁৎকে উঠল মুসা। গলা কেঁপে গেল ওর। 'ও···ওটা কি!'

ওর আঙুল বরাবর তাকিয়ে থমকে গেল প্রত্যেকে

দেয়ালের গায়ে কাত হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা কঙ্কাল!

'কারা হতে পারে?' অবাক গলায় প্রশ্ন করলেন সেনিয়র পিনোশে।

'জানি না,' বললেন বেনেভাইল। 'সত্যি আশ্চর্য!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। মাহোপানির সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেছে ওর। ইনকা রাজার নির্দেশে একশো সৈন্য সোনাদানা হিরেমাণিক সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর ফেরেনি তারা। ফিরতে নির্দেশও হয়তো দেয়া হয়নি। তাহলে কি এরাই সেই সৈন্য? জেনেশুনে রাজার আদেশে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল? হয়তো ফেরার মতো পানি ছিল না তাদের কাছে। সেক্ষেত্রে এই গুহায় আরও অনেক কঙ্কাল আছে।

'চলুন, দেখি সামনে কি আছে,' পা বাড়াল কিশোর। মুসা ওর গায়ে সেঁটে আছে। ডক্টর বেনেভাইল মুগ্ধ হয়ে গুহাটা দেখছেন।

ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় এগিয়ে চলল ওরা। সামনে বাঁক নিয়েছে গুহা। বাঁকটা পার হয়েই থেমে দাঁড়াল কিশোর। শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরল মুসা। অল্প অল্প কাঁপছে মুসার হাত।

বিরাট একটা হলঘরের আকৃতি নিয়েছে এখানে গুহাটা। ছাদ থেকে নেমে এসেছে স্বচ্ছ স্ফটিকের সরু সরু টুকরো। টর্চের আলোয় নানা রং ঠিকরে বেরোচ্ছে ওগুলোর গা থেকে। কিন্তু এসব দেখে ভয় পায়নি মুসা। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেনিয়র পিনোশে। বাবার হাত আঁকড়ে ধরে আছে লিন্ডা।

সারি সারি কঙ্কাল, পাশাপাশি পড়ে আছে। কোন কোনটার মাথায় এখনও ইনকা সাজ। নিঃসন্দেহ হয়ে গেল কিশোর। সংক্ষেপে মাহোপানির কাছে কি শুনেছিল সেনিয়র পিনোশে আর সেনিয়র বেনেভাইলকে বলল ও। 'এরাই

ইনকা রাজার সেই বিশ্বস্ত সৈন্যের দল।'

'নিজেদের জীবন দিয়ে রাজার আদেশ পালন করে গেছে ওরা,' বললেন সেনিয়র পিনোশে। মাথা থেকে টুপিটা খুলে আস্তে করে শ্রদ্ধা ভরে বাউ করলেন সেনিয়র বেনেভাইল।

মানচিত্রে চোখ বুলাল কিশোর। একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে টোকা দিল। 'এই যে যেখানে আছি আমরা। এখানেই কোথাও আছে সেই গুপ্ত ঘর। ইনকাদের সমস্ত সম্পদ রাখা আছে সেখানে।'

গুহাটা ঘুরে ঘুরে দেখল ওরা। চারদিকে নিরেট পাথরের দেয়াল। দরজার কোন চিহ্ন মাত্র নেই।

'কিন্তু এখানেই কোথাও একটা দরজা থাকার কথা,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

মুসা ধপ করে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল।

চমকে গেল কিশোর। আস্তে আস্তে ওপর দিকের একটা খাঁজের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে একদিকের দেয়ালের ছোট একটা অংশ। নিশ্চয়ই সাধারণ ব্যালান্স প্রিন্সিপালে কাজ করে দ্বারটা। মুসার পাথরে বসা আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খোলার ব্যাপারটা চোখ এড়ায়নি ওর। পাথরটা যে লিভারের কাজ করে তা বুঝতে পারল। দরজা আবার বন্ধ করার জন্যেও বোধহয় আলাদা লিভার আছে। সেটা খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে না। এখন জানা আছে কি খুঁজতে হবে।

মুসা বাইরে পাহারায় থাকল। কিশোর আর সেনিয়র পিনোশে পাশাপাশি আগে ঢুকল কুঠুরিতে, তাদের পেছনে সেনিয়র বেনেভাইল। বিশফুট বাই বিশফুট একটা চৌকো কামরা। তিনদিকে সারি সারি বাক্স রাখা। সবকয়টার ডালা খোলা। আটকানোর প্রয়োজন বোধ করেননি আগুস্তো পিনোশে। টর্চের আলোয় দেয়ালে নানারঙা দ্যুতি ছড়াল নানা ধরনের মহামূল্যবান রত্ন। নিশ্চুপ হয়ে গেল ওরা।

দু'দিকের দেয়াল লাগোয়া কাঠের বাক্সগুলো রত্নখচিত। ওগুলোর ভেতরে অসংখ্য নিরেট সোনার মূর্তি। এতোকাল পরেও চকচক করছে। ট্রিলিয়ন ডলার দাম হবে শুধু ওই মূর্তিগুলোরই। এছাড়া আছে বাকি দু'দিকের বাক্সগুলো। ওগুলো উপচে পড়ছে হিরে, মুক্তো, নীলা, পান্না, চুনি—নানা দুর্মূল্য পাথরে। ওগুলোর দাম কতো হবে তা আন্দাজ করা মুশকিল। এ যেন সলোমনের গুপ্তধন—অবিশ্বাস্য দামী সম্পদ!

'চলো,' মৃদু গলায় বললেন সেনিয়র পিনোশে, 'দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে। আবার আসব আমরা। সরকারী লোক নিয়ে আসব। এগুলো পেরুর জাতীয় সম্পত্তি।'

'হাজার বছরের সেরা আবিষ্কার,' বিড়বিড় করলেন বেনেভাইল।

নীরবে কুঠুরি থেকে বের হলো তিন গোয়েন্দা আর লিন্ডা। এবার সহজেই

কুঠুরির দরজা বন্ধ করার পাথরটা খুঁজে পেল কিশোর। ওটায় ওপর থেকে চাপ দিতেই ধীরে ধীরে নেমে এলো পাথরের দেয়াল, বোঝার উপায় রইল না ওই দেয়ালের পেছনে আছে কোন গুপ্ত কুঠুরি।

কিশোর, মুসা আর রবিন, তিনজনই খুশি। যে-কাজে হাত দিয়েছিল অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সে-কাজে সফল হতে পেরেছে ওরা।

হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে কাছের শহরটার দিকে। পেরুতে তিন গোয়েন্দার কাজ শেষ। এবার শুধু বেড়ানো, তারপর ফিরে যাওয়া রকি বীচে। হয়তো ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওখানে নতুন কোন রহস্য!

***

('রোমহর্ষক' সিরিজের 'পাগলাঘণ্টী' বইটিকে 'তিন গোয়েন্দা' সিরিজে রূপান্তরিত করে তৈরি হলো 'শয়তানের জলাভূমি'। উল্লেখ্য পাগলাঘণ্টী-র লেখক জাফর চৌধুরী রকিব হাসানেরই ছদ্মনাম।)

শয়তানের জলাভূমি

রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

এক

কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে মুসা। নিজেদের সীমানার মধ্যে একটা পুরানো, শুকনো ডোবা পরিষ্কার করে সুইমিং পুল বানানোর ইচ্ছে। এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো কিশোর ও রবিন।

ফিরে তাকাল মুসা। হাতের কোদালটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। 'এতক্ষণে আসার সময় হলো তোমাদের।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। 'এত দেরি করলে যে?'

'কই আর দেরি করলাম? মাত্র তো কয়েক মিনিট। তবে তারও কারণ আছে,' জবাব দিল কিশোর। 'রবিন, বলো ওকে।'

'তুমিই বলো,' রবিন বলল।

সতর্ক হয়ে গেল মুসা। 'মনে হচ্ছে জরুরী কোনও খবর নিয়ে এসেছ? দেখো, ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা কোরো না বলে দিলাম। তোমরা কথা দিয়েছিলে, গরমের ছুটিতে এখানে সুইমিং পুল বানাতে সাহায্য করবে আমাকে।'

'তাই তো করতে চেয়েছিলাম,' কিশোর জবাব দিল। 'তবে এখন আর পারা যাবে কিনা সন্দেহ আছে...'

'কেন?'

'ডাকাত,' বলল রবিন। 'রেল ডাকাত। ভোর বেলা উঠেই চলে গিয়েছিলাম কিশোরদের বাড়িতে। ওখানেই নাস্তা সেরে তোমাদের বাড়িতে আসার জন্য বেরোতে যাব, এই সময় ফোন করলেন মিস্টার সাইমন। একটা কেস নিয়েছেন হাতে। বললেন, আমাদের সাহায্যও হয়তো লাগতে পারে।'

'রেল ডাকাত? বাদ দাও,' হাত নেড়ে যেন উড়িয়ে দিল মুসা। 'পুল বানানো অনেক ভাল। কাজ করলে ছুটির সময়টা উড়ে চলে যাবে।' আবার কোদাল তুলে কোপ মারল মুসা। এক কোপে তুলে আনল অনেকখানি কাদামাটি। ছুঁড়ে ফেলল পাশের উঁচু জমিতে। পরক্ষণে বলে উঠল, 'খাইছে!'

ছুঁড়ে ফেলা মাটির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

'কী?' জানতে চাইল কিশোর ও রবিন।

জবাব না দিয়ে মাটি থেকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিল মুসা। দেখতে দেখতে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'প্রাগৈতিহাসিক ঝিনুকের ফসিল!'

'দেখি?' পিছন থেকে বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল ওরা। দাঁড়িয়ে আছেন রকি বিচ হাইস্কুলের সাইন্স টিচার আর ছাত্রদের প্রিয় ট্র্যাক কোচ আলবার্ট হেনরি কুপার। ছয় ফুট লম্বা। বয়েস সাতাশ-আঠাশ।

মুসার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন তিনি। মাথা নাড়লেন, 'নাহ্, সাধারণ জিনিস। প্রাগৈতিহাসিক ব্র্যাকিওপডের মতই লাগছে অবশ্য...'

'কী পড?' হাঁ হয়ে গেছে মুসা।

'ব্র্যাকিও। খুব মূল্যবান ফসিল। লাখ লাখ বছরের পুরানো।' হাসলেন কুপার। 'বিজ্ঞানীরা এর সঙ্গে মানুষের জন্মের যোগসূত্র খুঁজছেন।' হাতের ঝিনুকটার দিকে তাকালেন। 'এটার বয়েস বেশি না। পুরোপুরি ফসিল হয়ে সারেনি এখনও।'

ঝিনুকটা ছুঁড়ে ফেলে কিশোরের দিকে তাকালেন কুপার। 'কিশোর, তোমাকেই খুঁজছি। বাড়িতে ফোন করেছিলাম, তোমার চাচী বললেন মুসাদের বাড়িতে খোঁজ করতে...আমার কাজটা...আচ্ছা, খুলেই বলি।' কোনরকম ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি আসল কথায় চলে এলেন তিনি, 'আমার এক আন্টির কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। অ্যারিজোনায় থাকেন। আমার আঙ্কেলের নাম ওয়াল্ট পারকিনস, কিছুদিন আগে মারা গেছেন। একটা মূল্যবান আবিষ্কার প্রায় করে ফেলেছিলেন।'

'বিজ্ঞানী ছিলেন নাকি?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ, জিওলজিস্ট। বছরখানেক আগে একটা প্রাগৈতিহাসিক উটের ফসিলের খোঁজ পান। এক সময় ওই উটেরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত অ্যারিজোনার মরু অঞ্চলে। ফসিলটা আবিষ্কারের কিছুদিন পরেই এল প্রচণ্ড ঝড়, সব চিহ্ন মুছে দিল, ঢেকে দিল সব কিছু। চেষ্টা করলে আবারও খুঁজে বের করতে পারতেন, কিন্তু সুযোগ পাননি। হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেছেন।'

'আহ্হা,' কিশোর বলল।

মুসা জানতে চাইল, 'এক বছর আগে ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জায়গাটা। এখন কীভাবে খুঁজে বের করব?'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর ও রবিন। মুচকি হেসে রবিন বলল, 'না শুনেই ফসিল খুঁজতে যেতে চাও, তোমার পুলের কী হবে?'

'বুঝতে পারছি না,' দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছে মুসা, 'কোনটা আগে করব! সুইমিং পুল বানাব, না ফসিল খুঁজতে যাব?'

'সবটা শোনো আগে,' কুপার বললেন। 'মৃত্যুর আগে একটা নকশা এঁকে রেখে গেছেন আঙ্কেল। তাতে জায়গাটা মোটামুটি চিহ্নিত করা আছে। নাম ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প।'

ভুরু কোঁচকাল রবিন। 'ওসব অঞ্চলে ওয়াইল্ডক্যাট তো বলে কুগারকে, তাই

না, সার?' গড়গড় করে বলে গেল চলমান জ্ঞানকোষ. 'বিড়াল গোষ্ঠীর এই বড় আকারের প্রাণীটির কুগার ছাড়াও আরও নাম আছে–পিউমা, মাউন্টেন লায়ন...জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য মাউন্টেন লায়নই বলেন।'

'ওয়াইল্ডক্যাট বলে কী বোঝাতে চেয়েছেন আঙ্কেল, জানি না,' কুপার বললেন। 'মাউন্টেইন লায়নের কথাও বলে থাকতে পারেন। ফসিল যেখানে পাওয়া গেছে, তার কাছাকাছি একটা সাইনবোর্ড দেখেছেন, তাতে লেখা হিয়ার লাই দা বডিয অভ টোয়েন্টি ওয়াইল্ডক্যাট।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। বি-ই-শ-টা!'

'এতগুলো জানোয়ারকে মারল, আহারে!' আফসোস করল রবিন। 'মানুষ কী নিষ্ঠুর! অকারণে...'

'কিন্তু আমি ভাবছি,' নীচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, 'কুগার মেরে কবর দিল কেন?'

ভুরু নাচাল মুসা. 'এর মধ্যেও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ নাকি তুমি?'

'রহস্য কতখানি আছে জানি না, তবে বিপদ আছে,' কুপার জবাব দিলেন।

'তা তো থাকবেই। শুনেছি, কুগারও নাকি মানুষখেকো হয়,' মুসা বলল। 'বন্দুক নিতে হবে, সার?'

মাথা নাড়লেন কুপার। 'আমি কুগারের কথা বলছি না। আন্টির চিঠি পাওয়ার পর থেকেই ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ছিলাম। স্কুল ছুটি হওয়ার পর আর একটা দিনও দেরি করিনি, গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারিনি, মুখোশ পরা দুজন লোক জোর করে আমার গাড়ি থামিয়ে টাকাপয়সা সব কেড়ে নিয়েছে। শাসিয়ে দিয়েছে, আর যেন না এগোই।'

'ফসিল খুঁজতে বাধা?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক বলতে পারব না। ফসিলের কথা একবারও উল্লেখ করেনি ওরা, নকশার কথাও কিছু বলেনি।'

'তাহলে আর কী কারণ?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। 'টাকাপয়সা কেড়ে নিয়েছে, তারমানে ওরা ডাকাতই, বিজ্ঞানী নয়। ফসিলের লোভে আপনাকে বাধা দেয়নি।'

'আমারও তা-ই ধারণা।'

'তাহলে আমরা গিয়ে কী করব?'

'ডাকাত ঠেকাবে,' কুপার বললেন। 'সেই সঙ্গে ফসিল খুঁজতে সাহায্য করবে আমাকে।...যাবে আমার সঙ্গে?'

'যেতে তো ইচ্ছে করছে, সার, কিন্তু একটু সমস্যা আছে,' জবাব দিল কিশোর। 'আপনার আগেই মিস্টার ভিকটর সাইমন আমাদেরকে আরেকটা কাজের কথা বলেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে নিই, তারপর জানাব।'

কিছুটা নিরাশ মনে হলো কুপারকে। 'তোমরা গেলে খুব ভাল হতো।'

'বুঝতে পারছি, সার,' জবাব দিল কিশোর। 'যত শীঘ্রি সম্ভব জানাব আপনাকে।

সেদিনই মিস্টার সাইমনের বাড়িতে এল তিন গোয়েন্দা। সকালের ঘটনাটার কথা জানাল। মিস্টার কুপার ওদেরকে ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে যেতে অনুরোধ করেছেন, সেটাও বলল।

'ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প? আশ্চর্য!' ভুরু উঁচু করলেন মিস্টার সাইমন। 'শেলবি কারমল নামে একটা লোকের পিছে লাগিয়েছিলাম জেসনকে।' জেসন উইলকিনস মিস্টার সাইমনের সহকারী, জানে তিন গোয়েন্দা।

'ডেলমোর জেলখানা থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে শেলবি,' মিস্টার সাইমন বললেন। 'আড়ি পেতে তার কথা শুনেছে জেসন। একটা লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় কয়েকবার করে শেলবি "টোয়েন্টি ওয়াইল্ডক্যাট" বলেছে। জেসনের ধারণা, শব্দ দুটোর কোনও বিশেষত্ব আছে।'

'শেলবি এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে চলে যায়নি তো?'

'তাই তো ভাবছি,' জবাব দিলেন মিস্টার সাইমন। 'মিস্টার কুপারকে বাধা দিয়েছে শুনে সন্দেহটা আরও জোরাল হচ্ছে।...আচ্ছা, যা-ই হোক, তোমাদের যে জন্য ডেকেছি। ডেলমোর জেলখানায় যেতে হবে তোমাদের। নতুন কোনও তথ্য জানতে পারো নাকি দেখো। আমিই যেতাম, কিন্তু আরেকটা জরুরী কাজ আছে আমার।' একটু থেমে বললেন, 'জেলখানার ওয়ারডেন পিটার ফিলবি আমার বন্ধু। ওকে আমার কথা বোলো। তোমাদের তদন্তের সুবিধে করে দেবে।'

'জেসনকে পাঠাচ্ছেন না কেন?'

'ওকে চিনে ফেলেছে ডাকাতরা। তোমাদের চেনে না।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

দুই

পরদিন সকালে ডেলমোর জেলখানায় ওয়ারডেন পিটার ফিলবির সঙ্গে দেখা করল তিন গোয়েন্দা। তিনি জানালেন, শেলবি কারমল দাগী আসামী, তার নামে লম্বা রেকর্ড রয়েছে পুলিশের খাতায়।

লোকটা দেখতে কেমন জানতে চাইল কিশোর।

ওয়ারডেন জানালেন, 'কারমল দীর্ঘদেহী। উঁচুস্বরে কথা বলে। ওর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, টম ফেরেনটি ও বেন মানচিনি। বেন বেঁটে, হাত-পা-গলার রগ অস্বাভাবিক ফোলা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। ওস্তাদ জালিয়াত। শেলবির সঙ্গে একই দিনে ছাড়া পেয়েছে।'

'আর টম ফেরেনটি?' কিশোর জানতে চাইল।

'এখনও আমাদের জেলে। বিশালদেহী, ছোটখাট পাহাড় বললে ভুল হবে না। রেলে চাকরি করত আগে, ইঞ্জিন মেরামত করত। তা ছাড়া খুব ভাল ইলেকট্রিশিয়ানও। সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকে থাকে, যেন সব কিছুর ওপরই বিরক্ত...'

ওয়ারডেনের কথা শেষ হলো না। জোরে ঘণ্টা বাজতে লাগল। তার সঙ্গে পাল্লা দিল যেন সাইরেনের কর্কশ চিৎকার।

'পাগলাঘণ্টী!' চেঁচিয়ে উঠলেন ফিলবি। 'আসামী পালিয়েছে...'

এবারও কথা শেষ হলো না তাঁর। বেজে উঠল টেবিলের টেলিফোন। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন। এত জোরে কথা বলছে ওপাশের লোকটা, তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর দূর থেকেও কানে আসছে কিশোরের। টেলিফোনে কথা শুনে কুঁচকে গেল ওয়ারডেনের ভুরু। তিন গোয়েন্দাকে জানালেন, 'টম ফেরেনটি পালিয়েছে!'

মেঘলা আকাশের মত থমথম করছে পিটার ফিলবির চেহারা। ফোনে গাড়ি বের করার নির্দেশ দিয়ে দৌড়ে বেরোলেন অফিস থেকে।

তিন গোয়েন্দাও বেরোল। নিচু ছাদওয়ালা করিডর ধরে ছুটল ওয়ারডেনের পিছন পিছন।

জেলখানার বাইরের চত্বরে পৌঁছে দেখল, অসংখ্য গার্ড ছোটাছুটি করছে। সবার হাতে রাইফেল। সবাই উত্তেজিত, সতর্ক, যাতে আর কোন কয়েদী পালাতে না পারে।

গেটের প্রহরীকে বললেন ওয়ারডেন, 'শুনলাম, কসাইদের ট্রাকটা নাকি বেরিয়েছে একটু আগে। আমার ধারণা, ওটাতে করেই পালিয়েছে টম। ট্রাকটা কোনদিকে গেছে দেখেছ?'

'দেখেছি, সার। রুট ফোর জিরো থ্রি দিয়ে উত্তরে গেছে। হ্যারিসন কোম্পানির ট্রাক।'

বিকট গর্জন করতে করতে ছুটে এল তিনটে ইমারজেন্সি ট্রাক, আগে আগে রয়েছে ওয়ারডেনের গাড়ি। তিন গোয়েন্দাকে অপেক্ষা করতে বললেন ফিলবি। কিন্তু কিশোর সঙ্গে যেতে চাইল। 'চুপচাপ গাড়িতে বসে থাকবে, কোন গোলমাল করবে না,' কথা আদায় করে শেষে ওদেরকে নিতে রাজি হলেন ফিলবি।

আলাদা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে গিয়ে ট্রাকগুলোকে খোঁজার নির্দেশ দিলেন ওয়ারডেন। পায়ে হেঁটে খুঁজতে চলল একদল অস্ত্রধারী গার্ড। কয়েকজন বেরোল মোটর সাইকেল নিয়ে।

'ফোর জিরো থ্রি,' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন ফিলবি।

এক জায়গায় এক টুকরো বনের ভিতর দিয়ে গেছে পথটা। বাঁক রয়েছে ওখানে। গতি কমাল না ড্রাইভার। মোড় ঘোরার সময় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে প্রতিবাদ জানাল যেন গাড়ির টায়ার।

'ট্রাক-ড্রাইভারের সঙ্গে যোগসাজশ করে পালায়নি তো টম?' কিশোরের প্রশ্ন।

'অসম্ভব না,' ওয়ারডেন বললেন। 'পালাতে হলে কারও না কারও সাহায্য

তো লাগেই। আমার মনে হয়...

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কিশোর, দেখো দেখো, একটা ডেলিভারি ট্রাক!'

রবিনও দেখেছে। বলল, 'হ্যারিসন কোম্পানিরই তো!'

'মাথা নামাও, কুইক,' ওয়ারডেন বললেন তিন গোয়েন্দাকে। 'একদম তুলবে না। আমি ওকে থামাচ্ছি।'

ওয়ারডেনের নির্দেশে নিজেদের গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। সুইচ টিপল সাইরেনের। সাঁ করে পাশ কাটিয়ে এসে ট্রাকের আগে আগে চলল। জানালা দিয়ে হাত বের করে থামার ইঙ্গিত করলেন ফিলবি।

ট্রাক থামল।

পিস্তল হাতে লাফিয়ে নামলেন ওয়ারডেন।

পিস্তল দেখে নীচের চোয়াল ঝুলে পড়ল ট্রাক ড্রাইভারের। জানালা দিয়ে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'কয়েদী আছে তোমার গাড়িতে!'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল লোকটা। 'অসম্ভব!'

তার কথায় কান দিলেন না ওয়ারডেন। ঘুরে পিছন দিকে গিয়ে টান দিয়ে ট্রাকের পিছনের দরজা খুলে ফেললেন। ভিতরে দেখে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, 'নেই।' রেডিওতে কথা বলতে শুরু করলেন তাঁর সহকারীদের সঙ্গে।

তিন গোয়েন্দাও নেমে এল। ড্রাইভারকে অনুরোধ করল কিশোর, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার ট্রাকের ভিতরটা একটু দেখতে চাই।'

'দেখো।'

ভিতরটা ঠাণ্ডা। সূত্র খুঁজতে শুরু করল কিশোর। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বলে উঠল দুই সহকারীকে, 'এই, দেখো!' ছোট একটা কাঠের বাক্সের মত জিনিস তুলে নিয়েছে সে। 'হাতে বানানো রেডিওর মত লাগছে না?'

ভালমত দেখে নিশ্চিত হলো তিনজনে, মিনিয়েচার রিসিভিং সেট। এত ছোট, হাতের তালুতেই এঁটে যায়। নবে মোচড় দিতেই খড়খড় করে উঠল স্পিকার, তারপর শোনা গেল কথা, '...আবার বলছি, টম। কারগো। ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ ফোর। বিকেল তিনটেয়। রক স্প্রিং।'

থেমে গেল কথা।

'শেলবির গলা,' পিছন থেকে বললেন ওয়ারডেন। ট্রাকে উঠে এসেছেন।

'কিন্তু, মানে কী এ সব কথার?' রবিনের প্রশ্ন। 'টমের পালানোর সঙ্গে শেলবির হাত নেই তো?'

'থাকতেও পারে,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন ওয়ারডেন। 'জেলখানায় থাকতে ইলেকট্রিশিয়ান'স শপে কাজ করত টম। রেডিওটা নিশ্চয় ওখানে বসেই বানিয়েছে। পালানোর প্ল্যান করার পর।'

'তারমানে শেলবি আর বেন মানচিনি জেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর টমকে

বুদ্ধি বাতলে দিয়েছে কীভাবে পালাতে হবে,' বলল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমারও তা-ই ধারণা। রেডিওতে শেলবি টমকে বলেছে, কারগো–তার মানে মালগাড়ি। ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ ফোর–নিশ্চয় রেলের বগির নম্বর, আর বিকেল তিনটা, রক স্প্রিঙ হলো রেলের টাইম-টেবল।' উত্তেজিত হয়ে তুড়ি বাজাল সে, 'মিস্টার ফিলবি, টম লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিল বললেন না?'

'হ্যাঁ।'

'বিকেল তিনটে তো প্রায় বেজেই গেছে,' হাতঘড়ি দেখল কিশোর। 'আর রক স্প্রিংও এখান থেকে বেশি দূরে না।'

'চলো চলো, জলদি চলো!' কিশোর কী বলতে চায় বুঝে ফেলেছেন ওয়ারডেন। তাড়াতাড়ি ট্রাক থেকে নেমে গাড়িতে উঠলেন। তিন গোয়েন্দা উঠলে ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে বললেন। তাঁর একজন সহকারী রাস্তায় রয়ে গেল ট্রাক ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য।

একটা পানির ট্যাংকের কাছে এসে শেষ হয়েছে গাড়িচলা পথ। আর যাবে না গাড়ি। লাফিয়ে নেমে রেল লাইনের দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। মুসা রয়েছে সবার আগে। কানে এল ট্রেনের শব্দ। কিশোরের অনুমান ঠিক। মালগাড়িই আসছে।

'দেরি করে ফেলেছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'ধরতে পারব কিনা জানি না!'

'ওই তো বগিটা!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'মুসা, ওই যে, নাম্বার ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ ফোর!'

মুসা আগেই দেখেছে। ওর বেশ খানিকটা দূর দিয়ে চলে গেল বগিটা। খুলে গেল বক্সকারের স্লাইডিং ডোর। বেরিয়ে আসতে লাগল লোহার তৈরি বড় একটা আঁকশির মত জিনিস।

'কিশোর!' পাশে থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ওই যে লোকটা!'

লাইনের ডান পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল ওকে। মুখ অন্যদিকে ফেরানো। চেনা গেল না। ট্রেনের পাশে পাশে ছুটল। নিখুঁত টাইমিং। আঁকশিটা পুরোপুরি যখন বেরোল, ঠিক সেই সময় সে-ও পৌঁছে গেল জায়গামত। হাত বাড়িয়ে আঁকশির মাথা ধরে ঝুলে পড়ল। এরপর আর কিছু করতে হলো না তার। আঁকশিতে ঝুলিয়ে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। মুসা সবার আগে থাকলেও কিছুই করতে পারল না।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ট্রেন ছুটছে।

'নিশ্চয় ওই লোকটাই টম!' কিশোর বলল।

কিশোর ও রবিন লাইনের কিনারে মুসার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে শেষ

বগিটাও পার হয়ে গেল। হাত নেড়ে চেঁচাতে শুরু করল তিনজনে। ওদের ডাক গার্ডের কানে পৌঁছল না বোধহয়। বেরোতে দেখা গেল না কাউকে।

কয়েক মিনিট পর ওয়ারডেন এসে হাজির হলেন। তাঁর পিছনে পুলিশ-কারের ড্রাইভার।

লোকটা কীভাবে পালিয়েছে, খুলে বলল কিশোর।

'টমই ও,' শুনে বললেন ওয়ারডেন। 'গাড়িতে ফোন আছে আমার। পরের স্টেশনগুলোকে সতর্ক করে দিতে হবে। ট্রেন থামিয়ে চেক করবে ওরা।'

সবাইকে নিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এলেন তিনি। জেলখানায় ফোন করে টেলিফোন অপারেটরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। একটুও দেরি না করে ঘটনাটার কথা রেলকর্তৃপক্ষকে জানাতে বললেন।

ফিরে চলল গাড়ি।

অফিসে ঢুকেই আগে খবর জানতে চাইলেন ওয়ারডেন।

খবর হতাশাজনক। টম যেখানে উঠেছে, তার মাইল দশেক পরেই ট্রেন থামিয়েছে রেল পুলিশ। ১১২৩৫৪ নম্বর কামরার ভিতরে কাউকে পাওয়া যায়নি।

কিশোরদের দিকে তাকালেন ওয়ারডেন। 'নিশ্চয় তোমাদের দেখে ফেলেছিল টম ও তার দোস্তরা, তাই পরের স্টেশন আসার আগেই নেমে পড়েছে কোথাও। যাবে কোথায়? ধরা ওদের পড়তেই হবে। ডেলমোর থেকে পালিয়ে বেশিদিন বাঁচতে পারে না কেউ।'

আরও কিছুক্ষণ ওয়ারডেনের অফিসে বসে রইল ছেলেরা। নতুন কোন খবর আসে কিনা জানার জন্য। এল না। হ্যারিসন কোম্পানির ট্রাক ড্রাইভারের বিরুদ্ধে কোন তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় তাকেও ছেড়ে দিতে হলো।

রকি বিচে ফিরেই সোজা গিয়ে মিস্টার সাইমনের সঙ্গে দেখা করল তিন গোয়েন্দা।

তিন

'আবার পুরানো খেলায় মেতেছে টম ফেরেনটি।' মিস্টার সাইমন বললেন। চুপ করে রইলেন এক মুহূর্ত। 'মনে হচ্ছে আমার কেসটার সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক আছে। পর পর অনেকগুলো ট্রেন ডাকাতি হয়েছে এই অঞ্চলে, সেগুলোর তদন্ত করতে অনুরোধ করা হয়েছে আমাকে।'

'কারা করেছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'লস অ্যাঞ্জেলেস রেইলরোড লিগ, রেলপথ কার্যনির্বাহীদের একটা গ্রুপ। ডাকাতেরা অনেক ক্ষতি করেছে ওদের, অনেক টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। ওদের বিশ্বাস, সব একটা বিশেষ দলেরই কাজ।'

কীভাবে ডাকাতিগুলো হয়েছে, বলতে গিয়ে মিস্টার সাইমন বললেন, 'সাধারণত দুটো কৌশল করে থাকে ওরা। একটা কৌশল হলো, কোনও একটা দুর্বল পয়েন্টে রোডব্লক সৃষ্টি করে। পাহাড়ের মোড় কিংবা বাঁকের ওপাশে বড় বড় গাছ ফেলে রাখে লাইনের ওপর, এমন জায়গায়, চোখে পড়ে না ড্রাইভারের। যখন পড়ে তখন আর হুঁশিয়ার হওয়ার সময় থাকে না। গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়। মালামাল লুটে নেয় ডাকাতেরা। অনেক সময় লাইনও তুলে ফেলে ওরা। দুর্ঘটনায় পড়ে ট্রেন।

'আর দ্বিতীয় কৌশলটা, রেডিওতে মিথ্যে মেসেজ পাঠানো। এতই দক্ষতার সঙ্গে কাজটা করে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে না ট্রেনচালক বা তার সহকারীর। মেসেজে নির্দেশ দেয়, মালভর্তি এক বা একাধিক বগি কিংবা বক্সকার খুলে রেখে যেতে, নিশ্চয় কোনও অখ্যাত স্টেশনে রেখে যায় ড্রাইভার; ডাকাতেরা তখন সুযোগমত ভিতরের মাল বের করে নিয়ে যায়।'

'নিশ্চয় রেলের কোনও অসৎ কর্মচারী এতে জড়িত,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, থাকতে পারে,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সাইমন।

'আচ্ছা, মিস্টার সাইমন, টোয়েন্টি ওয়াইল্ডক্যাট কি কোনও ধরনের সঙ্কেত? কী মনে হয় আপনার?' মুসার প্রশ্ন।

চুপ করে শুনছিল কিশোর। জবাবটা সে-ই দিল, 'হয়তো ওখানে কোথাও হেডকোয়ার্টার করেছে ডাকাতেরা। ডাকাতির মাল লুকিয়েছে। কুপার সারের আঙ্কেল যেখানটায় মূল্যবান ফসিল পেয়েছেন।'

'অসম্ভব নয়,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সাইমন। 'সেজন্যেই ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না কাউকে। মিস্টার কুপারকে যেতেই দেয়নি, ভাগিয়ে দিয়েছে। ওয়াল্ট পারকিনসের নকশা চুরিরও পরিকল্পনা করেছে কিনা ওরা, কে জানে।'

আরও আধঘণ্টা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। তারপর মিস্টার সাইমন বললেন, 'জরুরী কিছু কাগজপত্র রেডি করতে হবে। সেগুলো নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে যাব। খুব সকালে রওনা হব, এগারোটার মধ্যে যাতে লিগের লোকের সঙ্গে মিটিঙে বসতে পারি।'

দুই সহকারীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল কিশোর। কেসটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাড়িতে ফোন করে দিল মুসা ও রবিন, কিশোরদের বাড়িতে থাকবে। শুতে যাবে ওরা, এই সময় বাজল টেলিফোন।

ফোন ধরল কিশোর। 'হ্যালো?'

'কে, কিশোর?' উত্তেজিত মহিলাকণ্ঠ ভেসে এল। 'আমি মিসেস কুপার। সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে আমাদের বাড়িতে। পুলিশকে জানিয়েছি। ভাবলাম তোমাকেও জানানো দরকার।'

'কী হয়েছে?' সতর্ক হয়ে গেল কিশোর।

'মুখোশপরা দুজন লোক জোর করে বাড়িতে ঢুকে আমার স্বামীকে মারধর করেছে। সে এখন বেহুঁশ।'

পাঁচ মিনিটেই তৈরি হয়ে এসে গাড়িতে উঠল তিন গোয়েন্দা। কুপারের বাড়ির দিকে ছুটল ওদের গাড়ি।

'কতটা জখম হয়েছে কে জানে!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর। কুপারদের বাড়িতে এসে দেখল পুলিশ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ওপরে উঠল তিনজনে। দরজায় দাঁড়ানো পুলিশ অফিসার পল নিউম্যান ওদের পরিচিত।

'জানতাম তোমরা আসবে,' হেসে বলল পল। 'মিস্টার সাইমন কোথায়?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে গেছেন,' বলে কুপারের অবস্থা কেমন জানতে চাইল কিশোর।

'না, তেমন খারাপ কিছু না,' পল জানাল। তিন গোয়েন্দাকে ঘরে ঢোকার ইশারা করে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে সোফায় বসে আছেন কুপার। পাশে তাঁর স্ত্রী। খোঁজখবর নিচ্ছেন একজন সার্জেন্ট।

দুই গোয়েন্দাকে দেখে খুশি হলেন কুপার। সার্জেন্টের প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম আমি আর আইলিন। ফিরে এসে আমি আগে উঠলাম দোতলায়। হঠাৎ চিৎকার শুনে দৌড়ে নীচে নেমে দেখি, মুখোশপরা একটা লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে আইলিন। ওর হাত বাঁধার চেষ্টা করছে লোকটা। আরেকজনের হাতে পিস্তল। আমাকে দেখে ধমকে উঠে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলল। দাঁড়ালাম। তারপরই মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল, বোধহয় পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরেছিল। আর কিছু মনে নেই।'

মিসেস কুপার বললেন, 'আমার স্বামীকে বেহুঁশ করে, আমাকে বেঁধে, সারা বাড়িটা তছনছ করে ফেলল ওরা। মনে হয় কিছু খুঁজছিল। ঘণ্টাখানেক পর নড়েচড়ে উঠল হেনরি। আমিও বাঁধন প্রায় খুলে ফেলেছি। তবে ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে ওরা।'

কুপারকে জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট, 'কিছু খোয়া গেছে?'

'তেমন কিছু না। শুধু একটা ম্যাপ, তা-ও অসমাপ্ত। অন্য আরেকটা ম্যাপ দেখে এঁকেছিলাম ওটা।'

নিশ্চয় ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পের ম্যাপ! চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

'আসলটা নিতে পারেনি তো?' সার্জেন্টের প্রশ্ন।

'না। লুকিয়ে রেখেছি। পশ্চিম অঞ্চলের একটা বিশেষ জায়গার ম্যাপ... ওয়াইল্ড ক্যাট সোয়াম্পের কথা খুলে বললেন কুপার।

ইতিমধ্যে সারা বাড়িতে সূত্র খুঁজে ফিরে এল একজন পুলিশম্যান। ওপরে এসে অফিসারের কাছে রিপোর্ট করল, 'সার্জেন্ট, রান্নাঘরের পিছনের জানালায় আঙুলের ছাপ আছে। এ বাড়ির কারোরও হতে পারে।'

'আমাদের হওয়ার তো কথা নয়,' মিসেস কুপার বললেন। 'আজ সকালেই নীচতলার সমস্ত জানালা ধুয়েছি আমি।'

কার ছাপ জানা দরকার। আঙুলের ছাপের ছবি নিতে গেল পুলিশের বিশেষজ্ঞ টিম। মিস্টার কুপার আর তাঁর স্ত্রীর জবানবন্দি পুলিশবুকে লিখে নিতে লাগল সার্জেন্ট।

কাজ শেষ করে চলে গেল পুলিশ। রাতে ওখানেই থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দিল কিশোর। বলা যায় না, লোকগুলো আবার ফিরে আসতে পারে। সানন্দে রাজি হলেন মিসেস কুপার। কিন্তু মিস্টার কুপার বললেন, 'লাগবে না।'

তবুও জোর করেই দুই সহকারীকে নিয়ে থেকে গেল কিশোর। ফোন করে চাচীকে জানিয়ে দিল, রাতে বাড়ি ফিরবে না।

সারারাত পালা করে জেগে থেকে পাহারা দিল তিনজনে। কিন্তু লোকগুলো আর এল না।

সকালে নাস্তার টেবিলে বসে আলোচনা চলল আবার কুপার দম্পতির সঙ্গে। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে যাওয়ার কথা বাইরের কেউ জানে কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তা তো জানেই। গোপন তো আর রাখিনি!' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন শিক্ষক। কীভাবে খবরটা ছড়িয়েছে জানালেন তিনি, 'রকি বিচ টাইমসের এক রিপোর্টার এসে হাজির হয়েছিল। আর আমি গাধাও আগুপিছু কিন্তু চিন্তা না করে সাক্ষাৎকার দিয়ে দিয়েছি। পত্রিকায় লম্বা এক আর্টিকেল লিখেছে সে।'

'তাই নাকি? সর্বনাশ করেছেন, সার!' রবিন বলল। 'সোয়াম্পটা কোনখানে তা-ও লিখেছে নাকি পত্রিকায়?'

'না, এই একটা কথাই কেবল বলিনি ওকে। এদিক থেকে হয়তো বাঁচা গেল। তবে আমার চাচা যে ফসিল পেয়েছেন, নকশা এঁকে রেখে গেছেন, সব বলেছি। এমনকী সাইনবোর্ডটার কথাও বলে দিয়েছি...'

আলোচনায় বাধা দিল টেলিফোন। কুপার উঠে গিয়ে ধরলেন। ফিরে এলেন সন্তুষ্ট হয়ে। ছেলেদের জানালেন, 'আঙুলের ছাপ শনাক্ত করতে পেরেছে পুলিশ। বেন মানচিনির আঙুলের ছাপ।'

'হুঁ, শেলবির দোস্ত, যা ভেবেছিলাম!' কিশোর বলল। 'রেল ডাকাতদের সঙ্গে ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পের সম্পর্ক আছে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই।' রেল ডাকাতদের কথা সব খুলে বলল সে।

'ওদেরই কেউ পত্রিকার ফিচারটা দেখে ফেলল না তো?' মুসার প্রশ্ন।

'দেখতেও পারে। তবে ফসিল নিয়ে ওদের কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। নিশ্চয় অন্য কোন কারণ। হয়তো ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে ওদের গোপন আস্তানাই ওদের মাথাব্যথার কারণ।'

'দেখো,' স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন মিসেস কুপার, 'আমার এসব ভাল লাগছে না। ডাকাতের আড্ডার কাছে না গেলেই কি নয়? এ বাড়ির ওপর নজর রেখেছে ওরা। তোমাদের পিছু নেবে জানা কথা।'

'কয়েকটা ডাকাতের ভয়ে এমন একটা দুর্লভ ফসিল খোঁজা বন্ধ করে দেব?'

মিস্টার কুপার বললেন। 'কিছুতেই না।'

তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে কিশোর বলল, 'ব্যাপারটা আমাদের কাছেও এখন একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' গাড়িতে না গিয়ে প্লেনে যাওয়ার প্রস্তাব দিল সে; তার ধারণা, তাতে ডাকাতেরা নজর রাখলেও অনুসরণ করতে পারবে না। বলল, 'ওদেরকে বোকা বানানোর জন্যে প্রথমে অন্য কোথাও গিয়েও উঠতে পারি আমরা। যাতে আমাদের পিছু নেয়া বাদ দেয়।'

প্রস্তাবটা মুসা, রবিন আর কুপারের কাছেও গ্রহণযোগ্য মনে হলো।

'মন্দ বলনি,' কুপার বললেন। 'গ্রীন স্যান্ড লেকে চলে যেতে পারি আমরা। ফসিলের বিখ্যাত স্পট ওটা, অনেকেই ওখানে খুঁজতে যায়। আমরা গেলেও কেউ সন্দেহ করবে না। আর এখান থেকে তো মাত্র তিনশো মাইল। ওখানে এক দিন কাটিয়ে ট্রেনে করে ফিরে আসব রেড বিউটে, তারপর ঘোড়ায় চড়ে ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প।'

'তারমানে এখন একটা প্লেন জোগাড় করতে হবে। কোন ব্যাপারই না।' নাস্তা সেরে পটারকে ফোন করতে গেল কিশোর।

মিস্টার সাইমনের একটা প্রাইভেট প্লেন আছে। ওটার পাইলট হ্যারি পটার। রহস্য সমাধানের কাজে বহুবার তিন গোয়েন্দাকে সহায়তা করেছে।

পাওয়া গেল পটারকে। কিশোর বলতেই রাজি হয়ে গেল সে।

আপাতত আর কোন কাজ নেই কুপারদের ওখানে। বেরিয়ে এসে যার যার বাড়ি রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

পরদিন সকালে কিশোরকে ফোন করে দুঃসংবাদটা দিল মুসা ওর মায়ের কোন এক আত্মীয় মারা গেছেন। মা'র সঙ্গে ওখানে যেতেই হবে। কিশোরদের সঙ্গে যেতে না পারার দুঃখে প্রায় কথাই বলতে পারছে না বেচারা।

'ঠিক আছে, যাও,' সান্ত্বনা দিল কিশোর। 'ফিরে আসার পর পারলে একাই রওনা হয়ে যেয়ো। কিংবা প্রয়োজন পড়লে আমি তোমাকে খবর দেব।'

এয়ারপোর্টে এসে কিশোর ও রবিন দেখে, প্লেন নিয়ে অপেক্ষা করছে হ্যারি পটার। বয়েস তিরিশের কোঠায়। ছয় ফুট লম্বা। চওড়া কাঁধ।

মিস্টার কুপারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। বার বার গেটের দিকে তাকাচ্ছে কিশোর। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'আবার কোনও বিপদে পড়লেন না তো! একটা ফোন করা দরকার...'

পা বাড়াতে যাবে কিশোর, ঠিক এই সময় এসে হাজির হলেন কুপার।

প্লেনে উঠল সবাই। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল পটার।

চার

শহর থেকে দূরে রুক্ষ, নির্জন জায়গায় গ্রীন স্যান্ড এয়ারপোর্ট। কিশোরদের নামিয়ে দিয়েই চলে গেল পটার, তাড়া আছে।

ছোট্ট বিমানবন্দর। একই দালানে হ্যাঙার ও অফিস, আলাদা ব্যবস্থা নেই। সেদিকে তাকিয়ে কুপার বললেন, 'ফসিল এরিয়ায় কীভাবে যেতে হয় জিজ্ঞেস করে আসি।'

মালপত্রের কাছে পাহারায় রইল দুই গোয়েন্দা। কুপার চলে গেলেন অফিসের দিকে। কিছুক্ষণ পর ইঞ্জিনের শব্দে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'ওই যে, আরেকটা প্লেন আসছে।'

বিমান বন্দরের ওপরে এসে চক্কর দিতে লাগল ছোট একটা বিমান। নামছে ধীরে ধীরে। রানওয়ে ছুঁল চাকা। ছেলেদের সামনে দিয়েই ছুটে গেল প্লেনটা। খানিক দূরে গিয়ে থামল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে এল লম্বা একজন লোক। কালো চুল। ভুরু অস্বাভাবিক পাতলা, চোখ দুটো মনে হচ্ছে গর্তে বসা কালো দুটো মার্বেল। পাতলা মুখে খাড়া চোখা নাকটা যেন ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে।

'লোকটাকে সুবিধের লাগছে না,' নিচুকণ্ঠে বলল কিশোর। 'ওর হাঁটা দেখেছ?'

'অদ্ভুত! যেন সাপ,' রবিন বলল। 'পিছলে চলে যাচ্ছে। কে লোকটা?'

'কী জানি। চলো তো, প্লেনটাকে কাছে থেকে দেখি।'

লোকটা চলে গেল ছাউনির দিকে। ওর প্লেনের দিকে এগোল দুই গোয়েন্দা। কাছে এসে দেখার পর কিশোর বলল, 'আইডেনটিফিকেশন নম্বর মুছে গেছে।'

'কিংবা হয়তো মুছে ফেলা হয়েছে ইচ্ছে করেই। কাউলিঙের ছবিটা দেখো?'

'সাপ!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'পাখি ধরে খাচ্ছে। অদ্ভুত ছবি। লোকটার সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছি আমি।'

'কীসের মিল? সাপের?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

এগিয়ে এল একটা ফুয়েল ট্রাক। আরও কাছে এলে দেখা গেল, ড্রাইভারের পাশে বসে আছে লম্বা লোকটা। ট্রাকটা নিয়ে এসেছে তেল ভরার জন্য। কাছে এসে ট্রাকটা থামলে নেমে এল সে। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে ঘুরঘুর করছ কেন? কী দেখো?'

'আপনার প্লেনটা,' কিশোর বলল। 'নম্বর ছাড়া ওড়াচ্ছেন কী করে? কেউ ধরে না?'

'সেটা তুমি জিজ্ঞেস করার কে?' কড়া গলায় ধমকে উঠল লোকটা। তারপর বোধহয় ভাবল, ছেলেটা পুলিশকে জানাতে পারে, তাই কিছুটা নরম হয়ে বলল, 'ফিরে গিয়ে নতুন রঙ করব। সে-জন্যই ঘষে রঙ তুলে ফেলা হচ্ছে। নম্বর মুছে গেছে।' ট্রাক ড্রাইভারের দিকে ফিরে বলল, 'এই, একটা ট্যাক্সি জোগাড় করে দিয়ো তো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ড্রাইভার। তেল ভরা শেষ করে ট্রাকে উঠল। তার পাশে উঠে বসল আবার লম্বা লোকটা। চলে গেল ট্রাক।

এই সময় পুরানো মডেলের একটা গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন কুপার। তাতে মালপত্র তোলা হলো। রওনা হলো ট্যাক্সি। বিশ মিনিটেই পৌঁছে গেল ফসিল এরিয়ায়।

'মাটি এমন কেন?' কিশোর বলল। 'কেমন যেন সবুজ সবুজ।'

হাসলেন কুপার। 'ফসিল খুঁজতে এসেছ, আরও কত মজার মজার জিনিস দেখবে। নিশ্চয় জানো, ফসিল খুঁড়ে যারা বের করে তাদের বলে প্যালিওনটোলজিস্ট; কিংবা বলা যায় অতীতের গোয়েন্দা। হারিয়ে যাওয়া অতীতকে টেনে বের করে আনে অন্ধকারের গহ্বর থেকে। তাদের সূত্র ওই প্রাচীন হাড়গোড়। হাড় দেখেই বলে দিতে পারে তারা, প্রাণীগুলো যখন জীবিত ছিল তখনকার পৃথিবীর আবহাওয়া কেমন ছিল, পরিবেশ কী রকম, জায়গাটায় ডাঙা ছিল, নাকি সাগর। এই যেমন, আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এক সময় এখানে সাগর ছিল।'

'ডাঙার এত ভিতরে?' রবিন অবাক।

'আগে আরও ভিতরে ছিল। এই সবুজ মাটিই তার লক্ষণ। ব্র্যাকিওপডরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরে নিশ্চয় পুবে সরে গিয়েছিল সাগর।'

প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী নিয়ে কথা হলো আরও কিছুক্ষণ; তারপর আলোচনা মোড় নিল অন্যদিকে। কুপার জিজ্ঞেস করলেন, 'তা কী মনে হয়? কেউ কি আমাদের পিছু নিয়েছে?'

'মনে হয় নিয়েছে। এয়ারপোর্টে ওই যে প্লেনটা দেখেছি, তার পাইলট,' কিশোর বলল।

'লম্বা লোকটা?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'একটা ফাঁদ পাততে পারি আমরা। তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'কীভাবে?' কুপার জানতে চাইলেন।

'আপনার ব্রিফকেসটা। ম্যাপ চুরি করার মতলব যদি কারও থেকে থাকে, প্রথমেই তার চোখ পড়বে ওটার ওপর। কেসটা গাড়িতে ফেলে চলে যাব আমরা। কিছুদূর গিয়ে ঘুরে এসে লুকিয়ে বসে চোখ রাখব।' নিজের ব্যাগ থেকে ছোট একটা প্লাস্টিকের শিশি বের করে দেখাল সে। 'ব্রিফকেসের ডালায় এই পাউডার মাখিয়ে রাখব।'

'এটা কী? জানতে চাইলেন কুপার।

'এক ধরনের ডাই পাউডার। ব্রিফকেসের রঙের সঙ্গে মিশে থাকবে। আঙুলে লাগলে কয়েক মিনিটের মধ্যে নীল দাগ পড়ে যাবে। সহজে উঠবে না আর।'

'ভাল বুদ্ধি,' হেসে বলল রবিন। 'বমাল ধরতে না পারলেও নীল আঙুল দেখে তখন চিনতে পারব ওকে।'

দ্রুত ফাঁদ পাতা হলো। এমন জায়গায় এনে রাখা হলো গাড়িটাকে, যাতে সহজেই চোখে পড়ে। তারপর শুকনো খাঁড়ি পেরিয়ে, বড় বড় কয়েকটা পাথরের চাঙড়ের পাশ কাটিয়ে, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পাহাড় চূড়ার দিকে এগোল ওরা।

কিন্তু চূড়ায় পৌছার আগেই বাধা এল। ডাক দিল ভারি একটা কণ্ঠ, 'এই! এই যে, শোনো।'

থেমে ঘুরে তাকাল ওরা।

ইউনিফর্ম পরা পুলিশম্যান, ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'তোমাদের দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। নজর রেখেছিলাম। তোমাদের আচরণ ফসিল শিকারিদের মত নয়। রোজ এদিকে ডিউটি থাকে আমার, "প্রফেসর" পাহারা দেয়ার জন্য। প্রায়ই হারিয়ে যায় ওরা। বেখেয়াল, আত্মভোলা। ওদের আমার চেনা হয়ে গেছে। দেখলেই এখন চিনতে পারি। তোমরা তাদের মত নও। ফসিল খোঁজার সরঞ্জামও তো দেখছি না সাথে।'

চোর লেগেছে পিছে, পুলিশম্যানকে জানালেন কুপার। কীভাবে ফাঁদ পেতে রেখে এসেছেন, তা-ও বললেন। তারপর বললেন, 'আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?'

আগ্রহী মনে হলো লোকটাকে। 'হুঁম্! ভালই তো লাগছে শুনে। একঘেয়ে কাজ এখানকার, কোন উত্তেজনা নেই। ঠিক আছে, যাব।'

নিচু পাহাড়টার চূড়ায় উঠে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসল চারজনে। চোখ রাখল গাড়িটার ওপর।

কিন্তু বসে থাকাই সার হলো। চোর আর এল না।

পাঁচ

হোটেলে ফিরে এল ওরা। খেতে খেতে আলোচনা চলল।

'এবার তাহলে সোজা ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প, নাকি?' রবিনের প্রশ্ন। 'মনে হয় কেউ পিছু নেয়নি আমাদের। লম্বা লোকটাকে অযথাই সন্দেহ করেছি।'

'আমার তা মনে হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'একবার ধরা দেয়নি ফাঁদে, তাতে কী? সময় হলেই আবার দেখা পাব তার।'

'এখান থেকে রেড বিউটের ট্রেন ধরব আমরা,' কুপার বললেন। 'কাল সকাল নাগাদ পৌঁছব ওখানে। তারপর ঘোড়া, জিনিসপত্র যা দরকার রেড বিউট থেকেই কিনে নেব।'

খুব সকালে রেড বিউটে পৌঁছল ট্রেন। হোটেলে উঠল ওরা।

লোকজন বোধহয় খুব একটা আসে না, ওদেরকে স্বাগত জানানোর বহর দেখেই বোঝা গেল। ক্লার্কের গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'নাস্তা লাগবে না?'

নাস্তা সেরে, সঙ্গের মালপত্র হোটেলে রেখে ফসিল খোঁড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বেরোল তিনজনে।

একটা জেনারেল স্টোরেই পাওয়া গেল সব। কথায় কথায় সেলসম্যান জেনে নিল, ওরা কোন অঞ্চলে যাচ্ছে, কী কাজে। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পটা ঠিক কোথায়, বলতে পারল না। কুপারকে বলল, 'তবে যেদিকে যাচ্ছেন আপনারা, খুব খারাপ জায়গা। এই তো, গত হপ্তায়ই একজন ট্র্যাপারকে আক্রমণ করেছিল একটা কুগার। পিস্তল নিয়ে যেতে ভুলবেন না।'

'পারমিট লাগবে না?'

'না। এখানে পিস্তলের পারমিট লাগে না।'

'দিন তাহলে তিনটা। এখনই কিনে নিই।'

দোকানের বাইরে ঘোড়ার আস্তাবল। সেখানে ওদেরকে নিয়ে এল লোকটা। তিনটে চমৎকার ঘোড়া, আর মাল বহন করার জন্য একটা খচ্চর ভাড়া করল ওরা।

দুপুরের আগেই খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আগে আগে চললেন কুপার, তাঁর পাশে রবিন। পিছনে খচ্চরের দড়ি ধরে এগোল কিশোর।

'কুগার সাহেবরা, আমরা আসছি,' রেড বিউটের মেইন রোড থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের রুক্ষ অঞ্চলে নামার সময় রসিকতা করল রবিন।

'মিস্টার পারকিনসের ম্যাপ বলছে পুরো পঁচিশ মাইল যেতে হবে আমাদের। পথটা খুবই খারাপ,' ভয় দেখালেন যেন কুপার। কিংবা নিজেই শঙ্কিত।

কিছুক্ষণ পর সরু একটা খালের ধারে পৌঁছল ওরা। ঊষর মাটির বুক চিরে বইছে টলটলে পানি। আশপাশে শুধু পাথর আর পাথর। মাথার ওপরে আগুন ঢালছে সূর্য, ঘাড়ের চামড়া পুড়ে যাওয়ার জোগাড়।

ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখলেন কুপার। 'কাল সকালের আগে এখানে পৌঁছতে পারব না। এই যে, ছোট একটা পর্বত, বোধহয় একটা গিরিখাদ আছে। আর এই যে, বড় একটা গাছ।'

'বড় গাছ এখন পেলে ভাল হত,' ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে বলল রবিন। শার্ট ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। 'ছায়ায় বসে জিরানো যেত, খাওয়াটাও সেরে নিতে পারতাম।'

গাছের আশায় এদিক ওদিক তাকাল সে। কোন গাছ চোখে পড়ল না।

যতদূর চোখ যায়, লালচে ঝোপ, মাটি আর পাথর। দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যায় চোখ।

গাছ না পেয়ে বড় একটা পাথরের ছায়ায় বসে দুপুরের খাওয়া সারল ওরা।

রাস্তা এত খারাপ, গতি খুব ধীর। শেষ বিকেলে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা জায়গায় এসে পৌঁছল ওরা। দু'চারটা গাছও রয়েছে এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। স্নায়ু ভীষণ উত্তেজিত। সামান্য শব্দেও চমকে চমকে উঠছে।

কয়োটের ডাক শুনে অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বিড়বিড় করল রবিন, 'কী বিশ্রী ডাক! এই জন্যেই বোধহয় কয়োটকে প্রেয়ারির ভূত বলে।'

'আজ আর বড়জোর দু'মাইল এগোতে পারব,' কুপার বললেন। 'তারপর থামতে হবে। অন্ধকার হয়ে যাবে ততক্ষণে।'

গোধূলির আলোও যখন অস্পষ্ট হয়ে এল, অন্ধকারে ঢেকে গেল চরাচর, তখন থামল ওরা। স্লিপিং ব্যাগগুলো খুলে শোয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন কুপার। কিশোর জানোয়ারগুলোকে খাবার দিতে ব্যস্ত। রবিন বসল রান্না করতে।

খাবার খাওয়ানো হলে কাছের একটা ঝর্না থেকে জানোয়ারগুলোকে পানি খাইয়ে আনল কিশোর। শক্ত করে বাঁধল গাছের সঙ্গে। তারপর নিজেরাও খেতে বসল। নিভু নিভু হয়ে এল অগ্নিকুণ্ড। তাতে নতুন কাঠ ফেলে আগুনটা উস্কে দিল সে। 'যাক, আজ রাতের মত কাজ শেষ। এখন বৃষ্টি না এলেই বাঁচি।'

'সম্ভাবনা কম,' কুপার বললেন। 'তারা দেখেছ, কী উজ্জ্বল? শহরে এমন দেখা যায় না।'

'হ্যাঁ, আলোও বেশি, ইচ্ছে করলেই আবার বেরিয়ে পড়া যায়,' একমত হলো কিশোর। 'কিন্তু ওটা কীসের আলো? ওই যে, বাঁয়ে?'

তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। তাকিয়ে আছে দূরের আলোর দিকে।

'নিশ্চয় কেউ ক্যাম্প করেছে ওখানে,' রবিন বলল। 'ফেরেনটি আর বেন হলে অবাক হব না।'

'চলো না দেখে আসি?' কৌতূহল জিইয়ে রাখতে রাজি নয় কিশোর।

আগুন নিভিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় জিন পরাতে বেশিক্ষণ লাগল না। অন্ধকারে এগিয়ে চলল ওরা, প্রায় নিঃশব্দে।

'ঠিকই বলেছ,' কিছুদূর এগিয়ে রবিন বলল, 'ক্যাম্পই।'

অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে পাঁচ-ছয়জন লোক। ঘোড়াও আছে অনেকগুলো।'

স্বজাতির গন্ধ পেয়েই যেন আর চুপ থাকতে পারল না রবিনের ঘোড়াটা। জোরে ডেকে উঠল। চোখের পলকে উঠে দাঁড়াল লোকগুলো, হুড়াহুড়ি করে গিয়ে যার যার ঘোড়ায় উঠে পড়ল। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

পিছু নিতে চাইল রবিন, কিন্তু বারণ করলেন কুপার। অচেনা জায়গা। রাতের বেলা অপরিচিত লোকের পিছু নেয়াটা মোটেও উচিত হবে না।

কাছে এসে আগুনের চারপাশে ভালমত খুঁজে দেখল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু

পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

'একজন লোক অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে চলে গেছে, খেয়াল করেছ?' কিশোর বলল। 'সে একদিকে গেল, বাকি লোকগুলো আরেক দিকে।'

যে লোকটা একলা গেছে, তার ঘোড়ার খুরের ছাপ খুঁজে বের করল কিশোর। টর্চের আলোয় দেখতে দেখতে আনমনে বলল, 'পনি ঘোড়া। পায়ের ছাপ তেমন গভীর নয়। তারমানে আরোহীর ওজন বেশি না।'

'বেন মানচিনি না তো?' বিড়বিড় করল রবিন।

রবিনের দিকে ঘুরে তাকাল কিশোর। 'হলে অবাক হব না। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে বোধহয় এদিক দিয়েই যেতে হয়।'

'হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের,' কুপার বললেন। 'লোকটা বেন হয়ে থাকলে, আমাদের পিছুই নিয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। আমাদের আসার খবর জানে সে।'

নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। যেখানে যা যেভাবে রেখে গিয়েছিল, সেভাবেই আছে। আবার আগুন জ্বালানো হলো। অনেক উত্তেজনা আর পরিশ্রম গেছে। তাই মনে দুশ্চিন্তা থাকা সত্ত্বেও স্লিপিং ব্যাগে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

পরদিন সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙল রবিনের। তাড়াতাড়ি উঠে নাস্তা তৈরি করতে বসল।

নাস্তা সেরে রহস্যময় ক্যাম্পটা আরেকবার দেখতে চলল ওরা। কিন্তু নতুন কিছু আর চোখে পড়ল না সেখানে। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে রওনা হয়ে গেল তিনজন।

শুরু হলো বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি। যেদিকে চোখ যায় শুধু ঘাস আর ঘাস। সকাল শেষ হওয়ার আগেই সমভূমি পেরিয়ে আবার পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করল ওরা।

'আর মাইলখানেক,' কুপার বললেন। 'আশা করি তারপরেই গাছটা পেয়ে যাব।'

তরাই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গেছে পথ। পাশে কোথাও পাহাড়ের সারি, কোথাও টুকরো জঙ্গল। ছোট একটা গিরিপথ পার হয়ে চওড়া উপত্যকায় বেরিয়ে এল ওরা। ওপাশে আরেকটা পাহাড়, তাতেও গিরিপথ। সেটা পার হলে দেখা গেল একটা নিচু জায়গা। সাদা বালি। দেখেই বোঝা যায়, হ্রদ ছিল এককালে। হয়তো এখনও বর্ষাকালে পানিতে ভরে যায় হ্রদটা।

আরও কিছুদূর এগোনোর পর কুপার বললেন, 'গাছটা কই? এতক্ষণে তো চোখে পড়ে যাওয়ার কথা। শুধুই তো পাইনের জটলা দেখছি।'

'ওটা কী?' হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'ওপাশে? কাটা গাছের গোড়া মনে হয় না?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া হাঁকাল রবিন। জিনিসটা কী দেখার জন্য। ম্যাপটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন কুপার কিশোরকে ডেকে নিয়ে।

একটু পরেই শোনা গেল রবিনের উত্তেজিত চিৎকার, 'কিশোর, দেখে যাও! জলদি!'

রবিনের কাছে ছুটে এল কিশোর, পিছনেই ওর গা ঘেঁষে রয়েছেন কুপার। একটা কাটা গাছের গোড়া, ততক্ষণে গোড়ায় লেগে থাকা ময়লা হাত দিয়ে ডলে সাফ করে ফেলেছে রবিন। বলল, 'কাদা লেপে রেখেছিল। অনেক আগে কাটা হয়েছে বোঝানোর জন্যে।'

'কিন্তু গাছটা ফেলল কোথায়?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন কুপার।

আগে চোখে পড়ল কিশোরের। 'ওই তো পড়ে আছে।'

একটা খাদের মধ্যে এমনভাবে ফেলে রাখা হয়েছে গাছটা, বিশেষ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ভালমত না তাকালে চোখে পড়ে না।

খাদের পাড়ে এসে দাঁড়াল তিনজনে।

'কাল রাতে যাদের দেখেছি,' কিশোর বলল, 'হয়তো তারাই কেটেছে।' কুপারের দিকে তাকাল সে। 'চুরি যাওয়া নকল ম্যাপটায় গাছটার চিহ্নটা দিয়েছিলেন নাকি?'

'দিয়েছিলাম।'

নীচের ঠোঁটে ঘন ঘন দু'তিনবার চিমটি কাটল কিশোর। তারপর মাথা দোলাল, 'তাহলে আমি শিওর, শেলবিরা পৌঁছে গেছে এখানে। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে যাবার বড় একটা চিহ্ন ছিল এই গাছ, সে-জন্যেই কেটে ফেলেছে।'

ম্যাপের নির্দেশমত আবার এগোনোর পালা। দুপুরের আগেই পৌঁছল একটা ঝর্নার পাড়ে। খাওয়া আর বিশ্রাম সেরে আবার ঘোড়ায় চাপল।

বিকেলের কড়া রোদে পথ চলতে চলতে কৌতূহলী চোখে দেখছে ওরা বিচিত্র প্রকৃতি। আধুনিক পৃথিবী থেকে একলাফে যেন লক্ষ লক্ষ বছর পিছিয়ে চলে এসেছে। পাথর, মাটি, গাছপালা সবই যেন সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর। এখুনি যেন গর্জন করে বেরিয়ে আসবে বিশাল দাঁতওয়ালা রোমশ ম্যামথ হাতি কিংবা দাঁতাল বাঘ।

দাঁতাল বাঘ না বেরোলেও খানিক পরেই বেরোল তার বর্তমান প্রজাতি। পূর্বপুরুষের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়।

গভীর একটা গিরিখাতের ভিতর দিয়ে চলেছে ওরা। একধারে ঘন বন। পথটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ঢালের নীচে পথের একধারে এক টুকরো ঘাসবন। তাতে লম্বা লম্বা ঘাস। আরেক পাশে একটা পাহাড়ী নদী।

নদীর কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। জানোয়ারগুলোকে ছেড়ে দিল পানি খাওয়ার জন্য। ঘাসের কিনারে তিনজনেই হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল বিশ্রাম নিতে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'কিশোর, সরো সরো!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। একটু আগে যেখান থেকে নেমে এসেছে ওরা, সেই পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে বিশাল এক

জানোয়ার। পিঙ্গল শরীর। আফ্রিকান সিংহীর মতই চেহারা অনেকটা, তবে আকারে কিছুটা ছোট। পার্বত্য সিংহ। স্থানীয় নাম কুগার।

ওদেরকে লক্ষ্য করে লাফ দিল জানোয়ারটা।

ছয়

কিশোর ঝাঁপ দিল ঘাসবনের দিকে। রবিন তার উল্টো দিকে। আর কুপার গিয়ে নামলেন পানিতে।

কুগারটা এসে নামল মুহূর্ত আগে তিনি যেখানে ছিলেন, ঠিক সেইখানে। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে হিংস্র গর্জন করে উঠল। রক্ত পানি করা তীক্ষ্ণ চিৎকার।

চিৎকারের রেশ মিলাতে না মিলাতেই গর্জে উঠল পিস্তল। পর পর দু'বার।

কিশোরের ওপর ঝাঁপ দেয়ার জন্য ঘুরেছিল কুগার, পড়ে গেল কাত হয়ে। থাবা দিয়ে মাটি খামচাতে শুরু করল। কোমর ভেঙে গেছে, এগোতে পারছে না।

জানোয়ারটার কপাল সই করে আরেকবার গুলি করল রবিন। নিথর হয়ে গেল কুগার।

পানি থেকে উঠে এলেন কুপার। শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'নাহ্, তোমাদেরকে ভাল সঙ্গী বলতেই হবে। রবিন সময়মত গুলিটা না করলে আজ গিয়েছিলাম আমি।'

ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছিল খচ্চর আর ঘোড়াগুলো। ডাক দিতেই কাছে চলে এল ওগুলো। তবে একটা ঘোড়াকে ধরতে বেশ বেগ পেতে হলো।

কুগারটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখেও ভয় যাচ্ছে না ওগুলোর। আতঙ্কিত ডাক ছাড়ছে। পা ঠুকছে মাটিতে। শেষে দুই গোয়েন্দা মিলে ঠেলেঠুলে মরা জানোয়ারটাকে একটা গর্তে ফেলে দেয়ার পর শান্ত হলো ওগুলো।

আবার ঘোড়ায় চেপে চলা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে রবিন বলল, 'এই চলার কি আর শেষ হবে না কোনদিন? শুধু পঁচিশ তো নয়, মনে হচ্ছে পঁচিশশো মাইল পেরোচ্ছি।'

গতি সত্যিই খুব ধীর। বিকেলের শেষে ক্যাম্প করার মত পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজে বের করল ওরা। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার নতুন উদ্যমে যাত্রা করল ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পের উদ্দেশে।

'ম্যাপের শেষ চিহ্ন হলো একটা টিলার মাথার আলগা গোল পাথর,' কুপার বললেন। 'পাহাড়ের গোড়ার উপত্যকা গিয়ে মিশেছে জলাভূমিতে। ওই উপত্যকারই কোথাও রয়েছে উটের ফসিল।'

মোড় নিল ওরা। নদীর ধার ধরে এগিয়েছে বহুক্ষণ। এখন নদীটা বেঁকে সরে

যেতে লাগল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

একটা গিরিসঙ্কটের মুখে এসে পৌঁছল ওরা।

'এসে গেছি!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন কুপার। 'ম্যাপ বলছে এই সরু পথটা পেরোলেই চোখে পড়বে টিলাটা।'

আগে আগে চলেছেন কুপার। মাঝে কিশোর। পিছনে খচ্চরের রশি ধরে টেনে নিয়ে এগোচ্ছে রবিন।

আবছা অন্ধকার গিরিসঙ্কটের বাইরে বেরিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার, 'ব্যস, এসে গেলাম!'

তাঁর পিছনে বেরোল ছেলেরা। দেখল ছড়ানো উপত্যকা। ডানে পাহাড়ের উঁচু চূড়া, ঢাল প্রায় নেই বললেই চলে, খাড়া দেয়াল। বাঁয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেছে উপত্যকা, যেন বিশাল সৈকত। তেমনি মিহি বালি। টিলাটাও দেখা গেল, মাথায় প্রকাণ্ড এক গোল পাথর।

'দেখেছ কিশোর!' রবিনের চোখে বিস্ময়। 'যেভাবে বসে আছে, ইচ্ছে করলেই ঠেলে ফেলে দেয়া যায়। গায়ে পড়লে একেবারে...'

হাত তুলে তাকে থামতে ইশারা করলেন কুপার। 'শুনছ!'

খটাখট খটাখট শব্দ। কোন সন্দেহ নেই, ঘোড়ার খুরের।

'লুকোতে হবে! জলদি!' রাশ ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফেলল কিশোর। আবার ঢুকে যেতে লাগল গিরিসঙ্কটে।

রবিনের পিছু নিয়ে কুপারও ছুটলেন।

গিরিসঙ্কটে ঢুকে ঘোড়া থামাল ওরা। ফিরে তাকাল পিছনে। কয়েক মিনিট পরে দেখল, ঢাল বেয়ে উপত্যকায় নেমেছে একজন ঘোড়সওয়ার।

একসঙ্গে চিৎকার করে উঠে ছুটে গেল তিনজনে, ঘিরে ফেলল ঘোড়াটাকে। অশ্বারোহী একটা ছেলে, বয়েস বড়জোর চোদ্দ। কিন্তু এমনভাবে জিনের ওপর বসে ঘোড়া সামলাচ্ছে, বোঝা যায় জাত ঘোড়সওয়ার।

'এই, কে তোমরা?' বড়দের ভঙ্গিতে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

নিজেদের পরিচয় দিলেন কুপার। জানালেন, ফসিল খুঁজতে এসেছেন।

'কিন্তু এটা আমাদের জায়গা,' ছেলেটা বলল। 'আমার মায়ের সম্পত্তি। খোঁড়ার অনুমতি কে দিল আপনাদের?'

'তোমার মা?'

'হ্যাঁ। মিসেস জোনস। আমি রিকি জোনস।'

'তাই নাকি?' কুপার বললেন, 'তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে দেখোগে, নিশ্চয় আমার আঙ্কেল ওয়াল্ট পারকিনসকে চিনবেন।'

'ওয়াল্ট পারকিনস আপনার আঙ্কেল? চিনি আমি। তাঁর সঙ্গে মা'র চুক্তি হয়েছিল, ফসিল বিক্রির সমস্ত টাকা মাকে দিয়ে দেবেন। সে-জন্যই খুঁড়তে দিতে রাজি হয়েছে মা।'

'ধরে নাও সেই চুক্তি এখনও বহাল আছে।'

'তাহলে তো কথাই নেই। মিস্টার পারকিনসকে খুব পছন্দ করতাম আমরা। ভাল লোক ছিলেন। হঠাৎ করে একদিন নিখোঁজ হয়ে গেলেন। অনেক খুঁজলাম, পেলাম না। তারপর একদিন খবর পেলাম অসুখে মারা গেছেন তিনি।'

'তাঁর অসমাপ্ত কাজটাই শেষ করতে এসেছি আমরা।'

ছেলেটাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল দুই গোয়েন্দা।

'তোমরা ছাড়া আর কে কে থাকে এই এলাকায়?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

হাসল রিকি। 'আমরা আর শেরিফ হ্যামারসন, আর কেউ না। তবে ইদানীং অচেনা লোকের আনাগোনা দেখছি। রাতের বেলা ক্যাম্পের আগুনও চোখে পড়ে। এই তো, কাল রাতেই দুজন ধরল আমাকে। এমন প্রশ্ন শুরু করল, যেন উকিলের জেরা। মোটেও ভাল লাগেনি আমার। ঘোড়া ছুটিয়ে পালালাম।'

'লোকগুলো দেখতে কেমন?' জানতে চাইল রবিন।

'দুজনেই বেশ বড়সড়। একটা তো রীতিমত দৈত্য, ইচ্ছে করলেই কুস্তিগীর হতে পারত। আরেকজনকে দেখে মনে হলো উকিল কিংবা ডাক্তার। উঁচুস্বরে কথা বলে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। রিকির বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে টম ফেরেনটি আর শেলবি কারমলের চেহারা।

'প্রথমবার কিছু বলিনি,' রিকি বলল। 'তবে আবার যদি আমাকে ধরতে আসে, সোজা গিয়ে ফরেস্ট রেঞ্জারদের বলে দেব।'

'ফরেস্ট রেঞ্জার আছে নাকি এদিকে?' জানতে চাইল রবিন।

'নিশ্চয় আছে। নিয়মিত টহল দেয় এই এলাকায়। আর এলে র‍্যাঞ্চে আমাদের সঙ্গে দেখা না করে যায় না।'

'ওখানে থাকে, না?' পর্বতের ওপরে ফায়ার টাওয়ারটা দেখাল কিশোর।

'না। ওটা অনেক পুরানো। এখন কেউ থাকে না। আরেকটা নতুন টাওয়ার আছে। দেখা যায় না এখান থেকে।'

কুপার বললেন, 'জানা থাকল।'

'হ্যাঁ। আর শেরিফ হ্যামারসনও কাছাকাছিই থাকেন। আমাদের বন্ধু।'

'রিকি,' কিশোর বলল, 'এই এলাকা তো তোমার চেনা। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পটা কোথায় বলতে পারো?'

'ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প?' ঠোঁট কামড়াল রিকি। 'কই, নামই তো শুনিনি।'

'শোননি?' হতাশ মনে হলো কুপারকে।

'না। ওই নামে কোন সোয়াম্প নেই এদিকে। এখানে যেটা আছে, সেটার নাম ডেভিল'স সোয়াম্প।'

আবার পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। ম্যাপে নাম ভুল করেনি তো?

'অনেক দেরি হয়ে গেল। বাড়ি ফেরা দরকার।' দুই গোয়েন্দার দিকে তাকাল। 'সময় পেলে আমাদের র‍্যাঞ্চে এসো। মা খুব খুশি হবে।'

'কোনদিকে তোমাদের বাড়ি?' কিশোর জানতে চাইল।

উত্তর-পশ্চিম কোণে হাত তুলল রিকি। 'পাহাড়ের বাঁ-দিক ঘেঁষে একটা পথ গেছে। ওটা ধরে গেলেই পেয়ে যাবে।' ঘোড়ার পিছনে চাপড় মারল সে। ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

'তাহলে এটা ডেভিল'স সোয়াম্প, ওয়াইল্ডক্যাট নয়,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল রবিন। 'এত পথ পাড়ি দিয়ে এলাম শুধু শুধু...'

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' হাত তুললেন কুপার। 'ম্যাপটা আরেকবার দেখি।'

নীরবে কয়েক মিনিট দেখলেন ম্যাপটা। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। 'হ্যাঁ, জায়গা এটাই। দুই জায়গার এত মিল থাকতে পারে না। লোককে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই জায়গাটার নাম ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প রেখেছেন পারকিনস।'

'শিওর হওয়ার একটাই উপায়,' কিশোর বলল, 'সাইনবোর্ডটা খুঁজে বের করা।'

'যদি ওটা থাকে এখনও। পরে খুঁজব। আগে ক্যাম্প করার জায়গা দেখি।'

চমৎকার একটা জায়গা পাওয়া গেল। গিরিসঙ্কটের মুখের ওপরে একটা শৈলশিরার ধারে, চত্বরের মত ছড়ানো এক টুকরো জায়গা, হালকা ঝোপঝাড় আছে। মালপত্র নামিয়ে ওখানেই তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত হলো ওরা। পাথরের অভাব নেই। কুড়িয়ে এনে ফায়ারপ্লেসও তৈরি করল। তারপর কিশোর ও রবিন চলল এলাকাটা ঘুরে দেখতে। ওদেরকে সাবধানে থাকতে বলে দিলেন কুপার।

সবুজ জলাভূমির কিনারে এসে দাঁড়াল ওরা। বাতাসে কাদার গন্ধ। সবুজ গুল্ম ও জলজ উদ্ভিদের ওপর বড় বড় ফড়িং উড়ছে। কালচে পানি, তেলতেলে।

জলাভূমির কাছ থেকে সরে এল ওরা। সাইনবোর্ড খুঁজতে শুরু করল। পাওয়া গেল সহজেই। একটা উইলো গাছে পেরেক লাগানো, আংশিক ঢেকে রয়েছে লতাপাতায়। পুরানো তক্তা, রোদে পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়। দু'হাতে লতাপাতা সরিয়ে দেখল রবিন। 'এটাই!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এই তো লেখা **হিয়ার লাই দা বডিষ অভ টোয়েন্টি ওয়াইল্ডক্যাট!**'

তাড়াহুড়ো করে ক্যাম্পে ফিরে এল দুজনে। খবর শুনে খুশি হলেন কুপার। বললেন, 'এবার কাজে লাগতে হয়।'

গাঁইতি শাবল বের করে মাটি খুঁড়তে চলল ওরা। ম্যাপ দেখে ঢালের গায়ে একটা জায়গা বাছলেন কুপার। 'এখান থেকেই শুরু করি।'

ওপরের আস্তর নরম, বালিমাটি। সহজেই সরিয়ে ফেলা গেল। কিন্তু নীচের মাটি খুব কঠিন, পাথরের মত।

গায়ের জোরে কোপ মারল কিশোর, কয়েক ইঞ্চির বেশি গাঁথল না গাঁইতি। কপালের ঘাম মুছে বলল, 'বাপরে, মাটি তো না, যেন সিমেন্টের ঢালাই।'

এক ঘণ্টা একনাগাড়ে মাটি কুপিয়ে গেল ওরা। তারপর ঠন করে কীসে যেন লাগল কুপারের বেলচা। টিনের একটা পাত্র। তুলে একবার দেখে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে কী মনে করে আবার তাকালেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তামাকের টিন!

বোনি ব্রায়ার। আঙ্কেলের পছন্দের ব্র্যান্ড।'

'তারমানে ঠিক জায়গাতেই কাজ করছি আমরা,' মাথা দোলাল কিশোর। 'তবে ওই ব্র্যান্ড শুধু আপনার আঙ্কেলেরই নয়, আরও অনেকের পছন্দ। অন্য কেউও ওটা ফেলে যেতে পারে।'

'তা পারে।' কিন্তু দমলেন না কুপার। নতুন উদ্যমে মাটিতে কোপ বসালেন।

কয়েক মিনিট পর রবিনের গাঁইতিতে ঠং করে লাগল কী যেন। সাংঘাতিক শক্ত কিছু। 'আঁউক!' করে উঠল সে।

'কী জানি। শক্ত কিছুতে লেগেছে।'

বেলচা দিয়ে মাটি পরিষ্কার করল রবিন। ধাতব একটা জিনিস দেখা গেল। ভারি কিছু। আস্তে আস্তে আশপাশের মাটি আরও খুঁড়ল সে। দেখা গেল মরচে ধরা একটা পাইপ।

'এটা এখানে এল কীভাবে?' কুপারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল কিশোর। 'আপনার আঙ্কেলের জিনিস?'

'কী জানি, হতে পারে!' মাথা চুলকালেন কুপার। 'তাঁর আগে এখানে অন্য কেউ খুঁড়ে গেছে বলেও তো শুনিনি।'

'তাহলে...'

কথা শেষ করতে পারল না কিশোর। পাহাড়ের ওপরে ধুপ করে ভারি শব্দ হলো। ফিরে তাকিয়ে চমকে গেল সে। চিৎকার করে উঠল, 'সরুন! সরুন জলদি!'

টিলার মাথার গোল পাথরটা খসে গেছে। গড়িয়ে নামছে ঢাল বেয়ে। সঙ্গে অসংখ্য ছোট-বড় পাথরের ঢল।

উপত্যকা বেয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঝপাং করে পানিতে পড়ল ওটা। ভাগ্যিস সময়মত সরে গিয়েছিল ওরা। নইলে গায়ের ওপর এসে পড়ত। ভর্তা বানিয়ে ফেলত একেবারে।

সাত

দৌড়ে ওপরে উঠল কিশোর ও রবিন। কাউকে চোখে পড়ল না।

'চলো ওপাশে গিয়ে দেখি,' রবিন বলল।

পাহাড়ের মাথার ওপরে উঠেই দেখতে পেল, বাঁয়ের পথ ধরে ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে দুটো ঘোড়া।

'দুজন!' চিৎকার করে বলল রবিন। অনেক দূরে চলে গেছে ঘোড়সওয়ারেরা। বুঝতে পারল, এখন ধাওয়া করে কোনও লাভ নেই, ধরা যাবে না।

নীচে নেমে এল আবার ওরা। পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছেন কুপার।

কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'ধাক্কা দিয়েই ফেলেছে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দুজন এসেছিল।'

'আর কি খুঁড়ব এখন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'নাহ্, এখন আর ভাল লাগছে না, কপালে হাত বোলালেন কুপার। 'বসো। জিরিয়ে নিই।'

রবিন বসল। কিশোর আবার ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল। পাথরটা যে পথে গড়িয়ে নেমেছে সে-পথ ধরে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল সে, 'রবিন, দেখে যাও!'

কী দেখল কিশোর! লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল রবিন। পিছনে ছুটলেন কুপার।

চলার পথে যত আলগা পাথর ছিল সব ঠেলে নিয়ে গেছে গোল পাথরটা। বড় একটা পাথর সরে যাওয়াতে বেরিয়ে পড়েছে একটা গর্ত।

'নিশ্চয় গুহামুখ!' কুপার বললেন। 'সরাও, সরাও, পাথর সরাও।'

আশপাশের কিছু পাথর সরাতেই বড় হয়ে গেল গুহামুখটা। সহজেই ঢুকতে পারে একজন মানুষ। দৌড়ে গিয়ে টর্চ আর দড়ি নিয়ে এল রবিন। ওপরে গাছের গায়ে দড়ি বেঁধে দড়ি বেয়ে এক এক করে গুহার ভিতরে নামল তিনজনে। টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল।

'কিশোর!' ওর হাত খামচে ধরল রবিন।

কিশোর আর পারকারও দেখলেন জিনিসটা। দেয়াল ঘেঁষে পড়ে রয়েছে একটা কঙ্কাল।

'কীভাবে মরল লোকটা?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে হয়,' কুপার বললেন, 'বাতাসের অভাবে। কিংবা ক্ষুধায়। ঝড়ের আগে কোন কারণে ঢুকেছিল হয়তো, ঝড়ের পর গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর বেরোতে পারেনি।'

'নাকি থাকতই এখানে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর।

মরচে ধরা কতগুলো লোহার পাইপ পড়ে থাকতে দেখা গেল কঙ্কালটার কাছে। একটু আগে রবিন যে পাইপটা খুঁড়ে বের করেছে সেটার মত। একই রকম মোটা, তবে লম্বা তারচেয়ে বেশি।

'অযথা আনেনি এগুলো,' কিশোর বলল। 'নিশ্চয় কোন কারণ ছিল।'

'প্রসপেক্টর হতে পারে,' কুপার আন্দাজ করলেন। 'হয়তো জলা থেকে পানি আনার কাজে ব্যবহার করত পাইপগুলো।'

'পানি দিয়ে কী করত?' রবিনের প্রশ্ন।

'বালি চেলে সোনার গুঁড়ো বের করতে পানি লাগে।'

গুহাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল তিনজনে। ফিরে যাবে ভাবছে, এই সময় কিশোরের চোখে পড়ল জিনিসটা। অন্ধকার কোণে পড়ে আছে একটা সিগারেটের প্যাকেট।

'দু'একদিনের মধ্যে কেউ ঢুকেছিল এখানে,' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।

'কী করে বুঝলে?'

'দেখছ না, নতুন ব্র্যান্ড। প্যাকেটটাও নতুন।'

টর্চের আলোয় দেখা গেল, আঙুলের ছাপ আছে ওটাতে। পকেট থেকে রুমাল বের করে সাবধানে মুড়ে প্যাকেটটা তুলে নিল কিশোর।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ডাই পাউডার ছড়িয়ে দেখবে নাকি, কার ছাপ?'

ছাপের উপর পাউডার ছড়াল কিশোর। আরও স্পষ্ট ফুটে উঠল ছাপটা। বুড়ো আঙুলের টিপের মত, রেখাগুলো কেমন যেন পরিচিত মনে হলো তার। কোথায় দেখেছে? হঠাৎ মনে পড়ল, কুপারের বাড়ির জানালার কাঁচে। 'বেন মানচিনি!' বলে উঠল সে।

'ঠিক!' একমত হলো রবিন।

'কী করবে এখন?' জানতে চাইলেন কুপার।

'বেন মানচিনিই ফেলে গেছে এটা,' কিশোর বলল। লুকিয়ে থেকে গুহার ওপর চোখ রাখার সিদ্ধান্ত নিল সে। ডাকাতটা আবার আসতে পারে, তাহলে ওরা শিওর হতে পারবে বেনই কিনা।

বুদ্ধিটা অন্য দুজনেরও পছন্দ হলো। ওরা যে ঢুকেছে তার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে দড়ি বেয়ে আবার উঠে এল ওপরে।

ফসিল খোঁড়ার আর সময় নেই। যার যার কাজ ভাগ করে নিল ওরা। জানোয়ারগুলোর সেবা করতে গেলেন কুপার। কিশোর বসল রান্নার কাজে। আর রবিন লুকিয়ে থেকে চোখ রাখল গুহার ওপর।

নিজেদের কাজ শেষ করে রবিনের কাছে এসে বসল অন্য দুজন। ওখানে বসেই খাওয়া সারল।

'আজ রাতে এখানেই থাকি, কি বলো?' কুপার বললেন।

অন্য দুজনের তাতে আপত্তি নেই। স্লিপিং ব্যাগ এনে ওখানেই শুয়ে পড়ল তিনজনে। মস্ত চাঁদ উঠেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। গুহামুখের আশপাশে অনেক দূর পরিষ্কার দেখা যায়।

পালা করে পাহারা দিল ওরা। সারারাতে কিছুই ঘটল না আর।

সকালে উঠে নাস্তা করতে করতে কিশোর বলল, 'আবার গুহায় ঢুকব। আরও ভালমত দেখব আজ ভিতরটা।'

আগের দিনের মতই দড়ি বেয়ে গুহায় নামল ওরা। আলো ফেলল গুহার কোণে। পিস্তলটা নেই দেখে চমকে গেল। তারমানে নিয়ে গেছে।

'কিন্তু ঢুকল কীভাবে?' বুঝতে পারছে না রবিন। 'গুহামুখের ধারে কাছে আসতে দেখিনি কাউকে।'

'আমার মনে হয়,' কিশোর বলল, 'ঢোকার অন্য পথ আছে।'

পাঁচ মিনিট লাগল পথটা বের করতে। এক কোণে বড় একটা পাথর পড়ে আছে। ঠেলা দিতে নড়ে উঠল। সরাতেই গুহায় ঢুকল দিনের আলো। একটা সুড়ঙ্গ।

'এসো,' বলে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। বেরিয়ে এল পাহাড়ের বাইরে। সারারাত ওরা যেখানে থেকে পাহারা দিয়েছে, সেখান থেকে আরও নীচে সুড়ঙ্গমুখটা। 'বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছে আমাদের!' তিক্তকণ্ঠে বলল সে। 'সারাটা রাত অকারণে পাহারা দিলাম।'

'ওখানে আমাদের লুকাতে দেখেছে কিনা কে জানে,' রবিন বলল।

সুড়ঙ্গ দিয়ে আবার গুহায় ঢুকল ওরা। পাথরটা বসিয়ে দিল জায়গামত। কুপার বললেন, 'আরও সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। নইলে কখন যে পিঠে গুলি খাব, ঠিক নেই।'

দড়ি বেয়ে উঠে এল তিনজনে। জরুরী মিটিঙে বসল। আলোচনা করে ঠিক হলো, রেডিওতে যোগাযোগ করবে মিস্টার সাইমনের সঙ্গে। সব কথা জানাবে তাঁকে।

যেখান থেকে সিগন্যাল ধরতে এবং পাঠাতে সুবিধে হবে এমন একটা জায়গা খুঁজতে চলল ওরা। কিন্তু পছন্দসই জায়গা পাওয়া গেল না। বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। শেষে ব্যাগ থেকে বেলুন বের করল কিশোর। ওটাতে অ্যান্টেনা বেঁধে ছেড়ে দিলে ওপরে উঠে যাবে, সিগন্যাল চলাচলে আর বাধা দিতে পারবে না পাহাড়।

পাহাড়ী অঞ্চলে এ সব অসুবিধে হতে পারে, আগেই ভেবেছিল ওরা। তাই বেলুন আর গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে এসেছে। কাজে লাগল এখন। অ্যান্টেনা নিয়ে উঠে গেল বেলুন। পিছনে ঝুলে রইল লম্বা তার। গোপন ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউনিং করে কিশোর বলল, 'কিশোর বলছি। কাম ইন! কাম ইন!'

কয়েকবার বলতেই সাড়া এল, 'ভিকটর বলছি। বলো। বলো।'

দ্রুত মিস্টার সাইমনকে সব কথা জানাল কিশোর। শেষে বলল, 'শেলবি, টম ও বেনের আঙুলের ছাপ জোগাড় করে রেড বিউটে পাঠিয়ে দিন। সম্ভব?'

'চেষ্টা করব।'

'ট্রেন ডাকাতদের খবর কী?'

'অনেক খবর আছে...'

বন্ধ হয়ে গেল কথা। অবাক হলো কিশোর। আপনা-আপনি চোখ উঠে গেল অ্যান্টেনার দিকে। দেখল, গ্যাস বেরিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বেলুনটা। দ্রুত নীচে পড়ছে।

আট

'কী হলো?' চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই বেলুনটাকে ধরার জন্য দৌড় দিল দুই

গোয়েন্দা। চোখের আড়ালে চলে গেছে ওটা। তার ধরে ধরে গিয়ে ওটাকে বের করে ফেলল ওঁরা। উঁচু একটা পাইনগাছের ডালে আটকে ঝুলছে।

গাছে উঠে ওটা নামাল কিশোর। 'ছিদ্র,' রবিনকে বলল সে, 'এই দেখো।'

কুপার দৌড়ে আসছেন। কিশোরের কথা কানে গেল তাঁর। 'কিন্তু কীভাবে ছিদ্র হলো? যা শক্ত কাপড়, আপনাআপনি হওয়ার তো কথা নয়!'

গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। 'গুলি করে ফুটো করেছে।'

'শব্দ শুনলাম না কেন?' রবিনের জিজ্ঞাসা। 'তুমি শুনেছ?'

'না। বহুদূর থেকে গুলি করেছে হয়তো। কিংবা সাইলেন্সার লাগানো ছিল।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন কুপার। 'বাতাসের উল্টোদিক থেকে গুলি করলে শব্দ না শোনারই কথা।'

'করলটা কে? কোনও আধুনিক কাউবয়? নাকি বেন মানচিনি?'

'কাউবয় না,' কুপার বললেন। 'নিশ্চয় ডাকাতবয়। বোঝাই যাচ্ছে, তাড়াতে চাইছে আমাদের। এখন মনে হচ্ছে, ফসিলের জন্য এত কিছু করছে না ওরা। অন্য কোন কারণ আছে। সেই কারণটাই এখন জানা দরকার।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে, ফসিল নয়,' কিশোর বলল। 'এমন কিছু আছে এখানে, যা ডাকাতদের জন্য দামী।'

অ্যান্টেনার তারটা গোটাতে গোটাতে ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে লাগল ওরা। বেলুনটা অকেজো হলেও অ্যান্টেনাটা এখনও ভাল আছে। কাজে লাগবে।

তাঁবুর কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। গিরিখাতের দিক থেকে আসছে। উদ্বিগ্ন হয়ে আরোহীদের আসার অপেক্ষায় রইল ওরা।

'ফরেস্ট রেঞ্জার,' সবুজ ইউনিফর্ম পরা লোকগুলোকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

মাঝের লোকটা খাটো, হাত আর গলার রগ বেরিয়ে আছে। বাঁয়ের লোকটার মাঝারি উচ্চতা। তৃতীয় লোকটাও খাটো, অদ্ভুত চ্যাপ্টা নাক।

'কে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল মাঝের লোকটা, তাকেই নেতা বলে মনে হলো।

'এখানে কী করছ?' চ্যাপ্টা-নাকের প্রশ্ন।

ওদের ব্যবহার পছন্দ হলো না কুপারের। কিছুটা রুক্ষভাবেই পরিচয় দিলেন নিজেদের। কী করতে এসেছেন তা-ও জানালেন।

'ফসিলই খুঁজুন আর যা-ই খুঁজুন,' নেতা বলল, 'খারাপ খবর আছে আপনাদের জন্যে। এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

'মানে?'

'সহজ কথা বুঝতে পারছেন না? মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়তে বলছি।'

'কিন্তু বেআইনী ভাবে ঢুকিনি আমরা, মালিকের অনুমতি আছে,' প্রতিবাদ জানাল কিশোর। এক পা আগে বাড়ল সে। 'মিসেস জোনসকে জানানো হয়েছে।'

'আমি বলছি চলে যেতে,' কর্কশ কণ্ঠে বলল নেতা। 'এটা সরকারি আদেশ।'

'সরকার বলেছে আমাদের চলে যেতে?' বিশ্বাস করতে পারছেন না কুপার।

'শুধু আপনাদেরকে নয়, এই এলাকায় যারা আছে সবাইকেই যেতে হবে। গভর্নমেন্ট রিজার্ভ বানানো হবে জায়গাটাকে।'

কুপার ও দুই গোয়েন্দা হতাশ। সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই। যেতেই হবে। আর কয়েকটা দিন থাকার অনুমতি চাইলেন কুপার। লাভ হলো না।

কড়া গলায় আদেশ দিল নেতা, 'জলদি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।'

ফসিল শিকারিদের পিছে পিছে এল রেঞ্জাররা।

নেতা বলল, 'তাড়াতাড়ি গোছান। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। অনেক কাজ আছে আমাদের।'

'এত পাগল হয়ে গেছেন কেন?' রেগে উঠল কিশোর। 'তাড়াহুড়ো করলে জিনিসগুলো নষ্ট হবে, বুঝতে পারছেন না? ভাঙলে দেবেন আপনারা?'

'ওটা কী, রেডিও না? তেজ তো খুব দেখাচ্ছো। স্টেট লাইসেন্স আছে ওটার?'

'স্টেট লাইসেন্স! সেটা আবার কী জিনিস?'

'অ, নেই। তাহলে তো এই রেডিও রাখতে পারবে না। আমরা বাজেয়াপ্ত করলাম। শর্টওয়েভ, না? হুঁম্!' সঙ্গীদের বলল, 'এই, হাঁ করে দেখছ কী? তুলে নাও ওটা।'

'বাজেয়াপ্ত করলাম, বললেই হলো নাকি?' জ্বলে উঠল রবিনও। 'রেডিও ব্যবহার করতে স্টেট লাইসেন্স লাগে কোথায় লেখা আছে? দেখান আগে।'

'আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অফিসে যেয়ো, কাগজপত্র দেখে আসতে পারবে। রেডিওটাও ফেরত নিয়ে এসো ওখান থেকে।'

আবার প্রতিবাদ জানাতে গেল কিশোর। কিন্তু রেঞ্জারদের পিস্তলে হাত দিতে দেখে থেমে গেল। বুঝল লাভ হবে না। হতাশ হয়ে মালপত্র খচ্চরের পিঠে তুলে ঘোড়ায় চাপল তিনজনে। ফিরে চলল রেড বিউটে।

'যাও,' সঙ্গে সঙ্গে আসছে নেতা, পিছনে তার দুই সহকারী। 'মাইল দশেকের মধ্যে থাকবে না। আর কখনও যেন ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে না দেখি।'

আরও কিছুদূর এগিয়ে ফিরে গেল রেঞ্জাররা। অভিযাত্রীরা এগোল আরও খানিকটা। তারপর থামল। দশ মাইল নয়, ওয়াইল্ডক্যাম্প সোয়াম্পের কাছ থেকে মাইলখানেক দূরে এসেই ক্যাম্প করল আবার।

'এই রহস্যের কিনারা না করে আমি এক পা-ও নড়ছি না,' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল কিশোর। 'সত্যি সত্যি সরকার দখল করে নিলে বলার কিছু নেই। কিন্তু এ সবে যদি শেলবির হাত থেকে থাকে, শেষ দেখে ছাড়ব আমি।'

'আমিও,' রবিন বলল। 'কিশোর, ডাকাতদের কথা ওদের বললে না কেন? তাহলে হয়তো আরও ক'দিন থাকতে দিত, ওদের সহযোগিতা করার জন্যে।'

জবাব দিল না কিশোর। ভাবছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'মিস্টার সাইমন নিশ্চয় আঙুলের ছাপগুলো পাঠাবেন। আমরা রেড বিউটে গেলেই পেয়ে যাব।'

'তাহলে আজই বিউটে চলে যাই,' কুপার বললেন। 'তোমরা থাকো, আমি একাই যাব। ছাপগুলো পেলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যাব। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব এখানে।'

'গেলে রাতে যান। দিনের চেয়ে রাতে যাওয়াটা ভাল, চাঁদের আলো আছে, অসুবিধে হবে না। যদি কেউ কাছাকাছি থাকেও, দেখতে পাবে না আপনাকে,' কিশোর বলল। 'আমরা মাল পাহারা দেব এখানে। কড়া নজর রাখব। ডাকাতগুলো কী করছে জানার চেষ্টা করব।'

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাতের খাওয়া শেষ করল ওরা। কিছু খাবার আর দরকারি কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস সঙ্গে নিলেন কুপার, যাতে রেড বিউট পর্যন্ত যেতে অসুবিধে না হয়। তিনি চলে যাওয়ার পর ক্যাম্পের আগুনটা উস্কে দিয়ে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকল দুই গোয়েন্দা।

'কেমন রেঞ্জার ওরা?' হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল রবিন। সারাদিন ধরেই প্রশ্নটা জেগেছে তার মনে। 'আমার ধারণা ছিল রেঞ্জাররা হবে নিখুঁত পোশাক পরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রগ বের হওয়া খাটো লোকটাকে আস্ত একটা বেজি মনে হয়েছে আমার।'

'আমিও এই কথাই ভাবছি,' কিশোর বলল। 'কয়েকটা ব্যাপারে খটকা লেগেছে আমার। যেমন স্টেট লাইসেন্স।'

'ওদের ব্যবহারও অত্যন্ত রুক্ষ। অথচ আমি শুনেছি, রেঞ্জাররা নাকি খুব ভদ্র হয়। বেজিটার কথা তো গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে আমার...' মুখ ভেংচে বলল রবিন, 'আর কখনও যেন ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে না দেখি!'

ঝট করে উঠে বসল কিশোর। 'রবিন! বুঝতে পারছ না? ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প বলেছে!'

'তাতে কী?'

'রিকি বলেছে জায়গাটার নাম ডেভিল'স সোয়াম্প।'

'আরে, তাই তো! এটা তো ভাবিনি! রেঞ্জাররা পারকিনসের রাখা নামটা জানল কী করে?'

'তার মানে আসল রেঞ্জার নয় ওরা, নকল লোক! চলো, গিয়ে দেখি, কী হচ্ছে ওখানে।'

ব্যাগ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চাপল ওরা। ঝোপঝাড় আর পাহাড়ের ছায়ায় গা ঢেকে প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। গিরিসঙ্কটের আধমাইল দূরে এসে নামল ঘোড়া থেকে। জানোয়ার দুটোকে ওখানে বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে এগোল।

গিরিসঙ্কটে ঢুকে থামল। কান পাতল শব্দের আশায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার এগোল। গিরিসঙ্কটের বাইরে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। একেবারে চূড়ার কাছাকাছি উঠে থামল। এক টুকরো মেঘের আড়ালে ঢাকা

পড়েছে চাঁদ, ওদের চারপাশে এখন অন্ধকার।

আস্তে কিশোরের বাহুতে হাত রাখল রবিন। ফিসফিসিয়ে বলল, 'কিশোর! নীচে!'

আলো দেখা যাচ্ছে গুহামুখে।

নয়

'চলো, দেখে আসি,' কিশোর বলল। 'খুব সাবধানে যেতে হবে। পাথরের আড়ালে পাহারায় থাকতে পারে কেউ। মেঘ সরে গেলেই চমৎকার নিশানা হয়ে যাব আমরা।'

হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ওরা। আলগা পাথরের অভাব নেই। গায়ে লেগে গড়িয়ে পড়লে শব্দ হবে। অতিরিক্ত সাবধান থাকায় যেতে সময় বেশি লাগলেও অঘটন ঘটল না। নিরাপদেই গুহামুখের কাছে পৌঁছল। মুখ বাড়িয়ে নীচে উঁকি দিল কিশোর।

'দেখা যায়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

জবাবে তার হাতে শক্ত হয়ে চেপে বসল কিশোরের আঙুল। ইঙ্গিতটা বুঝল রবিন। সে-ও মুখ বাড়াল। আরেকটু হলেই চেঁচিয়ে উঠেছিল। গুহার ভিতরে বসে আছে সেই তিন রেঞ্জার!

নিচুস্বরে কথা বলছে ওরা। কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

শোনার জন্য আরেকটু আগে বাড়তে গেল রবিন। ঘটে গেল অঘটন। আচমকা কনুই পিছলে গেল তার, গর্তের কিনার থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল কিছু আলগা পাথর।

'কে! কে!' চিৎকার শোনা গেল গুহার ভিতর থেকে।

'নিশ্চয় কেউ আছে ওপরে,' বলল আরেকজন। 'ধরো, ধরো!'

লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল ছেলেরা। নিঃশব্দে চলার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

পিছনে শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার। তাড়া করে আসছে রেঞ্জাররা। ঠিক এই সময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ।

'জোরে! আরও জোরে দৌড়াও!' ঘুরে গিরিসঙ্কটের দিকে ছুটল কিশোর।

অলিম্পিক জেতার বাজি ধরেছে যেন দুজনে। গিরিসঙ্কটে সবে পা দিয়েছে, এই সময় গুলির আওয়াজ শোনা গেল পিছনে। কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। পর পর কয়েকটা।

এরপর পায়ে যেন পাখা গজাল দুজনের।

'এঁকেবেঁকে দৌড়াও,' কিশোর বলল।

ছুটতে ছুটতে এসে ঝোপের ভিতর ঢুকল ওরা। ঝোপের আড়ালে আড়ালে

পৌঁছে গেল বনের ভিতর। রাস্তা নেই এখানে। এবড়োখেবড়ো পাথুরে মাটি, সোজা হয়ে দাঁড়ালে ডাল লাগে মাথায়। মাথা নিচু করে বেকায়দা ভঙ্গিতে দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে গাছের শিকড়ে। ধুড়ুস করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একবার রবিন। তাকে টেনে তুলল কিশোর। আবার ছুটল।

পিছনে রেঞ্জারদের উত্তেজিত হই-চই। টর্চ জ্বেলে খুঁজছে ওরা।

একটা গর্তে লুকিয়ে অবশেষে ওদেরকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হলো দুজনে। গর্তের ওপরটা ঝোপ আর লতাপাতায় এমনভাবে ঢাকা পড়েছে, ওপর থেকে দেখে বোঝা যায় না। পা পিছলে কিশোর ওটার ভিতর পড়ে না গেলে গর্তটা পাওয়া যেত না।

অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল রেঞ্জারদের কথার শব্দ। হাঁপ ছাড়ল দুজনে। বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসল।

'আমাদের ঘোড়াগুলো যদি দেখে ফেলে?' রবিন বলল।

'দেখলে আর কী করব। আপাতত তো বাঁচলাম। কিন্তু এলাম কোথায়?'

ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা। পথ হারিয়ে ফেলেছে। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে শেষে ক্ষান্ত দিল। সকালে আলো ফুটলে ক্যাম্প খুঁজে বের করা যাবে ভেবে বসে পড়ল আবার।

'এই, রবিন, আলো!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচছে আলোটা, যেন শূন্যে ঝুলে ঝুলে এগোচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পরেই কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। তাড়াতাড়ি বড় একটা ঝোপের ভিতরে ঢুকে গেল দুজনে। এগিয়ে আসছে ঘোড়া...কাছে...আরও কাছে। আরোহী এক কিশোর, হাতে লণ্ঠন।

রিকি জোনস!

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রবিন। হাত নেড়ে ডাকল, 'অ্যাই, রিকি!'

তাকাল ছেলেটা। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে এল। 'তোমরা এখানে? তোমাদেরই তো খুঁজছি।'

কী হয়েছে জানাল কিশোর। রেঞ্জারদের চেহারার বর্ণনা শুনে মাথা নাড়ল রিকি। ওরকম কাউকে চেনে না জানাল। গুহাটার কথা শুনে অবাক হলো। দেখেনি কখনও, এমনকী শোনেওনি ওটার কথা।

'ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প যে সরকারে নিয়ে যাচ্ছে,' রবিন বলল, 'আমাদের বলনি কেন?'

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল রিকির চোখ। 'জানলে তো বলব। মিছে কথা বলেছে ব্যাটারা। আজব আজব কাণ্ড ঘটছে আজকাল এখানে। সোয়াম্প কেনার প্রস্তাব নিয়ে আজ বিকেলে এক লোক গিয়েছিল মা'র কাছে।'

রিকি জানাল, কতগুলো দলিল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল লোকটা। 'সেগুলো দেখিয়ে মা'কে বলেছে, ডেভিল'স সোয়াম্পের বেশির ভাগ জায়গা নাকি আমাদের

নয়, অন্য এক লোকের। তার কাছ থেকে ওগুলো কিনতে যাচ্ছে লোকটা। মা'কে বলল : ইচ্ছে করলে আপনিও আপনার জায়গা বিক্রি করতে পারেন। নইলে পরে পস্তাবেন।'

রিকির কথা শুনে দুই গোয়েন্দাও কম অবাক হলো না।

রিকি বলল, 'আমাদের বাড়ি, আর আশপাশের কয়েক একর জমি ছাড়া বাকি সব নাকি আরেকজনের, তার কাছ থেকে দলিল এনেছে লোকটা। ওর নাম বলল অ্যান্ডি কারনি। আগে কখনও দেখিনি। এদিকের লোক নয় সে। খাটো। চেহারাটা কেমন ফ্যাকাসে।'

'বেন মানচিনি!' রবিন বলল।

'সে আবার কে?' জানতে চাইল রিকি।

'এক নম্বর জালিয়াত। নিশ্চয় জাল দলিল বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তোমাদের বাড়িতে।'

কিশোর বলল। 'রিকি, তোমার মাকে গিয়ে বলো, কোন দলিল যেন লোকটাকে না দেন। এমনকী দলিল দেখাতেও নিষেধ করবে। নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে বলবে ওগুলো। এখুনি যাও।'

'থ্যাংকস,' রিকি বলল। 'আমি জানতাম, তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। চলি। তোমরা এসো কিন্তু।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুলল রবিন। 'একটা সাহায্য করো। আমাদের ঘোড়াগুলো খুঁজে দিয়ে যাও।'

রিকির সাহায্যে ঘোড়া দুটো খুঁজে বের করতে সময় লাগল না ওদের। বিদায় নিয়ে চলে গেল রিকি। দুই গোয়েন্দা ফিরে এল ক্যাম্পে। জিনিসপত্র যেভাবে যা রেখে গিয়েছিল, সেভাবেই আছে।

পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসে আগের দিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা চালাল ওরা। জোনসের র‍্যাঞ্চে গিয়ে রিকির মায়ের সঙ্গে দেখা করা দরকার, একমত হলো দুজনেই।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। কান খাড়া করে ফেলল দুজনেই। মিস্টার কুপার ফিরেছেন? নাকি আবার আসছে রেঞ্জাররা? তাড়াতাড়ি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল দুজনে। তাকিয়ে আছে গিরিসঙ্কটে ঢোকার রাস্তার দিকে।

অন্য আরেকটা ঝোপের ভিতর হুটোপুটির শব্দ। একটা খরগোশকে তাড়া করে বেরোল একটা শিয়াল।

অবশেষে দেখা গেল ঘোড়াটাকে। কিন্তু আরোহীকে দেখে অবাক যেমন হলো ওরা, আনন্দিতও হলো। ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল তার দিকে।

দশ

'মুসা!' চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল রবিন। 'মুসা!'

কাছে এসে বলল মুসা, 'এত চমকে গেলে যে?'

'তুমি এখানে। চমকাব না?'

'কেন, আমার কি আসার কথা না নাকি? আর শুধু আমি না, মিস্টার সাইমনও এসেছিলেন। হ্যারি পটার আমাদেরকে রেড বিউটে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে।'

'মিস্টার সাইমন রেড বিউটে কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'রেল ডাকাতের পিছে লেগেছেন, ভুলে গেছ? ওদের গন্ধ শুঁকে শুঁকেই এসেছেন। জেলে না ঢুকিয়ে ক্ষান্ত হবেন না।' ঘোড়া থেকে নামল মুসা।

'কিন্তু জায়গা চিনলে কীভাবে?'

'মিস্টার সাইমন বললেন, শেরিফ হ্যামারসন অবশ্যই জানবেন তোমরা কোথায় আছো,' মুসা বলল। 'শেরিফ আমাকে ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবেন। তাই প্রথমে শেরিফের সঙ্গে দেখা করতে বললেন আমাকে।'

'মিস্টার সাইমন এসেছিলেন বললে, তারমানে নেই এখন ওখানে?' জানতে চাইল রবিন।

'না। রাতের ট্রেনেই চলে গেছেন।'

'কোথায়?'

'বলেননি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি।'

'শেরিফই তোমাকে সোয়াম্পটা চিনিয়ে দিয়ে গেছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, অফিসে পাইনি তাঁকে। গেলাম তাঁর র‍্যাঞ্চে। সেখানেও নেই।'

'তাহলে এই জায়গা চিনলে কী করে?'

'একটা ছেলে চিনিয়ে দিল। ছেলেটা ভাল, নাম রিকি। শেরিফকে না পেয়ে ফিরেই যাচ্ছিলাম, পথে ওর সঙ্গে দেখা। এখানকার গলিঘুপচি সব চেনে ও। ঘোড়ায় চড়ার ওস্তাদ...'

'জানি।'

'তা হলে তোমাদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে। আমাদের অনেক উপকারও করেছে,' রবিন জবাব দিল। 'হ্যাঁ, তারপর?'

'সোয়াম্পটা কোথায় জিজ্ঞেস করলাম ওকে, শর্টকাট দেখিয়ে দিল।' এদিক

ওদিক তাকাল মুসা। 'মিস্টার কুপার কোথায়?'

'রেড বিউটে গেছেন,' রবিন বলল।

'তারমানে হোটেলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি,' বলল কিশোর।

'না, হয়নি।'

চিন্তিত হলো কিশোর। কোন বিপদে পড়েননি তো কুপার? 'সবই কেমন যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে এখানে!'

সব কথা মুসাকে জানাল কিশোর ও রবিন। এখানে আসার পর যত ঘটনা ঘটেছে।

'ওহ্ হো, কথায় কথায় ভুলেই গিয়েছিলাম।' পকেট থেকে একটা খাম বের করে কিশোরকে দিল মুসা। 'মিস্টার সাইমন এটা তোমাকে দিতে বলেছেন।'

আগ্রহী হয়ে খামটা নিয়ে মুখ ছিঁড়ল কিশোর। অন্য দুজনও ঝুঁকে এল কী আছে দেখার জন্য। ভিতরে একটা কাগজ, তাতে তিনটে আঙুলের ছাপের ছবি। শেলবি, ফেরেনটি আর বেন মানচিনির। পিস্তলে পাওয়া ছাপটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা দোলাল, 'হুঁ, পিস্তলটা বেনেরই। মিলে যাচ্ছে, দেখো। বাজি রেখে বলতে পারি, পিস্তলটা এখনও বেনের হোলস্টারে ভরা রয়েছে।'

শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'ওই ব্যাটা তোমাদের পিছে লেগেছে?'

'আন্দাজ করছি,' কিশোর বলল। 'মুসা, মিস্টার সাইমন কি শুধু খামটাই দিয়েছেন? আর কিছু বলেননি?'

'ওহ্ হো, বলেছেন তো! খালি ভুলে যাচ্ছি।'

'কী বলেছেন?'

'তোমাদেরকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।'

'কখন? কোথায়?'

মাথার ক্যাপটা পিছনে ঠেলে দিয়ে কপাল চুলকাল মুসা। 'সতেরো তারিখে, মাঝরাতের সামান্য আগে।'

'কোথায়?'

'স্পার গালশে, রেললাইনের ধারে।' পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে দিল মুসা। 'এতে জায়গাটা চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।'

'কিশোর, ব্যাপারটা কী বলো তো?' ভুরু কুঁচকাল রবিন। 'রেললাইনের ধারে কেন? ডাকাতদের জন্য ফাঁদ পাতবেন নাকি?'

'পাততে পারেন। আজকে হলো পনেরো, আর মাত্র দু'দিন সময় আছে হাতে। ইতিমধ্যে এখানকার রহস্যের একটা কিনারা করে ফেলতে পারলে ভাল হতো...শেরিফকে গিয়ে জানানো উচিত আমাদের। মিসেস জোনসের সঙ্গে দেখা করাও বাকি।'

কিন্তু ক্যাম্প ছেড়ে যেতে পারছে না। কখন মিস্টার কুপার চলে আসেন। হোটেলে হয়তো মিস্টার সাইমন আর মুসার আসার খবর জানতে পারবেন তিনি।

শুনলে নিশ্চয় ফিরে আসবেন।

কিন্তু এলেন না মিস্টার কুপার।

'এখন তো ভয়ই লাগছে আমার,' কিশোর বলল, 'আদৌ তিনি রেড বিউটে পৌঁছেছেন কিনা! বেনের মত শয়তান লোক রয়েছে আশপাশে...নাহ্, ভয়টা বাড়ছে আমার!'

একটা রঙিন রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল মুসা। 'কী করবে এখন? ও, ভাল কথা, প্রাগৈতিহাসিক উটের ফসিলটা পেয়েছ নাকি!'

'এখনও পাইনি,' জবাব দিল রবিন। 'তবে মনে হয় জায়গাটা পেয়েছি।'

বিকেল গেল, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতও হলো, ফিরলেন না কুপার। ফিরলেন না সকালেও। আর বসে থাকা যায় না। রেড বিউটে গিয়ে খোঁজ নেয়া দরকার।

মুসা বলল, 'আমিই যাই।'

অন্য দুজন রাজি হলো।

ঘোড়ায় চেপে চলে গেল মুসা।

শেরিফের কাছে যেতে তৈরি হলো কিশোর ও রবিন। ক্যাম্পের জিনিসপত্র সব একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে রেখে ডালপাতা দিয়ে ঢেকে দিল সেগুলো।

*

শেরিফের র‍্যাঞ্চ অনেক দূর।

ঘোড়া রেখে বাড়ির দরজায় উঠে টোকা দিল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল পাল্লা। একজন মাঝবয়েসী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। নিজেদের পরিচয় দিয়ে, শেরিফ কোথায় জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমার স্বামী তো নেই,' জবাব দিলেন মহিলা। 'আমারও ভাবনা হচ্ছে। তিন দিন বাড়ি আসে না।'

'তিন দিন?' কিশোর বলল। 'মাঝে মাঝেই এ রকম করেন নাকি?'

'না। আমাকে বলল, একটা জরুরী ফোন পেয়েছে। রেঞ্জারদের নাকি গোলমাল। পেয়েই তাড়াহুড়া করে চলে গেল।'

চট্ করে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। রেঞ্জার! ওদের সঙ্গে গোলমাল করেছে যে তিনজন, তারাই নয় তো? মহিলার দিকে ফিরল আবার। 'একটা নোট রেখে যেতে চাই। শেরিফ ফিরলে তাঁকে দেবেন, প্লিজ।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল মহিলা।

নোট লিখতে বসল কিশোর।

ওদেরকে দুপুরের খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না শেরিফের স্ত্রী। র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে কিশোর বলল, 'এখন আর মিসেস জোনসের ওখানে যাচ্ছি না। ক্যাম্পে ফেরা দরকার। দেখি গিয়ে, মিস্টার কুপার এলেন কিনা?'

ক্যাম্পে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই কানে এল মানুষের গলা। ঘোড়া থেকে নেমে সাবধানে এগোল ওরা।

'মুসা এসেছে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

শুধু মুসা নয়, মিস্টার কুপারও এসেছেন।

কুপার জানালেন, ফেরার পথে মুসার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। রেড বিউটে ঠিকমতই পৌঁছেছিলেন তিনি। মিস্টার সাইমন ও মুসার আসার খবর পেয়ে ফিরে এসেছেন। কোন বিপদ হয়নি, যেতেই দেরি করে ফেলেছিলেন আসলে। পথ হারিয়ে চলে গিয়েছিলেন আরেক দিকে, ফিরতে দেরি হয়েছে সে-কারণেই।

'এখন তো চারজন হলাম,' মুসা বলল, 'আর ভয় কী? বেন মানচিনিকে একহাত দেখে নেয়া দরকার।'

হাসি ফুটল সবার মুখে। দূর হয়ে গেল সমস্ত উদ্বেগ, উত্তেজনা। রাতের খাবার তৈরি করতে বসল ওরা।

রাত নামল। ইতিমধ্যে তিন রেঞ্জারের আর দেখা মিলল না। কিশোর বলল, 'এখনই গিয়ে একটু খুঁড়ে এলে কেমন হয়?'

কুপার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

টর্চ আর মাটি খোঁড়ার সরঞ্জাম নিয়ে সাবধানে ফসিল এরিয়ার দিকে চলল চারজনে।

জায়গাটা খুব পছন্দ হলো মুসার।

বলা যায়, কাকতালীয়ভাবেই উটের কঙ্কালটা আবিষ্কার করে ফেলল ওরা। মুসার কোদালের নীচেই পড়ল উটের হাড়। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই। দ্বিগুণ উদ্যমে চালিয়ে গেল মাটি খোঁড়া।

বোঝা যাচ্ছে, কঙ্কালটা অনেক বড়।

'চমৎকার নমুনা!' কুপার বললেন।

এরপর, বোর্ডটাও মুসাই আবিষ্কার করল। 'হাহ্, যত কিছু কেবল আমার কোদালের তলায়ই পড়ে। সুইমিং পুল খুঁড়তে গেলাম, পড়ল কী এক –পড; এখানে পড়ল বোর্ড, এটার আবার কী নাম, খোদাই জানে...এই কিশোর, প্রাগৈতিহাসিক কালে বোর্ড কি উটেরা বানাত?...এহ্হে, একেবারে পচে গেছে।'

'বোর্ড?' কাজ থামিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। 'কই?'

'এই তো,' টর্চের আলো ফেলল মুসা। 'আরে, আবার লেখাও তো আছে। দেখো?'

'কারও নাম হতে পারে,' রবিন বলল। 'তিনটে অক্ষর আছে, বাকিগুলো গেছে মুছে।'

'নিশ্চয়ই কোন প্রসপেক্টর এটা ফেলে গেছে এখানে,' অনুমান করলেন কুপার।

বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। তুড়ি বাজাল। 'বুঝেছি! আপনারা থাকুন এখানে, আমি আসছি। এক সেকেন্ড।'

কাউকে প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে ছুটে চলে গেল সে। হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

'আসলে কিছুই বোঝেনি। সন্ধ্যায় বেশি খেয়েছে, লক্ষ করেছ?' হেসে বলল

মুসা। 'নিশ্চয় পেটে মোচড় দিয়েছে। খামোকা একটা ছুতো করে চলে গেল আরকী...'

কথা শেষ হলো না মুসার, তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। মানুষের আর্তনাদের মত।

চমকে গেল তিনজনে। বিপদে পড়ল না তো কিশোর?

এগারো

গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠে কিশোর যেদিকে গেছে সেদিকে দৌড় দিল রবিন। পিছু নিলেন কুপার আর মুসা। অন্ধকারের চাদর যেন বর্শার মত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে টর্চের আলোক রশ্মি। জলাভূমির কিনারে এসে দাঁড়াল ওরা।

টর্চের আলো এসে পড়ল ওদের গায়ে। জিজ্ঞেস করল পরিচিত একটা কণ্ঠ, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

'কিশোর,' কুপার জিজ্ঞেস করলেন, 'চিৎকার করলে কেন?'

'আমি করিনি। আমি তো ভাবলাম আপনাদের কেউ।'

'হুঁম!' মাথা দোলালেন কুপার। 'নিশ্চয় কুগার। অনেক সময় মানুষের মতই চিৎকার করে।'

'কিশোর,' মুসা প্রশ্ন করল, 'তুমি হঠাৎ এভাবে চলে এলে কেন?'

'গাছে লাগানো সাইনবোর্ডটা আরেকবার দেখতে। একটা আইডিয়া এল মাথায়।'

সবাইকে উইলো গাছটার কাছে নিয়ে এল কিশোর। মুসাকে দেখাল ঝুলে পড়া বোর্ডটা। খসে পড়ে পড়ে অবস্থা। একটানে ওটা খুলে নিল সে। মুসার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি যেটা পেয়েছ, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।'

ফিরে চলল ওরা। পাহাড়ে ওঠার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে সবাই।

কঙ্কাল দেখেছে যে গুহাটায়, সেটার কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'এই, আমার বেলচা তো এখানেই রেখে গিয়েছিলাম! গেল কই?'

'আরে, কিছুই তো নেই!' চিৎকার করে বললেন কুপার।

'বোর্ডটাও নেই!' কিশোর বলল। 'নিল কে?...তারমানে কুগারের ডাক নকল করে ইচ্ছে করেই চিৎকারটা দিয়েছে কেউ, আমাদের সরানোর জন্য। আমাদের জিনিসগুলো কারও দরকার। এই, তোমরা টর্চ নেভাও। পিস্তলের নিশানা হয়ে লাভ নেই।'

অন্ধকারে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। একটু পর ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'এখন এই অন্ধকারে চোরের খোঁজ করা বৃথা। তারচেয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়াই ভাল।'

একই পথে কয়েকবার যাতায়াত করেছে, মুসা ছাড়া বাকি সবাই পথটা চিনে ফেলেছে ভালমতই। অন্ধকারেও চলতে অসুবিধে হলো না ওদের। পথ হারাল না। ক্যাম্পে ফিরে সোজা স্লিপিং ব্যাগে ঢুকল।

'কিশোর,' নিচুকণ্ঠে বলল মুসা, 'বোর্ড দুটো মিলিয়ে কী দেখতে চেয়েছিলে?'

'দুটো টুকরো খাপে খাপে লাগে কিনা। আমার বিশ্বাস, একটা বোর্ডেরই টুকরো ওই দুটো।'

'ওয়াইল্ডক্যাট -নয়?' বুঝে ফেলেছে রবিন। বলল, 'হবে আসলে ওয়াইল্ডক্যাটারস!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'আসলে লেখা ছিল হিয়ার লাই দা বডিয অভ টোয়েন্টি ওয়াইল্ডক্যাটারস।'

'কিন্তু ওয়াইল্ডক্যাটারে দুটো টি থাকে,' মনে করিয়ে দিল রবিন।

'এটাতেও নিশ্চয় ছিল। ভাঙার সময় নষ্ট হয়েছে একটা টি। বাকি বোর্ডটায় রয়েছে তিনটে অক্ষর, ই-আর-এস, দেখলেই তো।'

'কিন্তু তাতেই বা কী?' বুঝতে পারছে না মুসা। 'ওয়াইল্ডক্যাট হলে বনবিড়াল, ক্যাটার হলে বিড়াল শিকারি। কী এসে যায়? মরে গেলে বনবিড়ালও যা, শিকারিও তা-ই, দুটোই লাশ।'

'বুঝতে পারছ না, মুসা, শিকারিরা মানুষ,' কিশোর বলল।

'তা-তো পারছিই। কিন্তু তাতেই বা কী?'

'বনবিড়াল শিকারি নয়, মুসা,' কুপারও বুঝে ফেলেছেন এতক্ষণে, 'শব্দটার ভুল অর্থ করছ তুমি। ওয়াইল্ডক্যাটার মানে 'বনবিড়াল শিকারি নয়, তেলের খনি শিকারি।'

'তেলের খনি!' শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'মানে ওরা অয়েল প্রসপেক্টরস! এখানে তেলের কূপ আছে!'

'থাকতেও পারে।'

'বুঝেছি,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিনও, 'পাইপগুলোর মানে বোঝা গেল এতক্ষণে। ড্রিলিং করার জন্য লাগতে পারে ভেবে নিয়ে এসেছিল। নিশ্চয় গুহার ওই কঙ্কালটাও একজন ওয়াইল্ডক্যাটারের।'

'কঙ্কাল!' আঁতকে উঠল মুসা।

'ও, বলা হয়নি তোমাকে। গুহায় ঢুকলেই দেখতে পাবে।'

ব্যাগের ভিতরে গুটিসুটি হয়ে গেল মুসা।

'ভাবছি,' কিছুক্ষণ পর বলল কিশোর, 'কী হয়েছিল বিশজন মানুষের, আর সেটা কবে?'

'আমার ধারণা,' কুপার বললেন, 'বেশিদিন আগের ঘটনা নয়।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তারমানে, এখনও কিছু লোক জীবিত আছে, যারা ওয়াইল্ডক্যাটারদের কাছ থেকে জেনেছে, তেল আছে সোয়াম্পের নীচে কোথাও।'

'কোথায় আছে, বোঝার কোনও উপায় আছে?' মুসা জানতে চাইল।

'আছে। প্রাগৈতিহাসিক কালের একটা বিশেষ সময়ে মাটির নীচে তেল জমা হওয়ার পরিমাণ ছিল বেশি। সেই সময়কার কোন ফসিল কোথাও পাওয়া গেলে ধরে নিতে হবে কাছাকাছি তেল রয়েছে। বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো আজকাল মোটা মাইনের চাকরি দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখে তেল খুঁজে বের করার জন্য।'

'হুঁ, তারমানে আরও খুঁড়তে হবে আমাদের। শাবল-কোদালগুলো তো সব গেছে, আবার কিনতে হবে।'

'রেড বিউটে গেলে আনতে পারব,' কিশোর বলল। 'কাল রাতে তো স্পার গালশে মিস্টার সাইমনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিই। ফেরার পথে নিয়ে আসব।'

'দেরি হয়ে যাবে,' কুপার বললেন। 'তারচেয়ে বরং আমি আর মুসা কাল রেড বিউটে চলে যাই। যাবার পথে মিসেস জোনসের সঙ্গেও দেখা করে যাব। আমাদের সন্দেহের কথাটা জানাব তাঁকে।'

পরদিন সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক পর রওনা হলো ওরা। কিশোর ও রবিন গেল পুবে। বাকি দুজন উত্তর-পশ্চিমে কোণাকুণি।

'আরেকবার গুহাটা দেখে যেতে চাই,' গিরিসঙ্কট থেকে বেরিয়ে বললেন কুপার। 'নতুন কোন সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

মুসার ইচ্ছে নেই, কঙ্কাল দেখে ভয় লাগে তার। তবু শিক্ষকের কাছে নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণ করতে চাইল না। ঢোক গিলে বলল, 'বেশ চলুন।'

কিন্তু সুড়ঙ্গের কাছে পৌঁছে আবার সাহস হারাল সে। বলল, 'ঘোড়াগুলোকে ফেলে যাওয়া বোধহয় উচিত হবে না। আপনি যান, আমি পাহারা দিই।'

হেসে মাথা নাড়লেন কুপার। ছাত্রের মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। বললেন, 'না, আলাদা হওয়া ঠিক হবে না। বিপদ তাতে বাড়বে।'

অগত্যা রাজি হতেই হলো মুসাকে।

টর্চ হাতে আগে আগে চললেন কুপার। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় যখন পৌঁছুলেন, কমে যেতে লাগল আলো।

'ব্যাটারি আর ফুরানোর সময় পেল না,' আনমনে বিড়বিড় করলেন তিনি।

ভিতরে ঢুকলেন মুসাকে নিয়ে।

নিজের টর্চটা জ্বালল মুসা। ভয়ে ভয়ে তাকাল কঙ্কালটার দিকে।

কুপার এগিয়ে গেলেন পাইপগুলোর কাছে। টর্চের নিভু নিভু আলোয় দেখতে লাগলেন ওগুলো। কী মনে করে নিচু হয়ে তুলতে গেলেন একটা পাইপ। হঠাৎ শব্দ হলো। মুসা করেছে ভেবে ফিরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেলেন।

সুড়ঙ্গমুখের পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। হাতে পিস্তল।

আরেকজন বেরিয়ে আসছে সুড়ঙ্গ থেকে।

বারো

'তোমরা?' রেগে গেলেন কুপার। 'আবার কী চাই? আর ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'বাহ্, চমৎকার,' কুৎসিত হাসি হেসে বলল রগ-ফোলা লোকটা। 'কে ফাঁকি দিতে যাচ্ছে? ভালভাবে বলেছিলাম, শোনোনি। অভদ্র হতেই হবে এখন আমাদের।'

'তোমাদের কোনও অধিকার নেই...'

'নেই, না? বেশ, অধিকার আদায় করে নেব।'

'পার পাবে না এ সব করে। তোমরা কে, কীসের পিছনে লেগেছ, ভাল করেই জানি। ধোঁকা দিয়ে মিসেস জোনসের জমি দখল করতে চাইছ, সে-খবরও জানি।'

'তুমি,' রগ-ফোলা লোকটার দিকে হাত তুলল মুসা, 'বেন মানচিনি।'

অবাক মনে হলো অন্য লোকটাকে। বলে উঠল, 'ওরা জানে...'

'চুপ!' ধমক দিল খাটো লোকটা। আবার কুপার ও মুসার দিকে ফিরল। 'বোঝা গেল, মাথায় ঘিলু একেবারেই নেই তোমাদের। সব কথা জানা থাকলেও সব সময় বলতে নেই। বলে ভুল করেছ।' সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, 'এই, তারগুলো নিয়ে এসো তো।'

গুহার একপ্রান্তে চলে গেল লোকটা। ফিরে এল হাতে এক বান্ডিল তামার তার নিয়ে। দুজনে মিলে ওদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বাঁধল বন্দিদের, পা-ও বাঁধল একসঙ্গে করে।

'কোথায় নেবে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

হেসে উঠল রগ-ফোলা। 'কোথাও না। এখানেই শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করো।'

লোকটা থামতেই তার সঙ্গী বলল, 'আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে শেরিফকে পাঠাব তোমাদের ছাড়িয়ে নিতে।'

বেরিয়ে গেল লোকগুলো।

'শেরিফকে সত্যিই পাঠাবে তো ওরা, সার?' মুসার প্রশ্ন।

'বলা মুশকিল।'

*

রেড বিউটে যাওয়ার পথে মোড় নিয়ে সামান্য কিছুদূর গেলেই পড়ে শেরিফের র‍্যাঞ্চ। কিশোর ঠিক করল, ওখানে হয়ে যাবে। শেরিফ এলেন কিনা, খোঁজ নেবে।

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে, ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে দরজায় দাঁড়াল দুজনে। থাবা দিল কিশোর। ঠেলা লাগতেই খুলে গেল পাল্লাটা। ভেজানো ছিল। কিশোর অবাক।

অবাক রবিনও হয়েছে। 'কেউ আছেন?' গলা চড়িয়ে ডাকল সে। জবাব নেই। চোখে পড়ছে পরিচ্ছন্ন লিভিং রুম। মানুষ নেই।

আরও কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে ভিতরে ঢুকল দুজনে।

প্রথমেই চোখে পড়ল টেবিলে পড়ে থাকা নোটটা, যেটা আগের দিন লিখে রেখে গেছে কিশোর।

'আশ্চর্য!' কিশোর বলল। 'কাল আমরা যাওয়ার পরই হয়তো চলে গেছেন মিসেস হ্যামারসন।'

'কিছু হয়নি তো তাঁর?' রবিনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

ঘরে নেই মহিলা। গোলাঘর আর র‍্যাঞ্চের অন্যান্য ঘরগুলোতেও খুঁজল ওরা, পেল না। আবার মূল বাড়িতে ফিরে এল। রান্নাঘরের সিংকে ভেজানো রয়েছে অধোয়া থালাবাসন। দরজার পাশে একটা ঝুড়িতে রাখা কতগুলো কাপড়।

ধরে দেখল কিশোর। 'এখনও ভেজা। কাজ করছিলেন মিসেস হ্যামারসন, তারপর কোন কারণে হঠাৎ চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। চলো, কোরালে দেখে আসি।'

ছাপগুলো প্রথমে রবিনের চোখে পড়ল। 'কিশোর, দেখো, কয়েকটা ঘোড়া এসেছিল।'

হাঁটু গেড়ে বসে ছাপগুলো পরীক্ষা করল কিশোর। মুখ তুলে বলল, 'এসেছে তিনটে ঘোড়া, গেছে চারটে। মিসেস হ্যামারসনই গেলেন নাকি ওদের সঙ্গে?'

আরও ভালমত খুঁজে দেখল ওরা। কিছুদূর একসাথে গিয়ে আলাদা হয়ে গেছে একটা ঘোড়ার খুরের ছাপ। চলে গেছে আরেক দিকে।

'না,' কিশোর বলল, 'মনে হয় তিনজনের সঙ্গে যাননি মহিলা। ওরা চলে যাওয়ার পর, কিংবা আসার আগেই চলে গেছেন কাউকে খবর দিতে। হয়তো স্বামীকেই। কিন্তু রেডিওটেলিফোন ব্যবহার করলেন না কেন? লিভিং রুমেই তো আছে দেখলাম।'

আবার লিভিং রুমে ফিরে এল ওরা। সেটটার দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'রেড বিউটে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগের জন্যে রেখেছেন বোধহয় শেরিফ।'

সুইচ অন করল সে। লাউডস্পিকার নীরব, গুঞ্জন বা আর কোনধরনের শব্দ নেই। মাইক্রোফোনের বোতাম টিপল সে। আগের মতই চুপ করে রইল যন্ত্র। 'অবাক কাণ্ড! টুঁ শব্দও করে না দেখি।'

আবার চেষ্টা করল কিশোর। কাজ হলো না। সুইচ অফ করে ছুরির মাথা দিয়ে কভারের স্ক্রু খুলল। কভার তুলে ভিতরে একবার তাকিয়েই বলল, 'চলবে কী করে? এই দেখো। ওই তিন রেঞ্জারের কাজ। ওরাই নষ্ট করে রেখে গেছে।...আপাতত আর কিছু করার নেই এখানে। চলো, যাওয়া যাক। সময়মত পৌঁছতে না পারলে ট্রেন ধরতে পারব না।'

রেড বিউটে পৌঁছতে দেরি করে ফেলল ওরা। স্টেশন মাস্টার জানালেন,

ট্রেন চলে গেছে। আরেকটা ট্রেন আছে, তবে সেটা এক্সপ্রেস। স্পার গালশে থামবে না। ওখানে যেতে হলে ওদেরকে স্পার গালশের পরের স্টেশনে নেমে হেঁটে ফিরে আসতে হবে।

ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়, তাতে অনেক বেশি সময় লাগবে। সময়মত পৌঁছতে পারবে না ওরা। আর কোন বিকল্প নেই। অগত্যা স্টেশন মাস্টারের দায়িত্বে ওদের ঘোড়াগুলো রেখে এক্সপ্রেস ট্রেনেরই টিকেট কাটল।

তেরো

স্পার গালশ পেরোল ট্রেন।

সামনে কিছুদূর এগিয়েই হঠাৎ করে গতি কমতে লাগল। কমতে কমতে এত কমে গেল, ইচ্ছে করলে নেমে পড়া যায়। সুযোগটা কাজে লাগাল দুই গোয়েন্দা। শূন্য বগি, কেউ নেই ওদের কামরায়। কাজেই কারও কৌতূহলী দৃষ্টি দেখতে হলো না। নেমে পড়ল ওরা। গতি কমার কারণটা বুঝল। সামনে বিপজ্জনক বাঁক। পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে লাইন। একপাশে গভীর খাদ। ওরা যেখানে নামল সেখানে খাদ নেই।

ঘড়ি দেখল কিশোর। মাঝরাতের দেরি নেই আর। রেল লাইন ধরে স্পার গালশের দিকে হাঁটতে শুরু করল দুজনে।

'কিশোর, দেখো,' হাত তুলল রবিন। 'আগুন।

বনের ভিতরে আগুন জ্বলছে।

'এত রাতে কারা ওখানে?' রবিনের প্রশ্ন। 'এ-রকম জায়গায় ক্যাম্প করতে আসবে কে?'

'ভিখিরি-টিখিরি হতে পারে। কিংবা ভবঘুরে।'

'এই,' হঠাৎ থেমে গেল রবিন, 'ডাকাত না তো?'

'ঠিকই বলেছ। হতেও পারে। চলো দেখি।'

সাবধানে, নিঃশব্দে, বনের দিকে এগোল ওরা। গাছের জটলার ভিতরে যেখানে আগুন জ্বলছে, তার কাছেই একটা ঘন ঝোপ। সেটার ভিতর দিয়ে গিয়ে অন্যপাশে উঁকি দিল দুজনে।

আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে আছে বারো-তেরো জন লোক। দুজন খাচ্ছে। অন্যদের খাওয়া মনে হয় শেষ, আগুনের আঁচে শরীর গরম করছে বসে বসে।

কথা বলছে ওরা। গল্প করছে। মাঝে মাঝে কৌতুক করছে এক আধজন, হেসে উঠছে অন্যরা।

ভারি গলায় বলল একজন, 'বস আসছে না কেন এখনও?'

'আর কত বসে থাকব?' বলল আরেকজন। 'নাম্বার সিক্সটি এইটও আসার

সময় হয়ে গেছে।'

'ব্যাটারা রেল ডাকাত!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'আটষট্টি নম্বর ট্রেন আসার অপেক্ষা করছে। ডাকাতি করবে।'

'জায়গামতই এসেছি আমরা। মিস্টার সাইমন নিশ্চয় আশেপাশেই কোথাও আছেন। চলো, আরেকটু এগোই। তাহলে সব কথা শুনতে পাব।'

হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে সামনের আরেকটা ঝোপের দিকে চলল ওরা। কয়েক ফুট গিয়েই হঠাৎ রবিনের হাত টেনে ধরে তাকে থামাল কিশোর। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'বসের কথা বলল, শুনলে? কে ওদের বস? শেলবি কিংবা ফেরেনটি নয় তো?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হতেও পারে।'

সামনের ঝোপটায় ঢুকে ডালপাতার ফাঁক দিয়ে তাকাল দুজনে। ওদের দিকে পিছন করে আছে একটা লোক, ভারি গলায় সে-ই কথা বলছে, 'কয়েকটা বিচ্ছু ছেলে নাকি বড্ড জ্বালাচ্ছে। বস বলল, ওদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ওখানেই গেল কিনা কে জানে। সে-জন্যই হয়তো দেরি হচ্ছে।'

'ধূর, আর কত বসে থাকব!' বিরক্ত হয়ে বলল আরেকজন। 'কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভাগা দরকার। আসল কাজ তো বাকিই এখনও।'

'হ্যাঁ, ক্যাল। মাটি খোঁড়া, পাইপ বসানো, এক মহাঝামেলার ব্যাপার।'

'বস বলল কয়েক হপ্তার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর শুধু টাকা আর টাকা,' ক্যাল বলল।

মুখ খুলতে যাচ্ছিল রবিন, পিছনে মট করে শুকনো ডাল ভাঙতেই চমকে থেমে গেল।

'চুপ!' হুঁশিয়ার করল কিশোর। 'উঠো না। শুয়ে থাকো।'

শুকনো মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল দুজনে। এগিয়ে আসছে ভারি পায়ের শব্দ। ঝোপের কাছে এসে থামল। ধড়াস ধড়াস করছে ওদের বুক। দেখে ফেলল? না মনে হয়। কারণ, ঝোপের পাশ দিয়ে আবার এগোল লোকটা।

থেমে গেল আগুনের ধারের কথাবার্তা।

মুখ তুলল কিশোর। দেখল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল একজন লোক। হাতে চলে এসেছে পিস্তল। ঝোপের দিকে সেটা তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'কে ওখানে?' ধীরে ধীরে এগিয়ে এল কয়েক পা।

উঠে দৌড় দেয়ার কথা ভাবল কিশোর। লাভ হবে না। গুলি খেয়ে মরবে। উঠে আত্মসমর্পণের কথা ভাবছে, এই সময় সামান্য বাঁয়ে ঘুরে গেল লোকটা। আগুনের আলো পড়েছে দুজন আগন্তুকের গায়ে।

'কী ব্যাপার, ক্যাল?' বলল আগন্তুকদের একজন। 'আজকে তোমাকে খুব ভীত মনে হচ্ছে? এত ভয় কীসের?' উঁচু কণ্ঠস্বর লোকটার, জোর করে চেপে রাখতে চাইছে।

তার সঙ্গের লোকটা ছোটখাট এক পাহাড়, যেমন চওড়া কাঁধ, তেমনি বপু।

উঠে এসে দুজনকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই।

আগন্তুকরা কে, আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না দুই গোয়েন্দার। কান পেতে রয়েছে শোনার জন্য।

'ভয় না,' পিস্তলটা হোলস্টারে রাখতে রাখতে বলল ক্যাল। 'বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে গেছি।' সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই আমাদের বস, শেলবি কারমল।'

দ্রুত শেষ হলো হাত মেলানোর পালা। কাজ করার জন্য অধীর হয়ে আছে সকলে।

'এ আমার পুরানো দোস্ত,' মোটা লোকটার কাঁধে হাত রাখল শেলবি, 'টম ফেরেনটি। এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই কাজ করবে। কারও কোন আপত্তি আছে?'

'না আপত্তি কীসের?' ক্যাল জবাব দিল। 'মাল তো আর কম নয়। ভাগে যথেষ্ট পড়বে।'

'ঠিক। প্রচুর আছে। তুলে নিলেই হলো,' হাসল শেলবি। 'তবে ঝামেলা করছে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে। ফসিল শিকারি লোকটা আর নিগ্রো ছেলেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুহায় হাত-পা বেঁধে ফেলে এসেছি...'

রবিনের হাতে হাত রাখল কিশোর। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'মিস্টার কুপার আর মুসাকে পরে বের করে নেয়া যাবে। এখন কোন কথা বোলো না।'

খুব সামান্য নড়াচড়া, কিন্তু এত কাছে থেকে ওটুকুও কান এড়াল না ডাকাতদের। ঝট করে ফিরে তাকাল লম্বা একটা লোক। রুক্ষ, কঠিন চেহারা। বলল, 'কী যেন শুনলাম?'

থমথমে স্তব্ধ নীরবতা। বাতাস বন্ধ। একটা পাতা নড়ছে না।

হঠাৎ হেসে উঠল ফেরেনটি। রাতের নীরবতা খানখান করে দিল যেন তার খসখসে হাসি। প্রতিধ্বনি তুলল বনের গাছে গাছে।

হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে সবাই।

'শেলবি,' তিক্তকণ্ঠে বলল টম, 'ভেবেছিলাম খাঁটি লোক জোগাড় করেছ। কোথায়? এ তো দেখি সব খরগোশের কলজে।'

গুঞ্জন উঠল আউট'লদের মাঝে, ওদের খরগোশের কলজে বলায় রেগে গেছে। গোলমাল বেড়ে হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যাওয়ার আগেই এগিয়ে এসে হাত তুলল শেলবি, 'হয়েছে হয়েছে,' কড়া গলায় বলল সে। 'ওরকম একআধটু রসিকতা হয়ই, অমন মারমুখো হয়ে ওঠার দরকার নেই। এখন কাজের কথা বলি এসো।'

গুঞ্জন থামল।

ক্যাল আর টমকে একপাশে ডেকে নিল শেলবি। ফিসফাস করে কথা বলতে লাগল। অন্যেরা আগুনের ধারে বসে ডাকাতির আলোচনা শুরু করল উঁচু গলায়।

কনুই দিয়ে রবিনের গায়ে গুঁতো দিল কিশোর। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'এই সুযোগ।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছাতে শুরু করল দুজনে। অর্ধেক পথ পিছিয়েছে, এই সময় কানে এল শেলবির গলা, আদেশ দিচ্ছে, 'চুপ করো। চলো। কাজটা শেষ করে ফেলি।'

টর্চ হাতে ঝোপের দিকে এগোল লোকগুলো। দুরুদুরু করছে ছেলেদের বুক। ডাকাতদের চোখে পড়লে আর বাঁচতে হবে না।

চুপ করে মরার মত পড়ে রইল ওরা, 'এ ছাড়া আর কিছু করারও নেই। ঝোপটা ঘন। লোকগুলো উত্তেজিত। কাজের দিকে ওদের মনোযোগ থাকাতেই বোধহয় বেঁচে গেল দুই গোয়েন্দা। ডাকাতদের চোখে পড়ল না।

লোকগুলো বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর বেরোল দুজনে। গাছপালার আড়ালে আড়ালে অনুসরণ করে চলল।

বনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে উপত্যকায় পৌঁছল ডাকাতেরা। খানিক আগে ট্রেন থেকে নেমে ওখান দিয়ে বনে ঢুকেছে দুই গোয়েন্দা। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, ডাকাতেরা কী করে।

মোড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ডাকাতদল। ওপাশে চলে গেল কয়েকজন। ফিরে এল কয়েক মিনিট পরেই। কাঁধে করে বয়ে এনেছে কী যেন।

'কী ওগুলো?' রবিনের প্রশ্ন।

'পুরানো স্লিপার। কী করবে ওগুলো দিয়ে?'

লাইনের ওপর কাঠগুলো আড়াআড়ি রাখল ডাকাতরা। তাতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল শুকনো কাঠ।

এই সময় দেখা গেল, ট্রেন আসছে।

দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল উজ্জ্বল হেডলাইট।

চোদ্দো

আগুন দেখে ব্রেক কষল ড্রাইভার। লাইনে চাকা ঘষার প্রচণ্ড শব্দ তুলে, আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে থেমে গেল রেলগাড়ি। এটা মালগাড়ি। জানালা দিয়ে মুখ বের করল ড্রাইভার। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই, কী হয়েছে?'

'সামনে লাইন ভাঙা,' জবাব দিল এক ডাকাত।

ইতিমধ্যে হুড়মুড় করে ইঞ্জিনে উঠে পড়ল আরও দুজন। ঢুকে গেল ড্রাইভারের কেবিনে। পিস্তল ধরল তার মাথায়।

পিছনে দৌড়ে গেল কয়েকজন ডাকাত। কোন্ বগিতে মাল আছে, জানা আছে ওদের। শাবল দিয়ে পিটিয়ে ভেঙে ফেলল তালা। ভিতরে ঢুকল একজন।

চেঁচিয়ে সঙ্গীদের জানাল, 'এটাতেই মাল।'

মাল নামাতে শুরু করল ডাকাতরা। পাইপ আর নানারকম বাক্স।

মাঝের একটা বগি থেকে লম্বা একজন লোককে চুপিসারে নামতে দেখল দুই গোয়েন্দা। ডাকাতদের চোখ এড়িয়ে নামল। মাথা নিচু করে সোজা দৌড় দিল বনের দিকে।

'মিস্টার সাইমন!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। রবিনের হাত ধরে টানল, 'এসো!'

মিস্টার সাইমন যেদিক দিয়ে বনে ঢুকছেন, ওরাও ছুটল সেদিকে। কাছে পৌঁছে নিচুস্বরে ডাকল রবিন, 'মিস্টার সাইমন!'

থেমে গেলেন মিস্টার সাইমন। 'তোমরা এখানে?'

'স্পার গালশে যাওয়ার জন্যই নেমেছিলাম।' সংক্ষেপে মিস্টার সাইমনকে সব জানাল কিশোর।

'যাক, দেখা হয়ে ভালই হলো,' মিস্টার সাইমন বললেন। 'তোমাদেরকে দরকার হতে পারে ভেবেই খবর দিয়েছিলাম। এই ট্রেন লুট করবে ওরা খবর পেয়েছিলাম আমি। বুঝতে পারিনি কী লুট করবে। কারণ দামী কিছু নেই এটাতে। এসেছি, জিনিসপত্র লুট করে কোথায় নিয়ে যায় দেখার জন্য।'

'দেখার আর দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'জানি কোথায় নিয়ে যাবে। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে। তেল তোলার জন্য।'

'তেল?'

'হ্যাঁ।' তেলের খোঁজ কীভাবে পেয়েছে জানাল কিশোর।

'হুঁ, বুঝলাম।' মাথা দোলালেন মিস্টার সাইমন। 'কুপার আর মুসাকে বের করা যাবে পরেও। আপাতত এই ডাকাতগুলোকে ঠেকানো দরকার। সাহায্য লাগবে।'

'আপনি একা এসেছেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'পটারও এসেছে। আমরা ভেবেছিলাম স্পার গালশে ট্রেন থামাবে ওরা। এখানে থামাবে ভাবিনি। পটারকে বলে এসেছি, পারলে পুলিশকে খবর দিতে। খবর দিয়ে এসে প্লেনে বসে থাকবে। এই জায়গাটা কেন বেছে নিল, বুঝতে পারিনি তখন, অবাক হয়েছিলাম। এখন সব পরিষ্কার। এখান থেকে বনের ভিতর দিয়ে একটা পথ চলে গেছে। পাইপগুলো বয়ে নিতে সুবিধে হবে ওদের।'

'প্লেন নামিয়েছেন কোনখানে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটা সমতল জায়গা আছে, পাহাড়ের ধারে। প্লেন থেকে নেমে হেঁটে গিয়েছি স্পার গালশে। পথে কয়েকটা ডাকাতের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম আরেকটু হলেই। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম একটা ঝোপের মধ্যে। ইনফ্রারেড ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিয়েছি ওদের...'

তাঁর কথা শেষ হলো না। পিছনে শোনা গেল ভারি ইঞ্জিনের গর্জন।

তিন জোড়া আলো দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে তিনটে ট্রাক।

'আরে!' রবিন বলে উঠল। 'ওগুলো কোত্থেকে?'

'শেলবির কাজ,' মিস্টার স্নাইমন বললেন। 'আগেই ব্যবস্থা করে এসেছে। পাইপ আর যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওর জানা ছিল, কোন্ ট্রেনে, কখন ওই যন্ত্রপাতি আসবে। একটা তেল কোম্পানি অর্ডার দিয়েছিল ওগুলোর। ছিনিয়ে নিচ্ছে শেলবি।'

'আমাদের কি কিছুই করার নেই এখন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'আছে। বোকা বানিয়ে শেলবিকে ধরার চেষ্টা করব। তোমরা এখানেই থাকো, ডাকাতদের ওপর চোখ রাখো। পরের ট্রেন আসবে সকাল ন'টায়। ততক্ষণে চলে যাবে ওরা। ট্রেনের গতি এখানে কমাবেই, তখন উঠে পড়বে। রেড বিউটে অপেক্ষা কোরো আমার জন্য। দুপুরে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।'

পকেট থেকে ছোট একটা শিশি বের করলেন তিনি। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'কনসেনট্রেটেড ফুড ট্যাবলেট। রেখে দাও। কাজে লাগবে।'

আর দাঁড়ালেন না মিস্টার সাইমন। ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন। গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চললেন রেল লাইন একপাশে রেখে। সরে এলেন ডাকাতরা যেখানে মাল নামাচ্ছে, তার থেকে দূরে। তারপর ঘুরে এসে উঠলেন লাইনের ওপর। পায়ে পায়ে এগোলেন ট্রেনের দিকে।

ঢাল বেয়ে উঠে গেছে লাইন। মাল নামাচ্ছে কয়েকজন, আর দুজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারকি করছে। রাতের আকাশের পটভূমিতে দুটো স্থির মূর্তি।

'চমৎকার কাজ হয়েছে, টম,' একজনকে বলতে শুনলেন মিস্টার সাইমন। 'কোনও গোলমাল হলো না।'

'তোমার মাথা আছে, সত্যি,' বলল অন্য লোকটা। 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাজ শেষ করে চলে যেতে পারব আমরা।'

নিঃশব্দে আরও কাছে এগোলেন মিস্টার সাইমন। হঠাৎ ডাকলেন, 'শেলবি!'

পাঁই করে ঘুরল দুই ডাকাত। দু'বার ক্লিক ক্লিক করে উঠল মিস্টার সাইমনের ক্যামেরা। টর্চ জ্বলে উঠল টমের হাতে।

গালি দিল শেলবি। পিস্তল বের করে গুলি করল।

সরে গেছেন মিস্টার সাইমন। বুলেট লাগল পাথরে, মুহূর্ত আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

'ভিক্টর সাইমন! সেই টিকটিকিটা!' গর্জে উঠল শেলবি। আবার গুলি করল।

এঁকেবেঁকে ছুটছেন মিস্টার সাইমন। গুলি লাগল না এবারও। প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়লেন একটা ঝোপের ভিতরে।

'টম,' চেঁচিয়ে বলল শেলবি, 'তুমি থাকো এখানে। দেখি টর্চটা দাও। ওই লোকটাকে ধরতেই হবে।'

ইতিমধ্যে বনের ভিতরে ঢুকে পড়লেন মিস্টার সাইমন। দৌড় দিলেন প্লেনের দিকে। মাঝে মাঝে থামছেন। ফিরে তাকাচ্ছেন। শেলবির চোখের আড়ালে চলে যেতে পারেন, যাচ্ছেন না ইচ্ছে করেই। মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছেন। লোকটাকে

দলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে লক্ষ্যবস্তু, অথচ নিশানা স্থির করা যাচ্ছে না দেখে ভীষণ রেগে গেছে শেলবি। ধরতেও পারছে না লোকটাকে।

আধঘণ্টা পর বন থেকে বেরিয়ে এলেন মিস্টার সাইমন। সামনে খোলা জায়গা। প্লেনটা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে ছুটতে ছুটতে ডাকলেন, 'পটার! শেলবি পিছু নিয়েছে। গ্যাস গানটা দিয়ে কভার দাও আমাকে।'

পাইলটের পাশের জানালায় উঁকি দিল একটা মুখ। থমকে গেলেন মিস্টার সাইমন। পটারের পরিচিত মুখ তো নয়! কেবিনের আলোয় দেখা যাচ্ছে পাতলা একটা মুখ। চোখা নাক। কালো মারবেলের মত চোখ। সামনে শত্রু এখন। পিছনেও। শেলবিকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে ফাঁদে পড়েছেন নিজেই।

পনেরো

ডাকাতদের ওপর চোখ রেখেছে কিশোর ও রবিন। মাল নামানো দেখছে। ট্রেনের ড্রাইভার আর তার সহকারীকে আগের মতই আটকে রাখা হয়েছে।

ট্রাকগুলো গিয়ে দাঁড়িয়েছে লাইনের ধারে। ওগুলোতে মাল তোলা হচ্ছে।

তোলা শেষ করে তেরপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো ট্রাকের মাল। প্রতিটি ট্রাকে উঠল দুজন করে লোক। ড্রাইভারের কেবিন থেকে নেমে এল দুই ডাকাত।

ইতিমধ্যে দু'বার গুলির শব্দ কানে এসেছে দুই গোয়েন্দার, ট্রেনের পিছন দিক থেকে। লাইন ওখানে বাঁক নিয়েছে, মোড়ের ওপাশে কী ঘটছে দেখতে পায়নি ওরা। চিৎকার শুনেছে, কথা বোঝা যায়নি। প্রচণ্ড কৌতূহল মনে চেপে যেখানে বসেছিল দুজনে, সেখানেই রয়েছে।

'যাই এবার, নাকি?' ডেকে বলল একটা ট্রাকের ড্রাইভার। 'ওয়াইল্ড-ক্যাট সোয়াম্পে বেন মানচিনি আর রস ম্যাকডোনাল্ডকে মাল বুঝিয়ে দেব। ঠিক আছে?'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। বেন মানচিনিকে চেনে। কিন্তু রস ম্যাকডোনাল্ডটা কে?

'ঠিক আছে,' বলল একজন। বনের ভিতর ঢুকে যেতে লাগল অন্য ডাকতরা।

'কিশোর,' রবিন বলল, 'এভাবে কি শুধু হাত গুটিয়ে বসেই থাকব আমরা?'

'মিস্টার সাইমন তো তাই করতে বললেন।'

'কিন্তু এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না আমার।'

'আমারও না।'

'খুঁতখুঁত করছে মন। চলো। ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে গিয়ে মুসা আর মিস্টার কুপারকে মুক্ত করি। ট্রাকে করে চলে যাব।'

'মিস্টার সাইমনের সঙ্গে দেখা করতে যদি দেরি হয়ে যায়?

'সেটা তখন দেখা যাবে।'

বুনো পথের কিনারে এসে দাঁড়াল ওরা। লুকিয়ে রইল গাছের আড়ালে, ট্রাক আসার অপেক্ষায়। ওরা যেখানে রয়েছে, সেখানে পথ খুব সরু, এবড়োখেবড়ো, তা ছাড়া নীচ থেকে ঢাল বেয়ে উঠতে হয়, গতি কমাতে বাধ্য হবেই মাল বোঝাই ট্রাকগুলো।

প্রথম ট্রাকটা সামনে দিয়ে চলে গেল। কিশোরের অনুমান ঠিক। খুব ধীরে চলছে ওগুলো। দ্বিতীয়টা পেরোল। তৃতীয়টা সামনে দিয়ে পার হয়ে যেতেই পিছন পিছন ছুটল দুজনে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। লম্বা করে বিছিয়ে রাখা পাইপের ওপর শুয়ে তেরপল টেনে দিল গায়ের ওপর।

'ইস্, হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে গেল!' এক সময় বলল রবিন।

কাঁচা রাস্তা। ভীষণ ঝাঁকুনিতে বার বার স্থান পরিবর্তন করছে পাইপগুলো, শুয়ে থাকা আর সম্ভব হলো না। বসতেই কষ্ট হচ্ছে এখন। পাইপের ফাঁকে পা ঢুকে গিয়ে হাড় ভাঙার ভয়ও আছে।

চলছে তো চলছেই, এই দীর্ঘ কষ্টকর যাত্রার যেন আর শেষ নেই। আর থাকতে পারছে না দুজনে। নেমে পড়ার কথা ভাবছে, এই সময় থামল ট্রাক। গন্তব্য কি এসে গেল? কানে এল পিছনের আরেকটা ইঞ্জিনের শব্দ। এগিয়ে আসছে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

'নিশ্চয় হাইওয়ে,' কিশোর বলল।

তার অনুমান ঠিক। তীব্র ঝাঁকুনি লাগল। তারপর মসৃণ গতিতে ছুটতে শুরু করল ট্রাক। ঘুমিয়ে পড়ল দুজনে।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, হঠাৎ চমকে জেগে উঠল রবিন। কিশোরের বাহু খামচে ধরে বলল, 'কিশোর, এই কিশোর, ওঠো। থেমেছে।'

তেরপলের ছোট একটা ফুটোয় চোখ রাখল সে। জানাল, 'একটা কাফে। ড্রাইভার আর সঙ্গীরা নেমে পড়েছে, কাফেতে ঢুকছে। অন্য দুটো ট্রাক আমাদের সামনে।'

পেন নাইফ বের করে ছোট আরেকটা ফুটো করল কিশোর। তাতে চোখ রেখে সে-ও দেখতে লাগল। 'চা খাবে বোধহয়। চলো, এই সুযোগে নেমে গিয়ে পুলিশকে ফোন করি।'

তেরপল প্রায় তুলে ফেলেছে কিশোর, এই সময় বাধা দিল রবিন, 'জলদি তেরপল নামাও! ওরা বেরিয়ে এসেছে!'

ওদের ট্রাকের ড্রাইভারটা তরুণ, তার সঙ্গীরও বয়েস কম। সাথে তৃতীয় আরেকজন লোক রয়েছে এখন। ট্রাকের ড্রাইভার বা হেল্পার নয় লোকটা। কেবিনের দিকে না গিয়ে পিছন দিকে আসতে লাগল ওরা। শঙ্কিত হলো দুই গোয়েন্দা। তাড়াতাড়ি সামনের দিকে সরে গিয়ে কয়েকটা বাক্সের আড়ালে বসে পড়ল।

উঠে গেল তেরপলের পিছন দিকটা। টর্চের আলো পড়ল ভিতরে।

'হ্যাঁ, কাজ হবে এগুলো দিয়ে,' বলল একটা কণ্ঠ। ড্রাইভারের গলা, চিনতে পারল দুই গোয়েন্দা। 'ঠিক মালই এনেছি।'

'সামনের দিকে কী তুলেছে?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন। নিশ্চয় তৃতীয় লোকটা।

ধড়াস করে উঠল ছেলেদের বুক। দেখতে আসবে না তো?

'বাক্স, যন্ত্রপাতি আর ফিটিংস,' জবাব শোনা গেল।

আরও কিছু কথা হলো। ওদের কথা থেকে বোঝা গেল, তৃতীয় লোকটা কাফের মালিক। সে বলল, 'ওহ্‌হো, বলতে ভুলে গেছি, শেলবির মেসেজ এসেছে।'

'এত তাড়াতাড়ি? কী বলেছে?'

'পকেট রেডিওতে কথা বলেছে। শীঘ্রি চলে আসবে সে। তোমাদের জানাতে বলেছে, সে আর ট্যানারি মিলে টিকটিকিটাকে ধরেছে। তার পাইলটটাকেও।'

চমকে উঠল কিশোর ও রবিন। মিস্টার সাইমন ধরা পড়ে গেছেন!

'তাই নাকি?' হেসে উঠল ড্রাইভার। 'খুব ভাল। আর ভাবনা নেই। ওকেই যত ভয় ছিল। পুলিশ আর আমাদের নাগাল পাবে না। শেলবি অবশ্য আগেই বলেছিল, টিকটিকিটাকে ধরবেই।'

'কথা রেখেছে,' শেলবি বলল। 'গোয়েন্দাটার জন্যে ডাক্তার লাগবে। যাও, আর দেরি কোরো না। রওনা হয়ে যাও। বাকি ট্রাকগুলোতে কী আছে দেখে ওগুলোও ছেড়ে দিই।'

ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে কিশোর ও রবিনের। ডাক্তারের কথা বলল কেন ওরা? নিশ্চয় মিস্টার সাইমনের জখম মারাত্মক! সাহায্য প্রয়োজন এখন তাঁর। অথচ ওরা কিছুই করতে পারছে না, আটকে গেছে এখানে।

হাইওয়ে ধরে আবার ছুটল ট্রাক।

রবিন বলল, 'পয়লা সুযোগেই নেমে পড়ব। কোনখান থেকে পুলিশকে ফোন করা দরকার। মিস্টার সাইমনকে বাঁচাতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

তেরপলের ফুটো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল দুজনে। দ্রুত ছুটছে ট্রাক। বাইরে এখনও রাত। কোন বাড়িঘর চোখে পড়ছে না।

হেল্পারের কথা শোনা গেল, 'ওই নাক-ভোঁতা রসটাকে মোটেও বিশ্বাস করি না আমি, বুঝলে। সুযোগ পেলেই বেঈমানী করবে।'

কনুই দিয়ে কিশোরের গায়ে গুঁতো দিল রবিন। 'নাক-ভোঁতা! তারমানে চ্যাপ্টা নাকওয়ালা নকল রেঞ্জারটার কথা বলছে।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, ব্যানি,' ড্রাইভার বলল, 'ওকে ছাড়া চলবেও না আমাদের। সে আমাদের অয়েলম্যান, ওকে ছাড়া তেলই তুলতে পারব না।'

জবাবে ঘোঁৎ করে উঠল তার সহকারী। 'যত যা-ই বলো ওকে পছন্দ হয় না

আমার। বিশ্বাস করতে পারছি না...কখন যে কাকে খুন করে ফেলে... ছেলেগুলোকেও মেরে ফেলতে পারে। দেখো ভাই, খুনখারাপিতে আমি নেই, আগেও বলেছি, এখনও সাফ বলে দিচ্ছি।'

'ছেলেগুলোকে সাবধান করা হয়েছে। এরপরও যদি কথা না শোনে, মেরে ফেলা ছাড়া উপায়ই বা কী?'

জবাবে বিচিত্র একটা শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল হেক্টর। তবে আর তর্ক করল না।

'লোকটাকে তো অত খারাপ মনে হচ্ছে না,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'এই লোক ডাকাতের দলে মিশল কী করে?'

গতি কমছে ট্রাকের। মোড় নিয়ে একটা সাইডরোডে নামল। আবার কাঁচা রাস্তা। টায়ারের নীচে খড়খড় করছে আলগা পাথর। ঝাঁকুনির চোটে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসা দায়।

আরামে বসা শেষ। বাক্সের কাছ থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো দুই গোয়েন্দা।

হঠাৎ কীসে যেন লাগল চাকা, পাথরের চাঁই কিংবা টিলা-টক্করে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে প্রায় উল্টে যাওয়ার অবস্থা হলো গাড়ির।

'এই, দেখে চলো।' চেঁচিয়ে উঠল হেক্টর। 'এটাকেও হাইওয়ে ভাবছ নাকি?'

'দেখেই চলছি। এখনও দশ মাইল যেতে হবে। যা রাস্তা, ওটুকু যেতেই অনেকক্ষণ...'

'লাগলে লাগবে। অত তাড়া কীসের?'

আবার দুলে উঠল ট্রাক। কাত হয়ে যাচ্ছে একপাশে।

'অ্যাই, গর্তে পড়ে যাচ্ছে তো!' আবার চিৎকার করে উঠল হেক্টর।

'চুপ করো তো! তোমার জ্বালায় গাড়ি চালানোও...'

কথা শেষ হলো না তার। সামান্য সোজা হয়েছিল, আবার কাত হয়ে যাচ্ছে গাড়ি। একপাশে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে পাইপগুলো। নিশ্চয় খাদে পড়ছে ট্রাক! ভয় পেয়ে গেল কিশোর ও রবিন। ট্রাক উল্টে গিয়ে গায়ের ওপর পাইপ পড়লে মরবে।

ষোলো

'দিলে তো সর্বনাশ করে!' ড্রাইভারের ধমক শোনা গেল।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

লাফিয়ে উঠে ক্রস ব্রেইস ধরে ঝুলে পড়ল দুজনে। একপাশ থেকে আরেক পাশে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে বড় বড় পাইপ।

কাত হয়ে আছে ট্রাকটা। ইঞ্জিন বন্ধ।

'অ্যাই, চিৎকার শোনা গেল না?' আবার সেই ড্রাইভারের কণ্ঠ। 'নিশ্চয়ই ট্রাকের পিছনে আছে কেউ।'

'দূর। ভুল শুনেছ,' বলল তার হেল্পার।

'আমি ঠিকই শুনেছি। দাঁড়াও দেখে আসি।'

তেরপলের তলা থেকে বেরিয়ে একলাফে রাস্তায় পড়ল দুই গোয়েন্দা। গড়িয়ে চলে এল ট্রাকের নীচে।

কেবিন থেকে নামল ড্রাইভার। ট্রাকের পাশ দিয়ে এগোল পিছন দিকে। তার পা দেখতে পাচ্ছে দুজনে। টেইলবোর্ডের ওপর দিয়ে ঝুঁকে তেরপল তুলে দেখতে লাগল লোকটা। হাত বাড়ালেই ওর পায়ের নাগাল পাবে রবিন।

সুযোগটা হাতছাড়া করল না সে। লোকটার দুই পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। চিত হয়ে রাস্তায় পড়ল লোকটা, 'হুঁক' করে বিচিত্র একটা শব্দ বেরোল মুখ দিয়ে। জোরে মাথা ঠুকে গেল পাথরে। হাতের টর্চ উড়ে গেল একদিকে, পিস্তল আরেক দিকে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ।

হাত লাগাল কিশোর। দুজনে মিলে টেনেটুনে লোকটাকে ট্রাকের নীচে নিয়ে এল।

'কিছু পেলে?' বলতে বলতে নামল হেল্পার।

জবাব না পেয়ে পিছন দিকে এগোল দেখার জন্য। ড্রাইভারের মত একইভাবে টেইলবোর্ডের ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। রবিনের মত একই কায়দায় তার পা ধরে টান দিল কিশোর। পথের ওপর চিত হয়ে পড়ল এই লোকটাও, তবে তার মাথার নীচে পাথর পড়ল না, ফলে বেহুঁশও হলো না। ততক্ষণে ট্রাকের নীচ থেকে বেরিয়ে পড়েছে রবিন। একটা পাথর তুলে লোকটার মাথায় বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলল।

'কী করব এখন এদের?' ভুরু নাচাল রবিন।

'জানি না। তবে কিছু একটা করা দরকার, জলদি। ওই দেখো।'

দূরে দেখা যাচ্ছে দুটো আলো, নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয় আরেকটা ট্রাক।

'ধরো,' কিশোর বলল, 'টেনে ওদেরকে ঘাসের মধ্যে নিয়ে যাই।'

পথের পাশে লম্বা ঘাস। পা ধরে টেনে লোক দুটোকে তার মধ্যে নিয়ে এল ওরা। রাস্তা থেকে আর সহজে দেখা যাবে না।

'এবার কী? দৌড় দেব?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'না,' মনে মনে অন্য ফন্দি আঁটছে কিশোর। 'পিছনের ট্রাকটাকে থামানো চলবে না। এ দুজনের টুপি পরে নেব আমরা। মুখের ওপর টেনে দিলে অন্ধকারে আর চিনতে পারবে না আমাদের।'

'হুঁ।'

'আমি কেবিনে গিয়ে বসছি। তুমি তেরপল বাঁধার ভান করো। ওরা পাশ

দিয়ে যাওয়ার সময় হাত নাড়বে। যেন মনে করে আমরা ওদেরই লোক।'

কাছে এসে গেছে ট্রাক। প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছে আলো। তাড়াহুড়ো করল না কিশোর, ধীরে সুস্থে গিয়ে কেবিনে উঠল। বাঁ হাত নেড়ে পিছনের ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করল সে। রবিন তেরপল বাঁধায় ব্যস্ত।

দীর্ঘ টানটান উত্তেজনার কয়েকটা মুহূর্ত। কী ঘটবে কিছুই বোঝার উপায় নেই। গতি কমাল না পিছনের ট্রাকটা। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে কী যেন বলল ড্রাইভার, বোঝা গেল না।

যাক, চালাকিটা কাজে লেগেছে। কেবিন থেকে নেমে এল কিশোর। রবিনকে বলল, 'এ দুটোকে বেঁধে ফেলা দরকার। জেগে উঠলেই গোলমাল শুরু করবে।'

তেরপল বাঁধার দড়িটা খুলে ওটা দিয়ে প্রথমে ড্রাইভারের হাত-পা বাঁধল ওরা। লোকটার জ্ঞান ফিরে এল। গুঙিয়ে উঠল সে। তার মুখে কাপড় গুঁজে দিল রবিন।

'আরও দূরে সরাতে হবে,' কিশোর বলল। 'নইলে গড়িয়ে গড়িয়ে পথের ওপর চলে আসতে পারে।'

ধরাধরি করে লোকটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের জটলার মধ্যে ফেলল ওরা।

'দড়ি তো আরও আছে,' রবিন বলল। 'হেল্পারটাকে কী করব?'

'বুঝতে পারছি না,' দ্বিধায় পড়ে গেছে কিশোর। 'ব্যানির কথাবার্তায় মনে হলো, ডাকাতদের ওপর বিরক্ত সে। ওকে দিয়ে...' কথা শেষ না করেই রাস্তায় ফিরে চলল সে।

এসে দেখল নড়াচড়া শুরু করেছে ব্যানি। হুঁশ ফিরছে। ওর পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়ে বসে রইল কিশোর।

'কী হয়েছে?' গুঙিয়ে উঠল ব্যানি। হাত চলে গেছে কানের পিছনে, যেখানে বাড়িটা খেয়েছে। ব্যথা করছে। চোখ মেলল। মাথার ভিতরে ঘোলাটে ভাবটা দূর হলো। 'তোমরা?'

'আপনার বস যে ডিটেকটিভকে ধরে আটক করেছে,' রবিন বলল, 'আমরা তাঁর লোক।'

'ও, তোমরাই সেই গোয়েন্দা!'

'হ্যাঁ।'

ব্যানি,' কিশোর বলল, 'আপনি ওদের মত খারাপ লোক নন, বুঝতে পারছি। ডাকাতদের দলে আর থাকতে চান না, তা-ও বুঝেছি।'

'আমাদের সাহায্য করবেন?' রবিন বলল।

'কীভাবে? ব্যানির কণ্ঠে সন্দেহ। 'আর তাতে আমার কী লাভ?'

'লাভ আছে,' জবাব দিল কিশোর। 'হয়তো জেলে যাওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। আমরা আপনার পক্ষে সুপারিশ করব।'

'শেলবিরা আবারও জেলে যাবে, কোন সন্দেহ নেই,' বলল রবিন। 'যে কাণ্ড শুরু করেছে ওরা, বেশিদিন আর বাঁচতে পারবে না। পুলিশ ওদের ধরবেই। ওদের সঙ্গে থাকলে আপনারও নিস্তার নেই।'

চুপ করে আছে ব্যানি। কিশোরদের দিক থেকে চোখ সরাল। ওদের কথা মেনে নেয়া ঠিক হবে কিনা ভাবছে বোধহয়।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তোমরা,' অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। 'এটাই আমার সুযোগ। কোন্ কুক্ষণে যে শেলবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল...টাকার লোভও এড়াতে পারলাম না! তবে জেলে যাওয়ার মত কিছু করিনি এখনও।' কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে বলল, 'তোমাদের বয়েসী দুটো ভাই আছে আমার। ইস্কুলে পড়ে। ওদের লেখাপড়ার খরচ জোগানোর জন্যেই...যাকগে ওসব কথা। তা কী সাহায্য করতে পারি তোমাদের?'

এত সহজে কাজ হয়ে যাবে আশা করেনি কিশোর। লোকটাকে উঠে বসতে সাহায্য করল ওরা।

'ডিটেকটিভের নাম মিস্টার সাইমন, জানেন?...যা-ই হোক,' কিশোর বলল, 'কাফের লোকটার কাছে খবর পাঠিয়েছে শেলবি, মিস্টার সাইমনের জন্যে নাকি ডাক্তার দরকার। নিশ্চয় জখম হয়েছেন তিনি। তাঁকে এখন খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা, শেলবি কোথায় বলতে পারেন?'

'মনে হয় কাফেতে। মাল নামিয়ে দিয়ে ওখানেই গিয়ে তার সঙ্গে আমাদের দেখা করার কথা।'

'গিয়ে খোঁজ নিতে পারবেন, মিস্টার সাইমন ওখানে আছেন কিনা? তারপর পুলিশকে জানাবেন।'

'বোধহয় পারব।'

'কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস কী?'

'বিশ্বাস করতে পারো। জেলে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

আলোচনায় ঠিক হলো, ট্রাকটা নিয়ে সোয়াম্পে চলে যাবে ছেলেরা। হেঁটে কিংবা অন্য একটা গাড়ি ধরে যেভাবেই হোক কাফেতে ফিরবে ব্যানি।

তার পিস্তলটা ফিরিয়ে দিল কিশোর। ট্রাকে উঠল। রবিন উঠে বসল পাশে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল কিশোর।

'দলের কতটা কাছাকাছি যাবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বেশি কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। যন্ত্রপাতিগুলো কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চায় ওরা, সেটা দেখতে পারলেই যথেষ্ট।'

'তারপর গুহায় ঢুকে মুসা আর মিস্টার কুপারকে মুক্ত করব। তাই তো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। খাদে পড়েনি ট্রাক। একটা ঢিবিতে উঠে গিয়েছিল একপাশের চাকা, তাই অন্যপাশে কাত হয়ে গিয়েছিল। পিছিয়ে এনে গাড়িটাকে আবার সোজা করল সে।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে আবার এগিয়ে চলল ট্রাক।

এরপর আর বিশেষ কোন কথা হলো না। নীরবে ট্রাক চালাল কিশোর। চুপ করে বসে বাইরে তাকিয়ে রইল রবিন।

অনেকক্ষণ পর দূরে আলো চোখে পড়তে গতি কমাল কিশোর। 'নিশ্চয় ওখানে মাল নামাচ্ছে,' বলল সে। 'মনে হয় ঢালের ওপরে, আমরা যেখানে খুঁড়েছি তার উল্টো দিকে।'

আরও এগোল ট্রাক। ওরা দেখতে পেল, কয়েকটা ঝোপের কিনারে পাইপ আর বাক্স নামাতে ব্যস্ত কিছু লোক। এদিকে ফিরেও তাকাল না কেউ। ইঞ্জিনের শব্দ বোধহয় শোনেনি, কিংবা শুনলেও কেয়ার করছে না। আরেকটা ট্রাক যে আসবে জানাই আছে ওদের।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল কিশোর।

'পালানোর এটাই সুযোগ,' রবিন বলল।

নিঃশব্দে নেমে ঝোপের আড়ালে ঢুকে গেল দুজনে।

পুব আকাশে আলোর আভাস। ভোর হচ্ছে। ঝোপের আড়ালে আড়ালে সরে চলে এল ওরা। তারপর পাহাড়ের ফাঁকের গলিঘুপচি ধরে ফিরে চলল সোয়াম্পে। কাছাকাছিই কোথাও ক্যাম্প করেছে ডাকাতরা, ওদের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেক ঘুরে দূর দিয়ে এগোচ্ছে দুজনে।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রবিন। ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছে। 'কিশোর, মাল খালাস শেষ করে ফেলেছে নিশ্চয়,' বলল সে। 'ফিরে যাচ্ছে ওরা।'

'ওদের আগে ব্যানি কাফেতে পৌঁছুতে পারলে হয় এখন। একটা ট্রাকের ড্রাইভার আর হেল্পার যে নিখোঁজ হয়েছে জানতে দেরি হবে না ওদের।'

দ্রুত পা চালাল দুজনে। অনেক ঘুরে শেষে এসে দাঁড়াল ফসিল উপত্যকায়। যেখানে খুঁজে পেয়েছে উটের ফসিলটা।

সুড়ঙ্গমুখটা যেখানে থাকার কথা সেখানে এসে দেখতে পেল না রবিন। 'আরে! গেল কই? না না, আছে। বালি আর পাথর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।'

'কারও চোখে যাতে না পড়ে সেজন্যে,' কিশোর বলল। 'অন্য মুখটাও বন্ধ থাকলে...'

গুহামুখের কাছে দৌড়ে গেল ওরা। ওটাও একইভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

'নাহ্, জটিল করে ফেলল কাজটা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'কোনটা থেকে শুরু করব? সুড়ঙ্গমুখটাই সহজ হবে, কি বলো?'

পাথর সরাতে শুরু করল দুজনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘেমে চুপচুপে হয়ে গেল জামা-কাপড়। কঠোর পরিশ্রমের পর অবশেষে মুক্ত করল সুড়ঙ্গমুখ।

ঢুকল দুজনে। আগে রয়েছে কিশোর। তার হাতের টর্চের আলো গিয়ে পড়ল গুহার অন্যপাশের দেয়ালে। ডাক দিল সে। 'মুসা? মিস্টার কুপার?'

জবাব নেই।

'মুসা, কোথায় তোমরা?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

সাড়া নেই।

শঙ্কিত হলো দুজনে। টর্চের আলো ফেলে খুঁজে বেড়াতে লাগল গুহার ভিতরে।

কিশোর বলল, 'গুহাটার আরও কোন পথ আছে। অন্য কোন গুহায়...' চাপা গোঁ গোঁ শুনে থেমে গেল সে। গুহার দূরতম প্রান্তে শব্দ লক্ষ্য করে একটা পাথরের চাঁইয়ের দিকে আলো ফেলল। একপাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকতে দেখল একজোড়া পা।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেল চাঁইটার কাছে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে মুসা ও কুপার। মুখে কাপড় গোঁজা।

ধরাধরি করে ওদেরকে তুলে গুহার মাঝখানে নিয়ে এল দুজনে।

'কিশোর, আমি মুখের কাপড় খুলছি,' রবিন বলল। 'তুমি হাত খোলো।'

মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দিয়ে তার ওপর রুমাল বাঁধা হয়েছে। যাতে কথা বলতে না পারে বন্দিরা। ছুরি দিয়ে রুমাল কেটে মুখের কাপড় টেনে বের করল রবিন। কাপড় খোলার পরেও ঠিকমত কথা বলতে পারল না মুসা ও কুপার। বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থেকে থেকে, না খেতে পেয়ে ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে শরীর।

বাঁধন খোলা হলো। ফুলে উঠেছে বেঁধে রাখা জায়গাগুলো। কিশোর আর রবিন ম্যাসাজ করে দিতে লাগল। মুসা ও কুপারের হাত-পায়ের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হলো আবার।

কয়েকটা ফুড ট্যাবলেট বের করে মুসার হাতে দিল কিশোর। বলল, 'খেয়ে ফেলো। বল পাবে।' কুপারের হাতেও দিল কয়েকটা।

মিনিট কয়েক পরেই স্বাভাবিকভাবে কথা বলার শক্তি পেল মুসা ও কুপার। জানাল ওদের বন্দি হওয়ার কাহিনি।

শুনতে শুনতে রাগে জ্বলে উঠল কিশোর ও রবিন।

'বেঁধে রেখে তো গেলই,' কুপার বললেন, 'তারপরেও বোধহয় নিশ্চিন্ত হতে পারল না। আবার ফিরে এল গুহার মুখ বন্ধ করে দিতে।'

'বেন শয়তানটাকে আমি একবার সামনাসামনি পেতে চাই!' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। 'তারপর দেখাব...'

'এখন শান্ত হও,' রবিন বলল। 'বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের। আবার ধরা পড়লে সবাইকে খুন করবে।'

নিরাপদেই সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে এল চারজনে। উপত্যকায় এখন ভোরের সোনালি রোদ। দীর্ঘ সময় অন্ধকারে থেকে, আলোয় বেরিয়ে চোখ মেলতে পারছে না মুসা ও কুপার।

'কিশোর,' রবিন বলল, 'ওদের যা অবস্থা, হাঁটতে পারবে না।' মুসার দিকে ফিরল। 'ঘোড়া কোথায় তোমাদের?'

'এখানেই বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম। নেই যখন, তারমানে ডাকাতেরা নিয়ে গেছে।'

সতেরো

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। বিপদটা আন্দাজ করতে পারছে। 'তোমরা এগোও,' কুপার বললেন। 'রেড বিউটে যাবে তো? তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও। আমরা আস্তে আস্তে আসি।'

'যা পথ,' কিশোর বলল. 'ঘোড়ায় চড়ে যেতেই কষ্ট হয়। আপনাদের পক্ষে হাঁটা অসম্ভব।'

খচ্চরের কথা মনে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন. 'আমাদের খচ্চরটাকে বনের ভিতর বেঁধে রেখেছিলাম। ডাকাতদের চোখে না পড়লে নিশ্চয় এখনও ওখানেই আছে। ওটা নিয়ে আমি রেড বিউটে চলে যেতে পারি। ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসব।'

'তারচেয়ে শেরিফের কাছে চলে যাও,' কুপার বলল। 'তাঁকে গিয়ে সব জানাও।'

'শেরিফের কোন খবর নেই,' কিশোর জানাল। 'কী যে হয়েছে তাঁর তা-ও বুঝতে পারছি না। তবে গিয়ে দেখতে পারি, ফিরেছেন কিনা। মিসেস জোনসের সঙ্গে এখনও দেখা করা হলো না।'

মুসা আর কুপারকে রেখে ক্যাম্পে ফিরে এল কিশোর ও রবিন।

জায়গামতই আছে খচ্চরটা। আরামে ঘাস-পাতা চিবুচ্ছে। ওটার পিঠে একটা কম্বল বিছিয়ে দুজনেই উঠে বসল।

ভার বইতে পারার সুনাম আছে খচ্চরের। সেটাই প্রমাণ করে দিল এই জানোয়ারটা।

নড়তে চাইল না প্রথমে। কিশোরের জুতোর ডগার জোর খোঁচা খেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রওনা হলো।

এগিয়ে চলল বটে, কিন্তু নিজের ইচ্ছেমাফিক। ডানে মোড় ঘোরানোর অনেক চেষ্টা করেও ঘোরানো গেল না। এগিয়ে চলেছে জলাভূমির দিকে।

'যায় না কেন?' অধৈর্য হয়ে বলল রবিন।

'আমার মনে হয় ওদিকে নিয়ে নিয়ে অভ্যাস করিয়ে ফেলেছে,' কিশোর বলল। 'আমরা যখন ছিলাম না, এটার পিঠে চেপেছে কেউ। আর বাধা দেব না, দেখি কোথায় যায়। নতুন কোন সূত্রও পেয়ে যেতে পারি।'

জানোয়ারটাকে নিজের ইচ্ছেয় চলতে দেয়া হলো। সোজা গিরিসঙ্কটের দিকে এগোল ওটা। গিরিসঙ্কট পেরোল, তারপর এসে থামল যেখানে উটের ফসিলটা আছে তার কিছুটা ওপরে।

'কী বুঝলে?' রবিনের প্রশ্ন।

লাফ দিয়ে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে রবিনকেও নামতে ইশারা করল কিশোর। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল দুজনে।

'আমরা যাওয়ার পর কেউ খুঁড়েছে!' কিশোর বলল। 'দেখো, একটা সাইনবোর্ডও লাগিয়েছে।'

সাইনবোর্ডে লেখা:

বিপদজনক জায়গা
বিস্ফোরক পোঁতা আছে এখানে
দূরে থাকুন

'বাহ্! মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার ভাল কায়দাই বের করেছে,' রবিন বলল।

'কে জানে, বিস্ফোরক হয়তো সত্যিই পুঁতেছে। পরীক্ষা করতে গিয়ে মরতে চাই না। মুসাদেরও সাবধান করে দেয়া দরকার।'

আবার খচ্চরে চাপল দুজনে। মুখ ঘোরানোর ইঙ্গিত করতেই ক্যাম্পে ফিরে চলল জানোয়ারটা।

কিশোর বলল, 'এখন আমি শিওর, ব্যবহার করা হয়েছে এটাকে। ক্যাম্পে ফিরে চলেছে কেমন দেখো।...ডিনামাইট বইয়েছে কিনা কে জানে!'

'বওয়াতেও পারে।'

ওরা ক্যাম্পে ফিরবার খানিকক্ষণ পরেই মুসা এল। কুপারও আছেন সঙ্গে।

'কী হলো, ফিরে এলে যে?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'দেখলাম খচ্চরটা নিয়ে যাচ্ছো, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি...'

কেন ফিরে এসেছে, জানাল কিশোর। সাবধান করে দিল মুসাকে, যাতে ওদিকে না যায়। রবিনকে বলল, 'আবার দেখি চেষ্টা করে, যেখানে নিতে চাই, যায় কিনা খচ্চরটা।'

আবার খচ্চরে চড়ল দুজনে। কিছুদূর এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল জানোয়ারটা। আগেরবারের মতই।

'আবার শুরু করেছে!' খচ্চরটাকে ডানে ঘোরানোর চেষ্টা করতে করতে হিমশিম খেয়ে গেল কিশোর। কোনই ফল হলো না।

'নাহ্, হেঁটেই যেতে হবে দেখছি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু শেরিফের র‍্যাঞ্চ তো অনেক দূর।...দাঁড়াও তো দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে।' লাফ দিয়ে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে লম্বা একটা ডাল ভাঙল সে। ডালের মাথায় কয়েক গোছা কচি পাতা। রবিনকে বলল, 'মজার একটা বাংলা কবিতা আছে এক যে ছিল সাহেব তাহার, গুণের মধ্যে নাকের বাহার...কবিতার সারাংশ হলো, এক ইংরেজ সাহেবের একটা গাধা আছে। বেয়াড়া গাধাটাকে কোনমতেই সামলাতে না পেরে শেষে লম্বা নাকের ডগায় মুলো ঝুলিয়ে দেয় সাহেব। সেই মুলো ছুঁতেও পারে না গাধাটা, কিন্তু ধরার লোভে এগোতে থাকে।'

'বাহ্, সত্যিই মজার কবিতা,' রবিন বলল।

ডাল নিয়ে খচ্চরের পিঠে চড়ে পাতাগুলো ওটার নাকের কাছে ধরল কিশোর।

খাওয়ার জন্য জিভ লম্বা করে দিল জানোয়ারটা। পাতাগুলো ওটার নাগালের বাইরে রাখল সে।

সত্যিই কাজ হলো। পাতার লোভে এগিয়ে চলল খচ্চর। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই থেমে গেল। ডানে মাথা ঘোরাল। তাড়াতাড়ি ডালের পাতাগুলো বাঁয়ে ঘোরাল কিশোর। একটা পাতা ছেঁড়ার সুযোগ দিল খচ্চরটাকে। চিবুতে শুরু করল ওটা। গিলে নিয়ে আরেকটার জন্য জিভ বের করল। আর দেয়া হলো না। এগিয়ে চলল আবার খচ্চর। কয়েক পা গিয়ে থেমে গেল। আবার একটা পাতা দেয়া হলো।

এভাবে থেমে-চলে, থেমে-চলে অন্য রাস্তায় সরিয়ে আনা হলো ওটাকে। অচেনা পথে এসে আর ততটা বেয়াড়াপনা করল না, যেদিকে নেয়া হলো সেদিকেই গেল।

*

ওদিকে ক্যাম্পে বসে আছে মুসা আর কুপার। গুহা থেকে হেঁটে আসার সময়ই বুঝেছে, ঘোড়া ছাড়া চলা ভীষণ কঠিন ওদের জন্য।

তাঁবুর সামনে বসে থেকে কী করা যায় ভাবতে লাগল।

হঠাৎ পাহাড়ের ওপর একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল মুসার। বলল, 'দেখলেন, সার?'

'কী?'

'কিছু একটা দেখেছি।' উঠে দাঁড়াল সে।

কুপার বললেন, 'চলো, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।'

ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল দুজনে। কয়েক পা উঠে, তারপর বসে জিরিয়ে নেয়। আবার ওঠে। আবার বসে। এ রকম করতে করতে চলে এল কতগুলো পাইন গাছের কাছে। নড়াচড়াটা এখানেই কোথাও দেখেছে মুসা। তিন-চার পা এগিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'বলেছিলাম না, দেখেছি! আমাদের ঘোড়া! এখানে এনে বেঁধে রেখেছে!'

পাইনের জটলার কাছে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ঘোড়া দুটো।

'যাক, বাঁচা গেল,' হাঁপ ছাড়লেন কুপার। 'যেতে আর কোন অসুবিধে নেই এখন আমাদের। চলো, প্রথমে জোনসদের বাড়িতে যাই।'

ঘোড়ায় চড়ে কয়েক মিনিটেই নীচে নেমে এল দুজনে। এগিয়ে চলল পাহাড়ী পথ ধরে।

*

আবার বেয়াড়াপনা শুরু করেছে কিশোরদের খচ্চরটা। নিজের ইচ্ছেমত চলে আর থামে। কচি পাতার লোভ দেখিয়েও আর তেমন কাজ হচ্ছে না। কবিতার সাহেবের গাধাটার চেয়ে এটা অনেক বেশি পাজি আর অলস। তবে হাল ছাড়ল না কিশোর। বরং জেদ চেপে গেল তার। বেয়াড়া খচ্চরকে নিয়েই ছাড়বে।

'ধূর!' বিরক্ত হয়ে রবিন বলল, 'এটাকে এনেই ভুল করেছি। হেঁটে এলেও

এরচেয়ে তাড়াতাড়ি আসতে পারতাম।'

'না, পারতাম না। এই পাথর আর বালুর মধ্যে হাঁটতে কষ্ট আরও অনেক বেশি হতো।'

তিন ঘণ্টা পর র‍্যাঞ্চের দেখা পাওয়া গেল অবশেষে।

'এলাম তো,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'শেরিফকে পেলেই হয় এখন।'

'আমার পানি খেতে হবে,' রবিন বলল। 'গলা শুকিয়ে গেছে, কথা বেরোতে চাইছে না।'

গোলাঘরের পিছনে খচ্চরটাকে বেঁধে র‍্যাঞ্চহাউসের দরজায় এসে দাঁড়াল দুজনে।

'কেউ আছেন?' ডাক দিল রবিন।

জবাব নেই।

'আগের মতই অবস্থা,' দরজায় ঠেলা দিল কিশোর।

টেবিলে পড়ে আছে নোটটা, যেমন দেখে গিয়েছিল ওরা। রান্নাঘরে সিংকে ভিজানো বাসনপেয়ালা, দরজার পাশে রাখা ঝুড়িতে কাপড়গুলো তেমনি পড়ে আছে।

'শেরিফ তো এলেন না। এখন কী করব?' রবিনের প্রশ্ন। 'রেড বিউটে যাব?'

'যাব, তবে খোলা অঞ্চল দিয়ে। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গিয়ে ডাকাতের খপ্পরে পড়তে চাই না।'

লিভিং রুমে ফিরে এল আবার দুজনে।

'আরে, রেডিওটা কই?' ভুরু উঁচু হয়ে গেল রবিনের।

কোথাও রেডিওটা না দেখে কিশোর বলল, 'তারমানে আবার কেউ ঢুকেছিল এখানে। নিয়ে গেছে।'

কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। তাড়াতাড়ি এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ওরা। এদিকেই ছুটে আসছে সবুজ ইউনিফর্ম পরা তিনজন ঘোড়সওয়ার।

'বোধহয় সেই তিন রেঞ্জার!' কিশোর বলল। 'চলো, ভাগি।'

রান্নাঘর দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। ভেজিয়ে দিল দরজাটা। চলে এল কোরালে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখল তিনজনের একজন খাটো, রগ-ফোলা, কুতকুতে চোখ। বেন মানচিনি! চ্যাপ্টা-নাক লোকটাও আছে, রস ম্যাকডোনাল্ড।

কাছে চলে এল ওরা। শেরিফের ঘরের দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসি হাসল বেন। বলল, 'শেরিফকে সরিয়ে দেয়ার বুদ্ধিটা ভালই বের করেছিলে, রস। শুয়ে শুয়ে নিশ্চয় এখন গোঁফে তা দিচ্ছে শেরিফ।'

'সরানোর কথাটা অবশ্য তোমার মাথায়ই এসেছিল প্রথমে। টাওয়ারে গিয়ে ওকে খোঁজার কথা কল্পনাও করবে না কেউ।'

কিশোরের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিল রবিন। ফিসফিসিয়ে বলল, 'কোন টাওয়ারের কথা বলছে?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই আবার শোনা গেল বেনের কথা, 'বেশি দেরি

করা যাবে না। কাগজগুলোতে সিল মারা শেষ করেই ভাগতে হবে। সিল মারলে আর জাল মনে হবে না দলিলগুলোকে, হাহ্,হাহ্... আরে, কে আসছে আবার?...জোনসদের ছেলেটা না! খোলো খোলো, ইউনিফর্ম খুলে ফেলো। এমন ভাব দেখাবে, যেন শেরিফের জন্য অপেক্ষা করছ। আমি গোলাঘরে লুকাচ্ছি।'

দ্রুত রেঞ্জারের ইউনিফর্ম খুলে আবার কাউবয় হয়ে গেল রস আর তার সঙ্গী। কাপড়গুলো নিয়ে গোলাঘরে চলে গেল বেন।

মিনিট কয়েক পরে ঢাল বেয়ে উঠে এল রিকির ঘোড়া। তার দিকে হাসিমুখে তাকাল রস।

'শেরিফের কাছে এসেছি,' রিকি বলল। 'সাহায্য দরকার।'

'আমরাও তার জন্যেই অপেক্ষা করছি,' রস বলল। 'তা, অসুবিধেটা কী তোমাদের? কী হয়েছে?'

মুঠো শক্ত করে ফেলল কিশোর। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল: খোদা! আর একটা কথাও না বলুক...

কিন্তু বলে ফেলল রিকি, 'দু'দিন আগে দুটো ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার। ওরা আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আমাদেরকে সাহায্য করবে বলেছিল। কিন্তু তারপর আর আসেনি। ডেভিল'স সোয়াম্পের কাছে ক্যাম্প করেছিল। এখন নিখোঁজ। ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্যই শেরিফের কাছে এসেছি।'

'ওরা গোয়েন্দা, তাই না?' রস বলল, 'ওদের আর পাবে না। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলল, বাড়ি চলে যাচ্ছে। রকি বিচে থাকে। খুঁজতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবে।'

রসের মুখে কিশোর ও রবিনের খবর শুনে অবাক হলো রিকি। তবে নিরাশ হলো না। 'ওরা গেছে যাক। আমার শেরিফকে দরকার।'

'তোমার কথা বলব ওকে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? শেরিফ এলেই তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে বলব।'

'আচ্ছা।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে কোরালের দিকে এগোল রিকি। পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

'এটাই সুযোগ,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে এক কোণে সরে এল সে। রিকি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিচু কণ্ঠে বলল, 'খবরদার, এদিকে তাকিয়ো না। এমন ভাব করো, যেন কিছুই দেখনি। তোমার সঙ্গে কথা আছে। একটা বুদ্ধি বের করো।'

রবিনকে দেখেই শক্ত হয়ে গিয়েছিল রিকি। তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য। মুহূর্তে সামলে নিল। ঘোড়া থেকে নামল। ইচ্ছে করে জিনটা কাত করে ফেলল নামার সময়। ঠিক করার ছুতোয় সময় কাটাতে লাগল।

'রেড বিউটে গিয়ে পুলিশ ডেকে আনতে হবে তোমাকে,' রবিন বলল।

'এইমাত্র যাদের ঘরে দেখে এলে ওরা ডাকাতদলের লোক। ঠকিয়ে, জালিয়াতি করে তোমাদের জমি দখল করতে চায়। শেরিফকে টাওয়ারে আটকে রেখেছে। জলদি চলে যাও পুলিশের কাছে।'

একবারের জন্যও কোরালের দিকে ফিরল না রিকি। বুদ্ধি আছে। জিনটা ঠিক করে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠল। ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে গেল ঢাল থেকে। তীব্র গতিতে ছুটল মাইলখানেক। তারপর সামনে দুজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখে গতি কমাল।

কাছে এল ওরা। দুজন দু'পাশে এসে থামল। একজন ধরল রিকির ঘোড়ার রাশ।

'এই ছেলে,' দুজনের মাঝে লম্বা লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'এত তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছ?'

'শহরে,' রিকি বলল। 'কতগুলো শয়তান লোক আমাদের জমি দখল করতে চাইছে। শেরিফ হ্যামারসনকে বন্দি করে রেখেছে।'

'কী করে জানলে?' অন্য লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'রবিন বলেছে আমাকে। ও আর ওর বন্ধু কিশোর এখন র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে আছে। আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন?'

'নিশ্চয় করব,' মোটা সঙ্গীর দিকে ফিরল লম্বা লোকটা। 'সাহায্য করো।'

আচমকা রিকির হাত চেপে ধরল মোটা লোকটা। জোর করে ওর দুই হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর সেই দড়িটারই আরেক মাথা বাঁধল জিনের পিছনের শিঙের সঙ্গে। ঘোড়ার পিছনের দুই পা বাঁধল খাটো দড়ি দিয়ে এমনভাবে, যাতে ঘোড়াটা পা খুব বেশি ফাঁক করতে না পারে, আস্তে হাঁটতে বাধ্য হয়।

ভয় ফুটেছে রিকির চোখে। 'আপনারা...আপনারা...'

'হ্যাঁ, খোকা, আমরা,' মোটা লোকটা বলল, 'ভুল লোকের কাছে সাহায্য চেয়ে বোকামি করেছ। অচেনা লোকের কাছে পেটের কথা বলতে নেই।'

অসহায় অবস্থায় রিকিকে ফেলে রেখে, ঘোড়া ছুটিয়ে শেরিফের র‍্যাঞ্চের দিকে চলে গেল ওরা।

*

কোরালের বেড়ার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে তখনও দুই গোয়েন্দা। ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। তক্তার ফাঁক দিয়ে দুটো ঘোড়াকে ছুটে আসতে দেখে রবিন বলল, 'দুজন। নিশ্চয় রিকি পাঠায়নি। এত তাড়াতাড়ি শহরে গিয়ে লোক পাঠানো সম্ভব না।'

আরও কাছে এলে দুই আগন্তুককে চিনতে পারল ওরা। বেনের দুই সঙ্গী।

ডাক শুনে দরজায় বেরোল বেন। হাসিমুখে হাত নেড়ে স্বাগত জানাল দুই অশ্বারোহীকে। ঢুকে গেল আবার র‍্যাঞ্চ হাউসে। দুই আগন্তুক বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে ওরা।

'ব্যাপার সুবিধের ঠেকছে না!' সতর্ক হয়ে উঠল রবিন। তার কথা শেষ হতে না হতেই র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে এল বেন, রস ও অন্য লোকটা।

ফিসফিস করে রবিন বলল, 'আরে দেখো দেখো, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে ওরা। আমাদের কথা জেনে গেছে মনে হয়! চারপাশের পথ আটকে দিচ্ছে! রস এদিকেই আসছে!'

পা পা করে এগিয়ে আসছে রস। খুব হুঁশিয়ার।

গোলাঘরের দিকে পিছিয়ে যেতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। আর কয়েক গজ সরতে পারলেই হয়। তারপর একছুটে মাঝের খোলা জায়গাটা পেরিয়ে ঢুকে যেতে পারবে ঘরে। কারও চোখে পড়বে না।

হঠাৎ পিছন থেকে শোনা গেল চিৎকার। 'এই যে, দেখে ফেলেছি! এই যে এখানে!'

পাঁই করে ঘুরল দুই গোয়েন্দা।

দৌড়ে এল পিছনের লোকটা। আরেক দিক থেকে এল আরেকজন। দাঁড়িয়ে গেল গোলাঘর আর কোরালের মাঝখানে।

ছুটে এল রস।

ফাঁদে পড়ে গেল দুই গোয়েন্দা। পালানোর সব পথ বন্ধ।

আঠারো

ঘিরে ফেলা হলো কিশোরদেরকে। মরিয়া হয়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল ওরা, দু'চারটা ঘুসিও মারল, কাজ হলো না। শক্ত হাতে জাপটে ধরা হলো দুজনকে।

'ভালভাবে চলে যেতে বলেছিলাম,' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বেন বলল, 'শোননি। এবার বুঝবে মজা।'

সঙ্গীর দিকে ফিরে আদেশ দিল সে, 'বেঁধে ফেলো। শক্ত করে বাঁধবে।'

গোলাঘরে গিয়ে দড়ি নিয়ে এল দুজন লোক। বন্দিদের কব্জি ও পায়ের গোড়ালি শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধল। যাতে নড়তে না পারে।

রসকে বলল বেন, 'আমি যাচ্ছি। এগুলোর দিকে খেয়াল রাখো। কোন চালাকি যেন করতে না পারে।'

'ভেবো না। কিচ্ছু করতে পারবে না ওরা।'

'ইস্, দেরি হয়ে গেল। আমরা যাচ্ছি না দেখে নিশ্চয় এতক্ষণে মাথা খারাপ হয়ে গেছে মিসেস জোনসের,' নিজের রসিকতায় নিজেই খিকখিক করে হাসল বেন।

'দলিলগুলো সব ঠিকঠাকমত নিয়েছ তো? এতটা এগিয়ে এখন আর আইনের গোলমালে জড়াতে চাই না।'

'কী ভাবো আমাকে, কচি খোকা?' ভুরু কুঁচকে ফেলল বেন। 'সব নিয়েছি। সই করার জন্য পাগল হয়ে যাবে মিসেস জোনস, যখন শুনবে তার ছেলেকে আটকে ফেলেছি আমরা, সই না দিলে কোনদিন আর ফেরত পাবে না।'

নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর ও রবিন। বেনের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রিকিকে আটকে ফেলেছে ওরা। আর কোন ভরসা রইল না। পুলিশের কাছে খবর যাবে না, সাহায্যও আসবে না।

একটা ঘোড়া নিয়ে জোনসদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল বেন।

সে অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইল অন্যেরা, তারপর রস ফিরল দুই গোয়েন্দার দিকে। রবিনের পায়ে লাথি মেরে খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তারপর বিচ্ছুরা, এখানে এলে কীভাবে?'

চুপ করে রইল দুই গোয়েন্দা।

জবাব না পেয়ে রেগে গেল রস। খেঁকিয়ে উঠল, 'মেজাজ দেখানো হচ্ছে, না? হিরো!'

বাধা পড়ল তার কথায়। চিৎকার শোনা গেল, 'এই, দেখে যাও, কীসে করে এসেছে!'

গোলাঘরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল এক কাউবয়। খচ্চরটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। 'এটাকেই না সেদিন বনের ভিতর পেয়েছিলাম? ডিনামাইট বইয়েছি? হাহ্ হাহ্! এমন একটা বেয়াড়া জানোয়ারকে আনল কীভাবে ওরা?' জবাবের অপেক্ষা না করে বলল, 'চলো, যাই।'

'কোথায়?'

'সোয়াম্পে। ড্রিলিঙের ব্যবস্থা করতে হবে না?'

রসের ঘোড়ার পিঠে ময়দার বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলা হলো কিশোরকে। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করল সে। রবিনকে তোলা হলো এক কাউবয়ের ঘোড়ায়। বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে ঝুলে রইল দুজনেই, পা একপাশে, মাথা অন্যপাশে। ঘোড়ার মেরুদণ্ডের চাপ লাগছে পেটে। বুঝতে পারছে রুক্ষ পথে চলার সময় আরও বেশি ব্যথা পাবে।

কিন্তু কতটা ব্যথা, কল্পনাও করতে পারেনি। সোয়াম্পে যখন পৌঁছল দলটা, দুই গোয়েন্দার মনে হলো, শরীরের হাড় আর একটাও আস্ত নেই, থেঁতলে গেছে সমস্ত মাংসপেশি।

'বাঁধা থাক এভাবেই,' রস বলল। 'ঘয়ে নিয়ে এসো।'

শৈলশিরা পেরিয়ে ঢাল বেয়ে ফসিলটার দিকে নামতে লাগল ওরা। সাইনবোর্ডটা রয়েছে এখনও।

'একদম নড়বে না, বুঝলে?' দুই গোয়েন্দাকে হুঁশিয়ার করল রস। 'মাটির নীচে বারুদ ঠাসা, ছাতু হয়ে উড়ে যাবে বলে দিলাম।'

থামের মত একটা পাথরে পিঠ লাগিয়ে মাটিতে বসিয়ে দেয়া হলো দুজনকে। তারপর পাথরটার সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো।

এখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে জলাভূমি; ওপারে পর্বতের ঢালে জঙ্গল, তার ওপর পুরানো ফায়ার টাওয়ার।

চকিতে কথাটা খেলে গেল কিশোরের মনে—নিশ্চয় ওই টাওয়ারের কথাই বলেছে বেন মানচিনি।

মাথা ঘুরিয়ে রবিনের দিকে তাকাতে গেল কিশোর।

ঝট করে ঘুরে তাকাল রস। খেঁকিয়ে উঠল, 'এই, নড়তে মানা করা হয়েছিল তোমাদের! কানে যায়নি কথা? এত কষ্ট করে আটকে রেখেছি শুধু টিকটিকিটাকে দেখানোর জন্য, নইলে কখন খতম করে দিতাম। ও এলেই টাওয়ারে নিয়ে গিয়ে...'

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ হলো।

কেঁপে উঠল পাহাড়। জলাভূমি পেরিয়ে পর্বতের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ভূতুড়ে প্রতিধ্বনি তুলল সে-আওয়াজ। রাগে লাল হয়ে গেল রসের ভোঁতা নাক।

'এই, কোন গাধারে!' গর্জে উঠল সে। 'এখনই ডিনামাইট ফাটাতে কে বলেছে? দাঁড়া, ঘাড় ভাঙব...'

'তোমার ভাঙার জন্য কী আর আস্ত বসে আছে যে ফাটিয়েছে?' ভয় ফুটেছে এক কাউবয়ের চোখে। 'বেশি নাড়াচাড়া করতে গিয়েছিল বোধহয়, নিজেই উড়ে গেছে!'

'এই অপদার্থগুলোকে যে কেন এনেছে! কাজ জানে না, কিছু না...নিজেও মরবে, সবাইকে মারবে।...ডিনামাইট কিনতে পয়সা লাগে না?'

'হয়েছে হয়েছে, শান্ত হও। অনেক আছে স্টকে...লোকটার কী হয়েছে দেখা দরকার...'

'আমি যাচ্ছি। বোধহয় ওলট-পালট করে দিল সব। ছেলেগুলোকে টাওয়ারে নেয়ার আর সুযোগ পেলাম না। দেখি, অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

'এরা তো বাঁধাই আছে,' কাউবয় বলল। 'থাক না এখানে। চলো আমিও যাব।'

ঘোড়ায় চড়ল লোকগুলো। ঢাল বেয়ে নেমে যেতে লাগল জলাভূমির দিকে। খানিক পরেই চোখের আড়াল হয়ে গেল।

কিশোরের দিকে ফিরল রবিন। 'ওরা কতক্ষণ দেরি করবে? মুসারা এসে গেলে বাঁচতাম।'

'হুঁ!'

'কী মনে হয় তোমার? এখানে সত্যি বিস্ফোরক পুঁতে রেখেছে?'

'ওদের চলাফেরা দেখে তো তা মনে হলো না,' জবাব দিল কিশোর। 'মাটির নীচে বিস্ফোরক থাকলে তার আশপাশে ঘেঁষতে চাইত না। আমার ধারণা, নেই। আমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যেই বলেছে।'

'তাহলে নড়াচড়া করা যায়, বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে পারি?'

চেষ্টা শুরু করল দুজনে।

'পাথরের কিনারটা ধারাল,' রবিন বলল। 'তাতে ঘষলে দড়ি কাটতে পারে। ঘষব?'

'ঘষো।'

ঘষতে শুরু করল দুজনে। দড়ির কিছুই হলো না, হাতের চামড়াই ছিলল শুধু।

সময় যাচ্ছে। কেউ এল না।

ভাবছে কিশোর। পুরো রহস্যটা নিয়ে, গোড়া থেকে, ধাপে ধাপে। ইউনিফর্ম পরা তিন নকল রেঞ্জারের কথা মনে আসতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'রবিন, টাওয়ারে যেতে হবে আমাদের!'

'কেন?'

'আমার বিশ্বাস, আসল রেঞ্জারদেরকে ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে। নইলে এই ক'দিনে ওদের একজনকেও দেখলাম না কেন? রিকি বলেছিল, ওরা নিয়মিত টহল দিতে আসে এদিকে। এল না কেন? সহজ ব্যাখ্যা, আটকে আছে। নিশ্চয় শেরিফকেও ওই টাওয়ারেই বন্দি করে রেখেছে।'

'ঠিক বলেছ! ওদের ইউনিফর্মই কেড়ে নিয়েছে ডাকাতগুলো।'

'হ্যাঁ। মিসেস জোনসের কাছ থেকে দলিলগুলো সই করিয়ে আনার পর রেঞ্জারদের ছেড়ে দেবে বেন। তখন আর কিছু করার থাকবে না ওদের। জমির মালিক জমি বিক্রি করে দিলে অন্যের কিছু বলার নেই। সই করার আগেই মিসেস জোনসকে ঠেকাতে হবে আমাদের।'

'ছাড়া পেলে তবে তো ঠেকাব। বাঁধনই তো খুলতে পারছি না।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর।

*

ঘোড়ায় চড়ে জোনসদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে মুসা আর কুপার। দূর থেকেই দেখতে পেল, একটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে র‍্যাঞ্চের সামনে।

হাত তুলে দেখাল মুসা, 'ওটা রিকির নয়।'

বাড়ির কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল দুজনে। কুপার বললেন, 'চলো, দেখি কে এলো?'

'সামনে দিয়ে সরাসরি যাওয়াটা ঠিক হবে না।' কয়েকটা গাছ দেখাল মুসা, ঘন হয়ে জন্মেছে। 'ওখানে ঘোড়াগুলো লুকিয়ে রেখে, গোলাঘরের পিছন দিয়ে ঘুরে যাব আমরা। চুপি চুপি দেখে নেব, কে এসেছে।'

ঘোড়া রেখে গোলার পিছনে চলে এল দুজনে। আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। কিছু দেখা গেল না। এখান থেকে দেখা যাবেও না। পা টিপে টিপে চত্বর পেরিয়ে খোলা জানালার নীচে এসে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল ওরা।

সাবধানে মাথা তুলল মুসা। লিভিং-রুমের ভিতরে তাকিয়েই ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল আবার। আরেকটু হলেই বেন মানচিনির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল। একটা টেবিলের পাশে বসে আছে লোকটা। আরেক পাশে এক মহিলা,

নিশ্চয় মিসেস জোনস। তাঁর দিকে একটা কলম বাড়িয়ে ধরেছে জালিয়াতটা।

'সইটা করে ফেলুন,' বেন বলল, 'ভালই হবে আপনার।'

'আজ যদি রিকির বাবা বেঁচে থাকত...' ফুঁপিয়ে উঠলেন মহিলা। 'আমি এ সব দলিলের কী বুঝি? সে বুঝতে পারত।'

'আপনার ছেলেও তো বলল, বেচে দেয়াই ভাল। সেদিন ওই বিদেশী ছেলে দুটোর সঙ্গে আলাপ করছিল শুনলাম।'

মুসার কাঁধে শক্ত হলো কুপারের হাত। ওকে আসতে বলে নিঃশব্দে এগোলেন।

'বেশ, দিন,' হাত বাড়ালেন মহিলা। 'কোথায় সই করতে হবে?' পরাজয় মেনে নিয়েছেন।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল মুসা। পিছনে কুপার।

চমকে উঠে পিস্তলে হাত দিল বেন। বের করার সময় পেল না। মুসার প্রচণ্ড ধাক্কায় চেয়ারসহ উল্টে পড়ল সে। তার বুকে চেপে বসল মুসা। লোকটার দুই হাত মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল প্রাণপণে। কিছুতেই মুসাকে বুকের ওপর থেকে সরাতে পারল না বেন। দ্রুত তার হাত-পা বেঁধে ফেললেন কুপার।

'ভয় পাবেন না, মিসেস জোনস,' শান্তকণ্ঠে মহিলাকে বোঝালেন শিক্ষক। নিজেদের পরিচয় দিলেন। 'আমরা রিকির বন্ধু।' বেনকে দেখিয়ে বললেন, 'এই জালিয়াতটা ঠকাতে চাইছিল আপনাকে।'

জালিয়াতি করে কীভাবে জায়গা দখল করতে চেয়েছে বেন, মহিলাকে জানাল মুসা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস জোনস। পানি টলমল করছে চোখে। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা আমার রিকিকে দেখেছ?'

মুসা কিংবা কুপার জবাব দেয়ার আগেই বেন বলে উঠল, 'আমি দেখেছি।'

'কোথায়?' জানতে চাইলেন কুপার।

'আমাকে ছাড়লে তবে বলব।'

'ছেড়ে দিন,' মিসেস জোনস বললেন।

'ছাড়লে গিয়ে দলবল নিয়ে ফিরে আসবে,' মুসা বলল। 'তখন আর কিচ্ছু করার থাকবে না আমাদের। সাপকে বিশ্বাস করা যায়, একে যায় না।'

'মুসা ঠিকই বলেছে,' সমর্থন করলেন কুপার।

এই সময় শব্দ শোনা গেল। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কারা যেন। তাড়াতাড়ি জানালার কাছে ছুটে গেলেন মহিলা। একবার দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মিসেস হ্যামারসন! সঙ্গে দুজন ডেপুটি।' জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত নেড়ে ডাকলেন ওদের।

ডেপুটিদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিসেস হ্যামারসন। হাত-পা বাঁধা বেনকে দেখে অবাক হলেন।

তাঁকে আর ডেপুটিদেরকে জানানো হলো সব।

শেরিফের স্ত্রী বললেন, তিনি ভেবেছিলেন, পাহাড়ে চড়তে গিয়ে হাত-পা ভেঙে কোথাও পড়ে আছেন তাঁর স্বামী। কয়েক দিন ধরে না ফেরায় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেই খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন। রেড বিউটে গিয়ে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। 'শুনে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে ওরা,' দুই ডেপুটিকে দেখালেন তিনি।

'ভালই হয়েছে,' মিসেস. জোনস বললেন। 'আপনি এখন আমার এখানেই থাকুন। শেরিফ ফিরে আসুক, তারপর বাড়ি যাবেন।'

আসামীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ডেপুটিরা। চোরটাকে হাজতে রেখে আবার ফিরে আসবে শেরিফকে খোঁজার জন্য। ততক্ষণে রিকি ফিরে না এলে তাকেও খুঁজতে বেরোবে।

কুপার ও মুসা রওনা হয়ে গেল ফসিল এরিয়ার দিকে। কিশোররা ওখানে এসে তাদের অপেক্ষায় বসে থাকতে পারে এই ভেবে।

*

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে রয়েছে কিশোর ও রবিন। কানে এল পায়ের শব্দ।

'কে জানি আসছে,' রবিন বলল।

পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ হতে মাথা কাত করে তাকাল দুজনে। শৈলশিরার ওপরে সাবধানে উঁকি দিল একটা মাথা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দুই গোয়েন্দা।

'রিকি জোনস!' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন।

*

ওদের বাঁধন খুলতে খুলতে রিকি জানাল, তার কী হয়েছিল।

'ছাড়া পেলে কীভাবে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়লাম মাটিতে। একটা ধারাল পাথরে ঘষে দড়িটা কাটলাম। বুঝলাম, দেরি হয়ে গেছে, রেড বিউটে গিয়ে সাহায্য আনার আর সময় নেই। চলে গেলাম শেরিফের র‍্যাঞ্চে। দেখলাম, ঘোড়ার পায়ের ছাপ সব এসেছে এদিকে। ছাপ ধরে ধরে চলে এলাম।'

'ওই টাওয়ারে যেতে হবে এখন,' ফায়ার টাওয়ারটা দেখাল কিশোর। 'আমার বিশ্বাস, শেরিফ আর রেঞ্জারদেরকে ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু ঘোড়া ছাড়া যাই কীভাবে?'

'ঘোড়া ছাড়াও যাওয়া যাবে,' রিকি বলল। 'শর্টকাট জানা আছে আমার। এসো।'

বনের ভিতর ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এসে দুই গোয়েন্দার সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলল রিকি।

এত তাড়াতাড়ি টাওয়ারের কাছে পৌঁছে গেল, অবাক না হয়ে পারল না কিশোররা। জলার ওপর দিয়েই ওদেরকে নিয়ে এসেছে রিকি। বড় বড় পাথর আছে, টপকে টপকে এসেছে ওগুলোর ওপর দিয়ে। তা ছাড়া কিছু জায়গা আছে, মনে হয় পানিতে ডোবা, আসলে তা নয়। মাটির চড়া ওগুলো। ওপরটা শ্যাওলায়

ছাওয়া। রিকির এ সব চেনা। সে-জন্যই আসতে পেরেছে।

পর্বতের ঢালে বনের গোড়ায় এসে দাঁড়াল ওরা। ওপর দিকে তাকাল।

খাড়া ঢাল দেখে ছেলেদের মনে হলো ওপরে ওঠা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চাইল ওরা। ঢালের গায়ে বুক ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে চলল। ধারাল পাথরে লেগে চামড়া কাটছে। ছোট চারাগুলো ধরে ওঠার সময় মাঝে মাঝে উপড়ে চলে আসছে কোন কোনটা। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তখন অন্য গাছ ধরছে। অবশেষে নিরাপদেই উঠে এল সমতল একটা জায়গায় টাওয়ারটা তৈরি হয়েছে ওখানে। কাঠের পুরানো কাঠামো, মলিন, ধূসর চারপাশে অযত্নে বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড় জঙ্গল। নির্জন লাগছে।

পাহারা রেখে যেতে পারে ডাকাতরা। তবে দেখা গেল না কাউকে। সাবধানে টাওয়ারের গোড়ার দরজায় এসে দাঁড়াল ছেলেরা। দরজা ভেঙে খোলা হয়েছিল, এক কব্জায় ভর করে কাত হয়ে ঝুলছে পাল্লাটা।

সেটা সরিয়ে ভিতরে পা রাখল কিশোর। তার পিছনে রবিন আর রিকি।

'তুমি এখানে থাকো,' রিকিকে বলল কিশোর। 'কাউকে আসতে দেখলে হুঁশিয়ার করবে আমাদের। তারপর লুকিয়ে পড়বে।'

পাল্লার আড়ালে অবস্থান নিল রিকি।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। মচমচ করছে পুরানো কাঠের সিঁড়ি।

'যা নড়ছে!' শঙ্কিত হলো রবিন, 'ভার রাখতে পারলে হয়। এমন শব্দ করছে, যেন টাওয়ারটাই ভেঙে পড়বে।'

'আস্তে আস্তে ওঠো, তাড়াহুড়া করতে যেয়ো না,' হুঁশিয়ার করল কিশোর।

অনেক প্রতিবাদ জানাল সিঁড়ি, ভেঙে পড়ার হুমকি দিতে থাকল অনবরত, পরোয়া করল না ওরা, উঠে এল অবশেষে ওপরের পাটাতনে, যেখানে দাঁড়িয়ে নীচের চারপাশে নজর রাখা হত এক সময়। কেউ নেই এখন ওখানে

'ভুল করলাম না তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে হয় না।'

নিচু ছাতের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'রবিন, দেখো।' ওপরের একটা আলগা তক্তা দেখাল সে, 'নিশ্চয় ট্র্যাপডোর'

ওদের সাড়া পেয়েই বোধহয়, ওপরে ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল। চিৎকার করে উঠল একটা কণ্ঠ, 'কে? কে ওখানে?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রবিনকে বলল কিশোর, 'এমনিতে নাগাল পাব না আমার কাঁধে চড়ো।'

'আমি চড়ব?'

'হ্যাঁ, তোমার ওজন আমার চেয়ে কম। আমি চড়লে ভার রাখতে পারবে না।'

তর্ক করল না রবিন। কিশোরের কাঁধে চড়ে ট্র্যাপডোরটা নামিয়ে, চারকোনা

ফোকরের দুই ধার ধরে শরীরটা টেনে তুলল চিলেকোঠার মত খুপরিটার ভিতরে। দেখল অদ্ভুত এক দৃশ্য। হাত-পা বাঁধা চারজন লোক পড়ে আছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তিনজনের গায়ের শার্ট-প্যান্ট লাগেনি ঠিকমত, ওদের মাপের নয় পোশাকগুলো। আরেকজনের পরনে নীল জিনস, শার্টের বুকের কাছে একটা রূপার তারা। তিনিই শেরিফ হ্যামারসন, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার।

দ্রুত বাঁধন কেটে দিতে লাগল বন্দিদের। দুর্বল কণ্ঠে নিজের পরিচয় দিলেন শেরিফ। অন্য তিনজনকে দেখালেন। 'এরা রেঞ্জার।'

বন্দিদেরকে পাটাতনে নামতে সাহায্য করল দুই গোয়েন্দা। কাহিল হয়ে গেছেন চারজনেই, প্রায় দাঁড়াতেই পারছে না। কাঠের বিপজ্জনক সিঁড়ি দিয়ে নামতে খুব কষ্ট হলো ওঁদের।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আপনাদের কে এনেছে, শেরিফ?'

'আমি নিজে নিজেই এসেছি। একজন ফোন করে আমাকে বলেছিল, এখানে তিনজন রেঞ্জার আটকে রয়েছে। তাদের মুক্ত করতে এলাম। হঠাৎ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকটা লোক, বেঁধে ফেলল—এত তাড়াতাড়ি, কিছুই করতে পারলাম না।'

'আরও একজনকে ধরেছে ওরা,' রবিন বলল। 'তার নাম ভিক্টর সাইমন। ডিটেকটিভ। একদল রেল ডাকাতের পিছে লেগেছেন তিনি।'

'তোমরা?'

'আমরা আমাদের এক সারের সঙ্গে এসেছি, উটের ফসিল খুঁজতে। একইসঙ্গে মিস্টার সাইমনকেও সহায়তা করছি। রকি বিচে থাকি আমরা।'

শেরিফ বললেন, 'মিস্টার সাইমনের নাম আমি শুনেছি। ঈশ্বর না করুন, কোন ক্ষতি যেন তাঁর না হয়!'

কথা বলতে বলতে টাওয়ারের গোড়ায় চলে এসেছে ওরা। ভেঙে পড়ার অনেক ভয় দেখিয়েও টাওয়ারের সিঁড়িটা শেষ পর্যন্ত ভাঙল না, টিকে রইল। নিরাপদেই নামল সবাই।

ওদের দেখে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রিকি। শেরিফ বললেন, 'আরে, তুমি!'

'ও-ই তো আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে,' জানাল রবিন।

উনিশ

যেদিক দিয়ে উঠেছে ছেলেরা, পাহাড় থেকে নামার সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে তার উল্টো দিকে। ছেলেদের নামতে অসুবিধে হলো না, কিন্তু খুবই কষ্ট হলো অন্য চারজনের। গোড়ায় নেমে হাত-পা ছড়িয়ে বসে হাঁপাতে শুরু করল।

একজন তো শুয়েই পড়ল।

'এবার আমাদের কাজ মিস্টার সাইমনকে মুক্ত করা,' কিশোর বলল।

কথায় কথায় শেরিফকে অনেক কথাই জানাল সে আর রবিন। ট্রাকের সেই হেল্পারের কথায় আসতে শেরিফের আগ্রহ বাড়ল। বললেন, 'কী নাম বললে, ব্যানি? নিশ্চয়ই ব্যানার ক্যারাম্বা। আমাদের এই অঞ্চলেরই ছেলে। ছেলেটা খারাপ ছিল না, কী করে জানি অসৎসঙ্গে পড়ে গেল...'

রবিন বলল, 'ব্যানি বলেছে, তার দুই ভাইয়ের লেখাপড়ার জন্যে নাকি অনেক টাকা দরকার। টাকার জন্যই ডাকাতদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছিল।'

পরের কাজ কী, সেটা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। ঠিক হলো, সোয়াম্পে ফিরে যাবে গোয়েন্দারা, যেখানে অয়েল ড্রিলিঙের পরিকল্পনা চলছে।

'কয়েকটা শয়তানকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ওখানে,' শেরিফ বললেন। 'চুপি চুপি গিয়ে চমকে দেব ব্যাটাদের। ধরা সহজ হবে।'

'কিন্তু আপনার তো শরীর খারাপ, দুর্বল...'

'হোক দুর্বল। আরও কিছুক্ষণ টিকে থাকতে পারব, মরব না।'

'রেঞ্জাররা?'

'ওরা এখানেই থাক। অফিসে গিয়ে গাড়ি ও খাবার পাঠাব।'

কিন্তু থাকতে রাজি হলো না রেঞ্জাররা। বলল, শেরিফ এই শরীর নিয়ে যেতে পারলে ওরাও পারবে।

সবে রওনা হয়েছে ওরা, এই সময় কানে এল ভারি ইঞ্জিনের শব্দ।

'ট্রাক মনে হয়?' রবিন বলল।

'ওদিকের রাস্তায়,' হাত তুলে দেখালেন শেরিফ। 'বন থেকে কাঠ নেয়ার জন্য ট্রাক আসত আগে। চলো তো দেখি, কে এল?'

বড় একটা পাথরের আড়ালে এসে উঁকি দিল ওরা। কিছু দূরে একটা ট্রাক থেমেছে। বেরিয়ে আসছে ড্রাইভার।

'ব্যানি,' বলে উঠল রবিন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ।

ঘন হয়ে জন্মানো কয়েকটা গাছের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল ব্যানি। গাছের আড়াল থেকে চারজন লোক বেরিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। দুজনকে চেনে কিশোররা, ফেরেনটি আর রস।

ব্যানি ওদের কাছে গিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলতে লাগল।

হঠাৎ ট্রাকের পিছনের ডালা খুলে খুলে পড়ল। বেরিয়ে এল কয়েকজন মানুষ। ওদের একজনকে দেখে খুশি হয়ে গেল কিশোর, 'মিস্টার সাইমন!'

'জেসন আর পটারও আছে!' অবাক হয়ে বলল রবিন।

বাকি লোকগুলো সাদা পোশাক পরা পুলিশ। চোখের পলকে ঘিরে ফেলল ডাকাতদের, হাতকড়া পরিয়ে দিল হাতে।

কথা রেখেছে ব্যানার! চালাকি করে আড়াল থেকে বের করে এনে ডাকাতগুলোকে ধরিয়ে দিয়েছে।

আর লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। খুশিতে লাফাতে লাফাতে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল ছেলেরা। পিছনে প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল শেরিফের দলবল। হাসিমুখে তাদের স্বাগত জানালেন মিস্টার সাইমন।

'মিস্টার সাইমন, আপনি নাকি জখম হয়েছিলেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

না, হইনি। প্লেনে ঢুকে আমাকে আর পটারকে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে। শেষে আমরাই জিতেছি। শেলবিকে মিথ্যে মেসেজ পাঠাতে বাধ্য করেছিলাম। ও এখন জেলে। তার দোস্ত ট্যানারিও জেলে।'

'ট্যানারিটা কে?'

এগিয়ে এল ব্যানি, মুখে হাসি। বলল, 'কেন, চিনতে পারছ না? রকি বিচ থেকে যে তোমাদের পিছু নিয়েছিল, প্লেনে করে। গ্রীন স্যান্ড এয়ারপোর্টে নেমেছিল প্লেনটা। প্লেনের গায়ে সাপে পাখি খাওয়ার দৃশ্য আঁকা ছিল।'

'ও, সেই লম্বা লোকটা,' রবিন বলল। 'ওটাও সাপই।'

'হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শেলবি আর ট্যানারির পুরানো দোস্ত।'

'তেলের খোঁজ পেল কীভাবে ওরা?' জানতে চাইল কিশোর।

'দেশ ভ্রমণ শেলবির নেশা এবং পেশা; দুটোই বলতে পারো,' ব্যানি জানাল। 'যেখানেই যায়, বেআইনি কাজের সন্ধান করে। পশ্চিমের একটা ছোট শহরে গিয়েছিল একবার...শহরটার নাম ভুলে গেছি। ওখানে দেখা হয় এক বুড়ো, অসুস্থ ওয়াইল্ডক্যাটারের সঙ্গে।'

জ্বলন্ত চোখে ব্যানির দিকে তাকাল ফেরেনটি। দৃষ্টির আগুনে ব্যানিকে ভস্ম করতে ব্যর্থ হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

তার রাগের পরোয়া করল না ব্যানি। 'বুড়ো বলল, তাকে কিছু টাকা দিলে একটা গুপ্তধনের গল্প শোনাবে। সেই গুপ্তধন তুলে নিতে পারলে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাবে শেলবি।'

'নিশ্চয় বিশ্বাস করেছিল শেলবি?' রবিনের প্রশ্ন।

'জুয়া খেলতে ভয় পায় না শেলবি। বুড়োর সঙ্গেও খেলল। টাকা দিল তাকে। পঞ্চাশ বছর আগের এক গল্প শোনাল বুড়ো। তেলের গল্প। বলল, প্রায় পেয়ে গিয়েছিল তেল, এই সময় ঘটল এক দুর্ঘটনা। ভূমিকম্প হয়ে পাথরের ধস নামল। বিশজন ক্যাটারের জীবন্ত সমাধি হয়ে গেল একটা গুহার ভিতরে। আরেকজনের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। বাইশজনের মধ্যে কেবল সেই বুড়োই বেঁচে ছিল। পরে স্থানীয় লোকজনের চেষ্টায় ওই বিশজনের লাশ উদ্ধার করে উইলো গাছের গোড়ায় কবর দিল সে।'

'তারমানে সাইনবোর্ড ওই বুড়োই লাগিয়েছিল,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। দুর্ঘটনায় বন্ধু আর সহকর্মীদের এভাবে মারা যেতে দেখে প্রচণ্ড

মানসিক আঘাত পেয়েছিল বুড়ো। আধপাগল হয়ে গিয়েছিল। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল কিছুদিনের জন্য। শেলবির সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন আবার ঠিক হয়ে গিয়েছিল।'

রোমাঞ্চকর ওই গল্প শোনার জন্য সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে ব্যানিকে।

ব্যানি বলল, 'শেলবি তখন জায়গাটা দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করল বুড়োকে। রাজি হলো বুড়ো। তবে আরও কিছু টাকার বিনিময়ে। শেলবিকে ডেভিল'স সোয়াম্পে নিয়ে এল সে।'

কিশোরের দিকে তাকাল ব্যানি। 'তোমরা যেটাকে ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্প বলছ, ওটার আসল নাম ডেভিল'স সোয়াম্প। একটা গুহার ভিতরে বুড়োকে রাখল শেলবি। অনেক খাবারও রেখে দিল গুহায়, যাতে বুড়োর অসুবিধে না হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরে মরে গেল বুড়ো। তেল তোলার অনেক খরচ। টাকা দরকার। টাকার জন্য রেল ডাকাতি শুরু করল শেলবি। ধরা পড়ে জেলে গেল। সেখানে দেখা হলো বেনের সঙ্গে।'

'ওই ইঁদুরটাকে আবার অংশীদার করল কেন?' জানতে চাইল রবিন। 'কী লাভ শেলবির?'

'বেন মানচিনি জ্যালিয়াত। আমার বিশ্বাস, জাল দলিল বানিয়ে মিসেস জোনসের জমি দখল করার মতলবেই ওটাকে দলে নিয়েছে শেলবি। আর ফেরেনটিকে নিয়েছে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে।'

'আর রসকে?' আড়চোখে রস ম্যাকডোনাল্ডের দিকে তাকাল রবিন। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটা। পারলে ব্যানিকে চিবিয়ে খায়।

বেনের বন্ধু রস, তেল বিশেষজ্ঞ। জ্যালিয়াত, ইঞ্জিনিয়ার, অয়েল এক্সপার্ট, সবই পেয়ে গেল শেলবি। বাকি রইল একজন স্পাই, পুলিশের ওপর চোখ রাখার জন্য। শেষে সেই দায়িত্বটা ট্যানারিকে দিল সে। ট্যানারিই বার বার তোমাদের ঠেকাতে চেয়েছে, যাতে সোয়াম্পটা খুঁজে না পাও। শেলবি আর ফেরেনটিকে প্লেনে করে সে-ই নামিয়ে দিয়ে গেছে রেড বিউটে।'

'ওই প্লেনটাই আমাদের বিপদের কারণ হয়েছে,' বলে উঠল একজন রেঞ্জার। 'ওটা নামতে দেখেছি আমরা। লাইসেন্স নাম্বার নেই। দেখলাম, কয়েকজন কাউবয় প্লেনে উঠে লম্বা লোকটার সঙ্গে কথা বলছে। সন্দেহ হলো। খোঁজখবর শুরু করলাম। তাতে ঘাবড়ে গেল ওরা।

'ঠিক,' খেই ধরল আরেক রেঞ্জার। 'পিস্তলের মুখে আমাদের আটকাল। ধরে নিয়ে গেল পুরানো ফায়ার টাওয়ারে। ওখানে আমাদের বেঁধে রেখে ইউনিফর্ম খুলে নিয়ে চলে গেল।'

সবাইকে তার দিকে তাকাতে দেখে ঝাঁজাল কণ্ঠে ফেরেনটি বলল, 'আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? যারা করেছে, তাদের দিকে তাকাওগে। শয়তানি তো বেশির ভাগ ওই কাউবয়গুলোই করল। পাথর ফেলে ছেলেগুলোকে মেরে ফেলতে চাইল। শেরিফকে ভুয়া টেলিফোন করে ডেকে

এসে আটকাল। তার রেডিও-টেলিফোনটা বিকল করে রেখে এল। কাজে লাগবে ভেবে পরে আবার গিয়ে সেটা চুরি করেও আনল।'

অনেক প্রশ্নের জবাব জানা গেল। বাকিটা অনুমান করল কিশোর, বলল, 'বুঝতে পারছি, পত্রিকায় ফসিলের ওপর লেখা প্রবন্ধটা পড়েছিল রস। কুপার যখন প্রথম ফসিল খুঁজতে যেতে চেয়েছিলেন, পথে তার ওপর হামলা চালিয়ে রস আর বেনই তাঁকে ফেরত পাঠিয়েছিল রকি বিচে। আমাদের রেডিও-বেলুনটাকে গুলি করে নামিয়েছিল রস। গুহার ভিতরে কঙ্কালটা নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছিল ব্যানি, মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য, যাতে কেউ না ঢোকে।'

জটিল এক রহস্যের সমাধান হলো। ছেলেদের অভিনন্দন জানালেন মিস্টার সাইমন। তারপর বললেন, 'চলো এখন ফসিল এরিয়ায়।'

'হ্যাঁ, চলুন,' কিশোর বলল। 'মুসা আর মিস্টার কুপার কী করছেন সেটাও দেখা দরকার।'

কেরেনটি, রস আর তাদের দুই কাউবয় সঙ্গীকে নিয়ে চলে গেল কয়েকজন পুলিশ। বাকি দলটা চলল সোয়াম্পে।

ঢালের কাছে পৌঁছল দলটা, যেখানে উটের ফসিলটা রয়েছে। মোড় ঘুরতে দেখা গেল, কুপার আর মুসা বসে আছে। মুসার ডাক শুনে ফিরে তাকাল দুজনেই।

'বাহ্, সবাই দেখি এসে গেছো!' খুশি হয়ে বললেন কুপার। মিস্টার সাইমন আর শেরিফের সঙ্গে হাত মেলালেন।

*

সেদিন রাতে মিসেস জোনসের বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেল তিন গোয়েন্দা, মিস্টার সাইমন, কুপার, শেরিফ, শেরিফের স্ত্রী ও তিন রেঞ্জার।

'আর কোন ভয় নেই আপনার, মিসেস জোনস,' মিস্টার সাইমন বললেন, 'সব ঠিক হয়ে গেছে। যদি বলেন, ভাল একটা অয়েল কোম্পানিকেও খবর দিতে পারি, এসে যেন আপনার সঙ্গে কথা বলে। তেল থাকলে খুঁজে বের করে দেবে।'

এক সময় রবিন জিজ্ঞেস করল, 'মুসা, কাল তো বাড়ি ফিরে যাবে, নাকি?'

প্রায় চমকে উঠল মুসা। 'কেন কেন, কাল কেন? ফসিলটা তো তোলা হয়নি এখনও। আরও খুঁড়তে হবে না? আমাকে ছাড়া পারবে?'

হাসল রবিন। 'আরও একটা জায়গা কিন্তু খোঁড়ার কথা তোমার। ফসিল খোঁড়ার চেয়ে জরুরী। ভুলে গেছো?'

'ভুলিনি,' মুখ গোমড়া করে ফেলল মুসা। 'তোমরা তো কথা দিয়েও কথা রাখলে না। আমি একা কি আর পারি এতবড় একটা কাজ!'

'আমি তোমাকে সাহায্য করব, মুসা,' কথা দিলেন কুপার। 'ফসিলটা তুলে যখন রকি বিচে যাব, তোমার সুইমিং পুল শেষ না করে আর কোন কাজে

হাত দেব না। ঠিক আছে?'

খুশির আলো নেচে উঠল মুসার চোখের তারায়। 'কিশোর মিয়া, জনাব রবিন, শুনলে তো? এবার কিন্তু সত্যি আশা হচ্ছে আমার। সার যখন কথা দিয়েছেন, নিজের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার স্বপ্ন দেখাটা সফল হবে এবার আমার।' শিক্ষকের দিকে তাকাল সে। 'চলুন সার, জলদি চলুন, উটের কঙ্কালটা তুলে ফেলি।'

-: শেষ:-

সেরা গোয়েন্দা
শামসুদ্দীন নওয়াব
প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

এক

'আমি মনে হয় রিটা হাওয়ার্থের সব ছবিই দেখেছি,' বলল কিশোর পাশা।

'খাইছে! তা হলে তো অনেকগুলো সিনেমাই দেখেছ,' বলে উঠল মুসা।

'হুঁ, কম হবে না,' সায় জানাল রবিন।

শনিবার। রকি বিচে একটা ছবির শুটিং হচ্ছে। ছবির নাম "টোটালি রিটা"। তিন গোয়েন্দার প্রিয় অভিনেত্রী অভিনয় করছে মূল চরিত্রে।

এর কয়েক দিন আগে, রকি বিচ স্কুলের এক দল ছেলে-মেয়েকে সিনেমাটায় কাজ করার জন্য বেছে নেওয়া হয়। কিশোর, মুসা আর রবিন ছিল তাদের মধ্যে।

মেরি পাশা এমুহূর্তে ছেলেদেরকে শুটিং স্পটে নিয়ে যাচ্ছেন গাড়ি চালিয়ে।

'জুলি, শ্যারন আর সিন্ডিকেও নেয়া হয়েছে শুনলাম,' বললেন মেরি চাচী।

'খাইছে! ওদের ন্যাকামি আমার সহ্য হয় না,' মন্তব্য করল মুসা।

'আমারও না,' সায় জানাল রবিন।

'ওদের কথা ছাড়ো। আমরা শেষ পর্যন্ত রিটার সাথে পরিচিত হতে যাচ্ছি এটাই বড় কথা,' বলল কিশোর।

'সোমবার আসছে ও,' জানাল রবিন।

'সেদিন আমার গোলাপি সোয়েটারটা পরব। তুমি কী পরবে, রবিন?' প্রশ্ন করল মুসা।

শ্রাগ করল রবিন।

'পরিষ্কার কিছু একটা।'

কথাটা শুনে মুচকি হাসল কিশোর।

একটু পরে, মেইন স্ট্রিটে গাড়ি দাঁড় করালেন মেরি চাচী।

'এসে গেছি,' ঘোষণা করলেন।

গাড়ি থেকে নেমে এল ছেলেরা। বিস্ফারিত চোখে চারধারে নজর বুলাচ্ছে।

'দেখে মনে হচ্ছে হলিউডে এসে পড়েছি!' মন্তব্য করল গোয়েন্দাপ্রধান।

অনেকগুলো ট্রাক ও ট্রেইলর পার্ক করা রয়েছে দেখা গেল। দড়ি-দড়া আর তার পড়ে আছে সাইডওঅকে। ক'ফুট পরপরই ক্যামেরা আর লাইট।

'টোটালি রিটা ছবির সেটে স্বাগতম,' চশমা পরা এক মহিলা বললেন। 'আমার নাম হেলগা। আমি সহকারী পরিচালক।'

হেলগা দেখিয়ে দিলেন ছেলেদেরকে কোথায় সই করতে হবে। ঠিক হলো, তিন ঘণ্টা পর মেরি চাচীর সঙ্গে ওদের দেখা হবে। মেইন স্ট্রিটের কোনায়।

'রিটাকে দেখছি না,' চাচী চলে গেলে বলল নথি।

'হ্যাঁ। তবে বেকি থ্যাচার এদিকেই আসছে,' জানাল কিশোর।

'আমি ক্লোজ-আপের জন্যে তৈরি,' বলল বেকি। কালো সানগ্লাসের উপর দিয়ে পিটপিট করে চাইছে।

মুসা চোখ তুলে চাইল আকাশের দিকে।

'রোদ কোথায়, বেকি?'

'নেই। কিন্তু ছবিতে কাজ করতে হলে স্টারদের মতই সাজ-পোশাক দরকার।' ছেলেরা জানে, বেকির মনের ইচ্ছা, ও অভিনয় করবে।

'আমরা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাব, কী বলো?' বলল বেকি।

'তিন গোয়েন্দা ইতিমধ্যেই বিখ্যাত,' বলল রবিন।

'আর কিশোর পাশা সেরা গোয়েন্দা হিসেবে পরিচিত,' যোগ করল মুসা।

লজ্জা পেল কিশোর। মুখ লাল হয়ে গেল।

বেকির উজ্জ্বল লাল রঙের স্নিকার্সের উদ্দেশে আঙুল তাক করল রবিন।

'সুন্দর তো,' বলল সপ্রশংস কণ্ঠে।

'ধন্যবাদ। একটা ম্যাগাজিনে পড়েছি রিটা লাল স্নিকার্স পরে। তাই পরলাম আরকী।'

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'কারণ আমিও ওর মত বিখ্যাত স্টার হতে চাই। আমি চাই আমাকে সবাই এক নামে চিনুক।'

'এসো, আশপাশে ঘোরাঘুরি করি,' প্রস্তাব করল কিশোর। 'রিটাকে পেয়েও যেতে পারি।'

'ঠিক বলেছ,' বলল মুসা। কিন্তু ওরা মুভি সেটে ঘুরেফিরে বেড়াতে যাবে, এসময় চেঁচিয়ে উঠল একটি ছেলে।

'দাঁড়াও! এক পা-ও নোড়ো না!'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। কেন শিপটন। ওদের স্কুলেই পড়ে।

'কেন?' প্রশ্ন করল।

সাইডওঅকে চিউইং গাম পড়ে রয়েছে। সেদিকে তর্জনী তাক করল কেন শিপটন।

'কারণ আমি ওটা চাই।'

'খাইছে! মানুষের চিবানো গাম?' মুসা বলল।

নাক কুঁচকাল নথি।

'ছিঃ!'

শিপটন হাঁটু গেড়ে বসল গামটুকু চেঁছে তুলে নিতে। প্লাস্টিকের এক ব্যাগের ভিতরে রেখে দিল ওটা।

'রিটা হাওয়ার্থের সব কিছুই আমার ভাল লাগে,' বলল ও। ব্যাগটার মুখ খুলে দেখাল। 'দেখো।'

কিশোর উঁকি দিল ব্যাগের ভিতরে।

'একী! আধ খাওয়া কুকি... একটা পেনি... টিশু পেপার?'

'রিটা হাওয়ার্থের স্যুভ্‌নিয়ার জোগাড় করছি আমি। দারুণ না?'

'জানলে কীভাবে এগুলো সব রিটা ব্যবহার করেছে?' জিজ্ঞেস করল বেকি।

ব্যাগটা ঝট করে সরিয়ে নিল শিপটন।

'এগুলো সবই ওর ট্রেইলরের আশপাশে পেয়েছি কিনা।'

ওরা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল।

'শিপটন রিটার প্রেমে পড়েছে! শিপটন রিটার প্রেমে পড়েছে!' সুর করে গেয়ে উঠল মুসা।

লাজরাঙা হয়ে গেল শিপটনের মুখের চেহারা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে হাঁটা দিল। পালিয়ে বাঁচল আরকী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেকি।

'মানুষ যে কত রকমের হয়!'

'ঠিকই বলেছ,' বলল রবিন। 'বিচিত্র মানুষ দেখতে চাইলে ওদিকে তাকাও। দেখো কে এসেছে।'

কিশোর ঘুরে চাইল। এক ট্রেইলরের সামনে দাঁড়িয়ে শুঁটকি টেরি। মাটিতে লাথি মারছে জুতোর আগা দিয়ে।

'হায়, হায়! টেরিও সিনেমায় চান্স পেয়েছে নাকি?' বলে উঠল বেকি।

শুঁটকির হাতে প্যাড আর পেন্সিল।

'মনে হয় ডয়েল নিউজের জন্যে আর্টিক্‌ল্‌ লিখছে,' জানাল কিশোর।

'ডয়েল পি-উজ বলো,' বলে হেসে ফেলল নথি।

ডয়েল নিউজ শুঁটকির নিজের কাগজ। বাসায় বসে বাবার কম্পিউটারে লেখালেখি করে।

ঠিক এমনিসময় ট্রেইলরের দরজা হাট হয়ে খুলে গেল। কোঁকড়া, বাদামিচুলো তিন গোয়েন্দার সমবয়সী এক কিশোরী পা রাখল বাইরে।

'রিটা!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর।

তিন গোয়েন্দা ও বেকি এগিয়ে গেল হন্তদন্ত হয়ে। কিন্তু ওদের সামনে লাফিয়ে পড়ল টেরি। একটা হাত উঁচিয়ে।

'সরে যাও!' হুঙ্কার ছাড়ল। প্যাড দুলিয়ে বলল, 'ওকে আমি আগে দেখেছি।'

ওদের চোখের সামনে রিটার দিকে এক পা এগিয়ে গেল শুঁটকি।

'ডয়েল নিউজের জন্যে কয়েকটা প্রশ্ন,' বলল। 'কথাটা কি সত্যি, তুমি তোমার সিরিয়ালে কমলার রস ঢালো?'

'আমি দুঃখিত। আমার হাতে সময় নেই। আজ ইন্টারভিউ দিতে পারছি না,' নরম সুরে জানাল রিটা।

'মানে!' ঢোক গিলল শুঁটকি।

'কাল নিলে হয় না?' বাতলে দিল রিটা।

মাটিতে পা ঠুকল শুঁটকি।

'কালকে রবিবার। আমি একটা বার্থডে পার্টিতে যাব।'

'সেক্ষেত্রে আমি দুঃখিত,' বলল রিটা।

'আমিও,' গলায় শয়তানী ঢেলে বলল শুটকি। 'আমি বদদোয়া দিচ্ছি, টোটালি রিটা যেন টোটালি ফ্লপ করে।' কথা কটা বলে গটগট করে চলে গেল ও।

'ওর সমস্যাটা কী?' রিটা প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল কিশোর।

'সমস্যা কিছুই না। ও আসলে টোটালি শুটকি।'

নিজেদের পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা আর বেকি। কিশোরকে চিনতে পারল রিটা। 'ও, তুমি তো অভিনয় করতে। তোমার অভিনয় আমার ভাল লাগত। এখন করো না?'

'এই যে করছি তোমার সাথে,' বলল কিশোর।

'ভেরি গুড,' বলল রিটা। একটু পরে ওকে পোশাকের ট্রায়াল দিতে যেতে হলো।

'পরে দেখা হবে,' বলল ও। কাঁধের উপর দিয়ে চেয়ে হাসল। 'আমি কিন্তু সিরিয়ালে কমলার রস ঢালি না।'

'ভাল মেয়ে, চমৎকার ব্যবহার,' রিটা চলে গেলে বলল কিশোর।

'কী মনে হয়, ও আমার স্নিকার্স দেখেছে?' বেকি প্রশ্ন করল।

'না দেখে উপায় আছে? তুমি যেভাবে পা নাড়ছিলে,' বলল মুসা।

'ইচ্ছে করে করিনি। হয়তো নিজের অজান্তেই হয়ে গেছে,' সাফাই দিল বেকি।

এসময় শোনা গেল হেলগা ওদের নাম ধরে ডাকছেন।

'তোমরা পিযা পার্লার সিনে থাকছ,' বললেন। 'এসো আমার সাথে।'

'দারুণ!' বলে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান।

রায়ান ডিফোর পিযার দোকানটা আজকে চেনাই যাচ্ছে না। ক্যামেরা আর লাইট দিয়ে ঠাসা। সিনেমার নাম লেখা ক্যাপ পরে শশব্যস্তে চলাফেরা করছে মানুষ-জন।

'হাই, কিড্স্,' দাড়িওয়ালা এক লোক বলে উঠলেন। 'আমি এ ছবির পরিচালক, রয় হার্ভে।'

হাত বাড়িয়ে দিল বেকি।

'বেকি থ্যাচার। অভিনেত্রী এবং আগামীর তারকা।'

মি. হার্ভে ওদেরকে একটা টেবিল দেখিয়ে দিলেন। ওটার উপরে ধোঁয়া ওঠা এক বড়সড় পিযা।

'খাইছে! হেভি টেস্টি হবে মনে হচ্ছে!' কান পর্যন্ত হাসল মুসা। 'ও, মেয়েরাও আছে এই দৃশ্যে।'

জুলি, শ্যারন আর সিন্ডি কাছের এক টেবিলে বসা। হাসাহাসি করছে ওরা। পেপারনির টুকরো সাঁটছে চোখের উপরে।

'ওকে, সিনটা এরকম,' বলে উঠলেন মি. হার্ভে। 'রিটার ভীষণ খিদে

পেয়েছে। ও পিযা পার্লারে ছুটে এসে ঢুকবে। ও বলবে, "এক্ষুনি আমি বাড়তি পনির দিয়ে একটা পেপারনি পাই চাই।" কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

মুসা হাত তুলল।

'আমরা কি পিযাটা খেতে পারি?'

'হ্যাঁ,' জানালেন মি. হার্ভে।

এবার হাত উঠাল বেকি।

'আমি যদি রিটাকে বলি, পেপারনির বদলে মাশরুম অর্ডার দিতে তা হলে কি কোনও অসুবিধা আছে?' প্রশ্ন করল ও। 'এবং আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে বলে ও যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তা হলে কেমন হয়?'

'তোমার কোনও ডায়ালগ নেই,' সাফ জানিয়ে দিলেন পরিচালক।

ধসে পড়ল যেন বেকি।

হা-হা করে হেসে উঠল শ্যারন।

মি. হার্ভে ইঙ্গিত দিলেন। জ্বলে উঠল চোখ ধাঁধানো আলো।

'অ্যাকশন!' চিৎকার ছাড়লেন ভদ্রলোক।

দরজা খুলে গেল দড়াম করে। রিটা দৌড়ে এসে ঢুকল।

'আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। এক্ষুনি আমি–'

'ইইইক!' আঁতকে উঠল রবিন। চেয়ার ছেড়ে সটান উঠে দাঁড়াল এক লাফে। 'পিযার ওপর এটা কী?'

দুই

'কাট!'

ছেলে-মেয়েরা উঠে পড়ল টেবিল ছেড়ে। পিছিয়ে গেল।

কিশোর ঝুঁকে পড়ল টেবিলের উপর।

'আরি, এটা তো একটা কাছিম!' বলল।

'আমার ডিক!' রিটা চিৎকার করে উঠল।

ছুটে এসে কাছিমটাকে তুলে নিল ও। ইঞ্চি তিনেক লম্বা ওটা।

'সেটে আবারও গণ্ডগোল পাকাচ্ছে কেন কাছিমটা?' জবাব দাবি করলেন মি. হার্ভে।

মুখে ফুটি-ফুটি দাগওয়ালা এক যুবকের উদ্দেশে ঘুরে দাড়ালেন হেলগা।

'জন, তোমার ওপর না দায়িত্ব ছিল ডিককে দেখে রাখার?'

জন একটা গোলাপি রঙের কেস তুলে ধরল।

'ও আবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।'

কিশোর লক্ষ করল, কাছিমটার পিঠে সযত্নে হাত বুলাচ্ছে রিটা।

'তুমি এটাকে পোষো?' প্রশ্ন করল ও।

মাথা ঝাঁকাল রিটা।

'ও আমার সাথে সবখানে যায়। এমনকী ছবির সেটেও।'

বেকি কিশোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল।

'একটা কাছিম পেলে আমিও রিটার মত হতে পারব,' বলল ফিসফিসিয়ে। 'লাল স্নিকার্স তো আছেই।'

পিযা পার্লারের মালিক রায়ান ডিফো মাথা দোলাল।

'আমার এখানে কোনও জন্তু-জানোয়ার অ্যালাউ করব না। তা সে যত বড় স্টারই হোক না কেন।'

'ডিক স্টার নয়,' বলল রিটা। আঙুল ইশারা করল ডিকের পিঠের উদ্দেশে। তবে ওর খোলে একটা তারা চিহ্ন আছে।'

মুচকি হাসল কিশোর।

'আর মাথায় দুটো ছোট ছোট সাদা ফোঁটা।'

'এবং চার পায়ে পনির আর টমেটো সস,' হেসে উঠে বলল শ্যারন।

'বাচ্চারা,' দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মি. হার্ভে। 'ভুলে যেয়ো না আমরা একটা ছবির শুটিং করছি।'

রিটা আলতো হাতে ডিককে রেখে দিল গোলাপি কেসটার ভিতরে।

'এবার দুটো হুড়কোই লাগিয়ে দিলাম,' বলল কঠোর কণ্ঠে। 'আর পালাতে পারবে না।'

কেসটা ফিরিয়ে দিল জনের হাতে।

'যে যার জায়গা নাও!' আদেশ করলেন মি. হার্ভে।

'এই নাও,' বলল ডিফো। আরেকটা পিযা এনে রাখল কিশোরদের টেবিলে। 'এক্সট্রা পনির দিয়েছি, আর এতে কাছিমের পাও পড়েনি।'

ওরা হেসে উঠল।

'টেক টু!' হাঁক ছাড়লেন মি. হার্ভে।

'এর মানে আবার শুরু করা যাক,' ফিসফিস করে জানাল কিশোর।

আলো ঝলসে উঠল আবারও। মি. হার্ভে দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'অ্যাকশন!'

দ্বিতীয় টেক-এ রিটা ওর সংলাপ ভুল করল। তৃতীয় টেক-এ সিন্ডির হাতের পিযাটা মাটিতে পড়ে গেল। চতুর্থ টেক-এ আর কোনও গোলমাল হলো না।

'সবাইকে ধন্যবাদ,' জানালেন মি. হার্ভে।

'এখন পনেরো মিনিটের বিরতি,' ঘোষণা করলেন হেলগা। তিন গোয়েন্দা আর বেকির দিকে চেয়ে স্মিত হাসলেন। 'আজকের মত তোমাদের কাজ শেষ।'

মেয়েরা যার যার ভাগের পিযা নিয়ে বেরিয়ে এল পার্লার ছেড়ে।

ছেলেরা চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, রিটা টোকা দিল কিশোরের কাঁধে।

'কিশোর? আমাকে একটু মেকআপ ট্রেইলরে যেতে হচ্ছে। তুমি কি ডিককে ততক্ষণ্ দেখে রাখতে পারবে?'

কিশোর খানিকটা অবাকই হলো।

'ডিক না তোমার সাথে সবখানে যায়?' বলল।

'হ্যাঁ, কিন্তু পাউডার নাকে গেলে হাঁচি পায় ওর,' জানাল রিটা।

'খাইছে! কাছিমেও হাঁচি দেয়?' মুসা হতভম্ব।

'ঠিক আছে, আমি ডিককে দেখে রাখব,' চট করে বলল কিশোর। চোখের কোণে দেখল বেকি ওর দিকে ক্রুদ্ধ চাউনি হানছে।

'ধন্যবাদ,' বলল রিটা। কিশোরের হাতে প্লাস্টিকের কেসটা ধরিয়ে দিল। 'ওকে দেখে রেখো। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।'

'খাইছে!' রিটা চলে গেলে বলে উঠল মুসা। 'কিশোর একজন মুভি স্টারকে সাহায্য করছে!'

'খালি কিশোর! কিশোর! কিশোর!' রাগত স্বরে বলে উঠল বেকি। কোমরে দু'হাত রেখেছে। 'আমি স্কুলের সেরা অভিনেত্রী। রিটার উচিত ছিল ডিককে আমার হাতে দেয়া।'

'অভিনয়ের সাথে কাছিমের কী সম্পর্ক?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সে তুমি বুঝবে না!' নাটুকে ভঙ্গিতে বলল বেকি। হাতঘড়ি দেখল। 'আমি যাই। বাবা অপেক্ষা করবে।'

ছেলেরা ওকে হেঁটে চলে যেতে দেখল।

'ডিককে ঠিক মত দেখে রাখতে হবে,' বলল কিশোর।

মুসা এক স্ন্যাক্স টেবিলের উদ্দেশে আঙুল তাক করল।

'আমি ডৌনাট খাব। তোমরা খেলে এসো।'

মাথা নাড়ল কিশোর।

'পাউডার দেয়া চিনিতে ডিকের হাঁচি পেতে পারে।'

'তা ঠিক,' বলল রবিন, 'আমি তোমাকে পাউডার ছাড়া ডৌনাট এনে দেব।'

'আচ্ছা!' বলল কিশোর। টেবিলের দিকে বন্ধুদেরকে এগিয়ে যেতে দেখল।

ও ডিকের কেসে যেই উঁকি দিতে যাবে, শুনতে পেল দু'জন নারী-পুরুষ তর্কাতর্কি করছে। মুখ তুলে চেয়ে দেখে মি. হার্ভে ও হেলগা।

'হেলগা, কাছিমটাকে খেদাতে হবে। ও যতবার কেস থেকে পালায় ততবারই বেহুদা সময় নষ্ট হয় আমাদের।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল কিশোরের। ডিকের কথা বলছেন পরিচালক?

'কিন্তু রিটা ডিককে ভালবাসে,' আপত্তির সুরে বললেন হেলগা। 'আর ও কথা দিয়েছে এখন থেকে দুটো হুড়কোই লাগিয়ে রাখবে।'

'সিমেন্টের বাক্সে ভরে রাখলেও কেয়ার করি না আমি। ওটাকে আমার সেটে চাই না, ব্যস।'

'ঠিক আছে, মিস্টার হার্ভে,' বললেন হেলগা।

ডিকের কেসটা পিঠের কাছে নিয়ে আড়াল করল গোয়েন্দাপ্রধান। মি. হার্ভে ও হেলগাকে চলে যেতে দেখল।

এসময় বন্ধুরা ওর জন্য চকোলেট ডোনাট নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল।

'স্ন্যাক টেবিলের নীচে লুকিয়ে ছিল মেয়েরা,' বলল নথি। 'সিন্ডি আমার জুতোর ফিতে দুটো একসঙ্গে বেঁধে দেয়ার চেষ্টা করছিল।'

কিশোর ওদেরকে যা শুনেছে সব বলতে যাবে, ওর বাহু আঁকড়ে ধরল রবিন।

'কী ব্যাপার?'

'মনে হচ্ছে আরেকজন বিখ্যাত মুভি স্টারকে দেখলাম!'

'খাইছে!'

'চলো ঘোরাঘুরি করে দেখি ক'জন স্টার এসেছে,' প্রস্তাব করল নথি। 'তারপর তাদের অটোগ্রাফ নেয়া যাবে।'

'কিন্তু আমি যে রিটাকে কথা দিয়েছি ডিককে দেখে রাখব।'

হতাশ দেখাল রবিনকে।

'তোমরা দু'জন যাও। আমি ড়িককে নিয়ে এখানে থাকছি,' বাতলে দিল মুসা।

হাতের কেসটার দিকে চোখ নামিয়ে তাকাল কিশোর।

'কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি–'

'চিন্তা কোরো না। আমি এই বেঞ্চটায় বসে থাকব,' বলল মুসা। ভ্রূ দেখাল কাছের এক বেঞ্চের দিকে।

'চলো, কিশোর। এমন সুযোগ বারবার আসে না।'

মুসার প্রস্তাবটা উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল কিশোর। তারপর মুচকি হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। প্রিয় বন্ধুকে যদি বিশ্বাস করতে না পারে তো কাকে পারবে?

'ধন্যবাদ, মুসা,' বলে কেসটা তুলে দিল।

অনেক তারকাকেই সেটে পেয়ে গেল ওরা। একটু পরেই দেখা গেল চারটে করে অটোগ্রাফ জোগাড় হয়ে গেছে ওদের।

'কপাল বলতে হবে আমাদের!' অটোগ্রাফের খাতা দুলিয়ে বলে উঠল নথি।

হঠাৎই প্রচণ্ড এক শব্দ কানে এল ওদের।

'কী ব্যাপার?' চারধারে নজর বুলাল কিশোর।

'হায়, হায়! মেয়েরা স্ন্যাক টেবিলটা উল্টে দিয়েছে!' রবিন জানাল।

ডোনাট গড়াগড়ি খাচ্ছে চারদিকে। খানিক পরে, মুসার কাছে ফিরে এল কিশোর ও রবিন।

'ডিকের কী খবর, মুসা?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'ডি-ডিক? খাইছে!'

স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল কিশোর। মুসাকে ভূতগ্রস্তের মত দেখাচ্ছে।

'কী হয়েছে?'

'শরীর খারাপ লাগছে ডোনাট খেয়ে?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

মাথা নাড়ল মুসা।

'শব্দটা শুনে কী হলো দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ি আমি। ডিকের ওপর নজর রাখতে পারিনি মিনিট খানেকের জন্যে।'

গলার কাছে শুকনো ঠেকল কিশোরের।

'মুসা? ডিক কি–'

প্লাস্টিকের কেসটা ধরে ঝাঁকাল মুসা। ছোট্ট দরজাটা খোলা।

'পালিয়েছে!' বিলাপ করে উঠল মুসা। 'কাছিমটা পালিয়েছে!'

তিন

'বলো কী!'

'আমরা ওকে খুঁজে বের করব,' বলল রবিন। 'কাছিম আর কদ্দূর যাবে?'

বেঞ্চের আশপাশে তল্লাশী চালাল ছেলেরা। বেঞ্চের তলাতেও ঢুকল হামাগুড়ি দিয়ে।

'নাহ্, এখানে নেই,' মুসা বলল।

পেটের মধ্যে মোচড় মেরে উঠল কিশোরের।

'রিটাকে মুখ দেখাব কী করে?'

কিশোরের কাঁধের উপর দিয়ে আঙুল দেখাল নথি। ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর ঘুরে দাঁড়াল পাঁই করে। ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রিটা।

'এখানে কী নেই?' প্রশ্ন করল রিটা।

'উম,' বলল মুসা। 'ডিক মনে হয়... হাঁটাহাঁটি করতে গেছে।'

'তারমানে পালিয়েছে?' সভয়ে শ্বাস চাপল রিটা।

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। মাথা নাড়ল।

'আমি কিন্তু তোমার ওপর ভরসা করেছিলাম,' কিশোরকে উদ্দেশ্য করে বলল রিটা।

'দোষটা আমার। আমি ডিককে দেখে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলাম,' অকপটে জানাল মুসা।

'আমরা সবখানে খুঁজেছি,' বলল কিশোর।

রিটার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'ডিক এর আগে কখনও বাইরে চলে যায়নি। এখন কোথায় আছে কে জানে,' বলল ও।

রবিন ওর কাঁধ চাপড়ে দিল।

'ডিককে ঠিক পেয়ে যাবে। সোমবার আমাদের স্কুলে আসছ তো তুমি, তার

আগেই পেয়ে যাবে।'

ওদের দিকে তাকাল রিটা।

'তোমরা সবাই রকি বিচ স্কুলের ছাত্র?'

ছেলেরা মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল।

'তুমি আসছ তো?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'তোমরা যা করলে তারপরও? প্রশ্নই ওঠে না!'

'রিটা, দাঁড়াও!' মেয়েটি ট্রেইলের দিকে দৌড় দিলে পিছু ডাকল নথি।

'খাইছে! স্কুলের ছেলে-মেয়েরা আমার সাথে আর কথা বলবে না।'

'আমার সাথেও না,' বলল কিশোর।

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'কারণ ও আমার ওপর দেখে রাখার দায়িত্ব দিয়েছিল, এবং আমি সেটা পালন করতে পারিনি।'

বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসল মুসা।

'ও না এলে না আসুক, কার কী এসে যায়?'

শ্রাগ করল রবিন।

'সবারই এসে যায়।'

বেঞ্চের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিশোর। ডিক পালিয়েছে বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। রিটা তো দুটো হুড়কোই লাগিয়ে দিয়েছিল।

'এর মধ্যে কিছু একটা গড়বড় আছে,' আস্তে করে বলল কিশোর। বেঞ্চটার কাছে হেঁটে এসে আঙুল টেনে নিল সিটের উপর দিয়ে।

'কী করছ?' মুসা জানতে চাইল।

'ডিকের পায়ে পিযার টমেটো সস লেগে ছিল,' মনে করিয়ে দিল কিশোর।

'তো?' রবিন বলল।

'ডিক পালালে দাগ রেখে যেত, তাই না?'

'তা ঠিক,' সায় দিল মুসা।

'ডিক হয়তো পালায়নি,' বলল কিশোর। 'ওকে হয়তো চুরি করা হয়েছে।'

'বলো কী?' বিস্ময় প্রকাশ পেল রবিনের কণ্ঠে।

'ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে দেখা যাক,' বলল মুসা। 'বেঞ্চের ওপর যখন কেসটা রাখি, দরজাটা ছিল সামনের দিকে।'

'বলে যাও,' তাগাদা দিল গোয়েন্দাপ্রধান।

'কিন্তু ডিক হারিয়ে যাওয়ার পর কেসের দরজাটা পিছনমুখো পেয়েছি।'

আঙুল মটকাল কিশোর।

'কাছিম চোর হয়তো কেসটা খোলার জন্যে উল্টে দিয়েছিল,' বলল।

'ভাল রহস্য পাকিয়েছে তো,' বলল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'এর সমাধান করার দায়িত্বও আমাদের। ডিককে খুঁজে বের করতে হবে।

নইলে রিটা সোমবার আমাদের স্কুলে আসবে না।'

'তোমার নোটবুকটা থাকলে ভাল হত,' রবিন আফসোস করল।

জ্যাকেটের পকেট থেকে লাল রঙের নোটবুকটা বের করল কিশোর।

'নেই কে বলল?'

'সামনে অনেক কাজ বাকি, কিশোর,' মুসা বলল।

সাদা এক পাতা বের করল কিশোর। সন্দেহভাজনদের নামের তালিকা টুকতে লাগল।

'কাছিমটা কার এত দরকার পড়ল?' মুসা প্রশ্ন করল।

'যেখানে বিড়ালছানারা অনেক বেশি সুন্দর,' বলল রবিন।

রবিন আর মুসা কিশোরের কাঁধের উপর দিয়ে চেয়ে দেখে, ও লিখেছে, হেলগা।'

'পরিচালকের সহকারী?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'খাইছে! উনি এত ভাল মানুষ,' বলল মুসা।

'আমি মিস্টার হার্ভের সঙ্গে ওঁর কথা-বার্তা শুনে ফেলেছি। মিস্টার হার্ভে হেলগাকে বলেছেন কাছিমটাকে দূর করে দিতে। কথাগুলো আমার কানে আদেশের মতই শুনিয়েছে।'

'খাইছে!'

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। চিন্তামগ্ন।

'আর কে?'

'শুটকি নিতে পারে না?'

রবিনের প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়ল কিশোর।

'ও আগেই চলে গেছে। ডিককে হয়তো দেখেওনি।'

দু'মুহূর্ত ভেবে নিল কিশোর। তারপর নাম টুকে নিল বেকির।

''ওকে সন্দেহ করছ কেন?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'ডিকের দেখাশোনার ভার পায়নি বলে খেপে গিয়েছিল বেকি,' ব্যাখ্যা করল কিশোর।

'আর ও বলেছিল রিটার মত হতে চাইলে ওরও একটা কাছিম থাকা দরকার,' যোগ করল মুসা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন।

'শুধু চুল কোঁকড়া করলেই তো পারে।'

ঘড়ি দেখল কিশোর। মেরি চাচীর আসার সময় হয়ে গেছে। ছেলেরা মুভি সেট ছেড়ে মেইন স্ট্রিটের কোনায় চলে এল।

রবিন সহসা কিশোরের বাহু চেপে ধরল।

'কিশোর! দেখো কে বেরোচ্ছে দোকান থেকে,' বলল অনুচ্চস্বরে।

পেট শপটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। বেকি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, হাতে কাগজের এক শপিং ব্যাগ।

'অদ্ভুত ব্যাপার, বেকি তো কিছু পালে না,' বলল মুসা। 'ওর তো ওই দোকানে যাওয়ার কথা না!'

'যদি না ও নতুন একটা কাছিমের মালিক হয়,' বলল কিশোর। 'সেটার নাম ডিক।'

ছেলেরা হেঁটে এল বেকির কাছে।

'হাই, বেকি,' বলে ব্যাগটা আঙুল দিয়ে দেখাল কিশোর। 'নতুন কিছু কিনলে বুঝি?'

'আমি–' বলতে শুরু করেছিল বেকি।

এসময় মি.থ্যাচার দরজা দিয়ে মাথা বের করলেন।

'বেকি? আরেকটা জিনিস নিতে পারবে?'

'পারব, বাবা,' বলল বেকি। শপিং ব্যাগটা সাইডওঅকে রেখে দোকানে গিয়ে ঢুকল বেকি।

ব্যাগটার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করল ওরা।

'দেখব নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'কাজটা ঠিক হবে না,' বলল নথি।

'জাস্ট উঁকি দিয়ে দেখব,' জানাল মুসা, 'খুলে তো দেখছি না।'

'বেকি ফিরুক আগে,' বলল কিশোর। 'হয়তো–'

কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে। ব্যাগের একটা দিক চেপে ধরেছে মুসা।

'আমিও দেখব,' বলে অপর হাতলটা আঁকড়ে ধরল রবিন।

পরমুহূর্তে ফড়-ফড় করে দু'ভাগ হয়ে গেল ব্যাগটা। ভেতরে যা কিছু ছিল ছড়িয়ে পড়ল বাইরে।

মাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ছেলেরা।

'কিশোর?' নিচু স্বরে বলল মুসা। 'দেখো!'

একটা কাছিমের ট্যাঙ্ক, এক ঠোঙা টার্টল চপ, আর কাছিমের খেলনা দেখা যাচ্ছে।

একটা শিশি তুলে নিল রবিন।

'কাছিমেরা ভিটামিন খায় জানা ছিল না,' বলল।

'এর মানে কী, কিশোর!' মুসা উত্তেজিত। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল গোয়েন্দাপ্রধান।

'বেকি কিছু একটা পুষবে ঠিক করেছে। এবং সেটা একটা কাছিম!'

চার

'খাইছে! বেকি তারমানে ডিককে চুরি করেছে।'

'তা না হলে এসব জিনিস কিনেছে কী জন্যে?' রবিন প্রশ্ন করল।

'কী করছ তোমরা?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ঘুরে দাঁড়াল ছেলেরা, বেকি কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে।

'আমার ব্যাগ ঘাঁটাঘাঁটি করছিলে তোমরা, তাই না?'

'উঁকি মেরে দেখছিলাম, ঘাঁটতে যাব কেন?' দুর্বল গলায় বলল রবিন।

বেকির হাতের দিকে দৃষ্টি গেল কিশোরের। ওর হাতে একটা গোলাপি রঙের প্লাস্টিক কেস। ঠিক রিটার মত।

'ব্যাগটা ছিঁড়ল কীভাবে? তোমাদের চোখে এমনই শক্তি যে তাকাতেই ছিঁড়ে গেল?' জবাব চাইল বেকি।

সোজা কাজের কথায় চলে এল কিশোর।

'ডিক হারিয়ে গেছে,' জানাল।

'রিটার কাছিম?'

'ওকে দেখেছ তুমি?' কিশোরের জিজ্ঞাসা।

'নাহ।'

কেসটার উদ্দেশে আঙুল দেখাল কিশোর।

'তা হলে ওটার ভিতরে কে?'

মৃদু হাসল বেকি, ঢাকনা খুলে হাত ভরে দিল ভিতরে।

'টা-ডা,' গেয়ে উঠল, একটা কাছিম বের করে ওদেরকে তুলে ধরে দেখাল।

'এ হচ্ছে জেনিফার।'

'জেনিফার?' কিশোর বলল।

'শুধু স্নিকার্সে মন ভরেনি আমার। তাই রিটার মত একটা কাছিমও জোগাড় করেছি।'

'বুঝলাম। কিন্তু এটা যে ডিক নয় জানব কীভাবে?' নথি বলল।

বেকি ওর হাতে তুলে দিল কাছিমটা।

'নিজেই দেখো,' বলল।

'ইইইউউউ!' চেঁচিয়ে উঠে, কিশোরের হাতে ঝটপট ওটাকে গছিয়ে দিল নথি।

'ওর খোলে তারা চিহ্ন আছে? কিংবা মাথায় দুটো সাদা ফুটকি?' বেকি জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল কিশোর। এটা ডিক নয়, জেনিফার।

'তোমরা ভেবেছিলে আমি ডিককে চুরি করেছি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল বেকি। 'আমার নামটাও বোধহয় টুকেছ নোটবুকে?'

'সরি, বেকি। তুমি যেরকম খেপে উঠেছিলে তাতে যে কেউই তোমাকে সন্দেহ করতে পারে,' নরম গলায় বলল কিশোর।

'প্রথমটায় খেপেই গিয়েছিলাম, কিন্তু পরে একটা জরুরি বিষয় মাথায় আসতে ঠাণ্ডা হয়ে যাই।'

'কী সেটা?' রবিন সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

নাটুকে ভঙ্গিতে জেনিফারকে তুলে ধরল বেকি।

'একদিন যখন আমার নাম ফেটে পড়বে, তখন সবাই আমার কাছিমকে দেখে রাখতে চাইবে।'

'খাইছে!'

ছেলেরা নতুন এক ব্যাগে সব জিনিসপত্র তুলে রাখতে সাহায্য করল বেকিকে। ওদের কাজ শেষ হওয়ার একটু পরে, মেরি চাচী পৌঁছে গেলেন গাড়ি নিয়ে।

গাড়িতে বসার পর বেকির নাম কেটে দিল কিশোর নোটবুক থেকে। এখন বাকি রইল শুধু হেলগার নাম।

'ক্রু খুঁজতে আমাদেরকে মুভি সেটে ফিরে যেতে হবে,' বলল কিশোর।

'কিন্তু আমরা তো এতক্ষণ ওখানেই ছিলাম,' রবিন বলল।

শ্রাগ করে মুচকি হাসল গোয়েন্দাপ্রধান।

'মনে করো ওটা হবে টেক-টু!'

বিকেলে তিন গোয়েন্দা বাইক নিয়ে মেইন স্ট্রিটের উদ্দেশে চলল। বাসা থেকে অনুমতি নিয়েছে। পথে, এক জায়গায় বাইক থামিয়ে পাণ্ডা বার কিনল ওরা– এক আইসক্রিম বিক্রির ট্রাক থেকে।

এক গাছের গায়ে সাইকেল হেলান দিয়ে রাখল তিন বন্ধু। আইসক্রিমের মোড়ক খুলতে যাবে, দুটো ছোট ছেলেকে এদিকে হেঁটে আসতে দেখল।

'কেন শিপটনের যমজ ভাই দুটো না?' রবিন বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'মানি অর পেনি।'

'শিপটনদের বাসার সামনে ট্রাক দাঁড় করিয়েছে কেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

ছেলেদের সামনে এসে দাঁড়াল যমজরা। জুলজুল করে চেয়ে রয়েছে।

'কী চাও তোমরা?' মুসা প্রশ্ন করল।

মানি ওদের হাতে ধরা পাণ্ডা বার আঙুল দিয়ে দেখাল।

'ওগুলো!'

'কিনে খেলেই পারো,' বলল রবিন।

মানি আর পেনি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হেসে উঠল খিলখিলিয়ে। তারপর সুর করে গাইতে লাগল: 'আমরা যা জানি তোমরা তা জানো না! আমরা যা জানি তোমরা তা জানো না!'

'কী জানো তোমরা?' কিশোর জবাব চাইল।

'কেনের ঘর ভর্তি রিটার জিনিস,' বলল পেনি। 'দেখতে চাও?'

'কেন বাসায় নেই। ওর ঘরে ইচ্ছে করলে যেতে পারো তোমরা,' বলল মানি।

'দরকার নেই,' বলল মুসা। 'ওর পচা-পচা স্যুভনিয়ারগুলো আমাদের দেখা আছে।'

কিশোর বন্ধুদেরকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল।

'কী ব্যাপার, কিশোর?' অবাক হলো নথি।

'কেন ওর কালেকশনে ডিককেও রেখে থাকতে পারে,' জানাল গোয়েন্দাপ্রধান।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মুসা।

'কেন শিপটন– খাঁটি সাসপেক্ট।'

শিপটন যমজদের কাছে ফিরে এল তিন বন্ধু।

'ওকে, চলো,' বলল মুসা।

'এত তাড়া কেন,' বলল মানি। দু'ভাই হাত পাতল।

তিন বন্ধু পাণ্ডা বার তুলে দিল ওদের হাতে। চোখের পলকে মোড়ক খুলে ফেলল যমজরা।

'যাও,' মুখ ভর্তি আইসক্রিম নিয়ে বলল পেনি।

ছেলেরা দ্রুত পায়ে এগোল বাড়িটার দিকে। কেন শিপটনের কামরা চেনে ওরা, আগেও এসেছে।

'শোনো,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল মানি, 'কেন একটা নতুন জানোয়ার পুষছে। ওটাকে দেখতে ভুলো না যেন!'

পাঁচ

'কী বলল শুনলে?' কিশোর প্রশ্ন করল।

ছেলেরা হাঁটা থামাল।

'ডিক!' চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে। ছুটে গিয়ে বেল টিপল। কেন শিপটনের মা সাড়া দিলেন।

'কেমন আছ তোমরা?'

'আপনি ভাল আছেন, মিসেস শিপটন?' চট করে বলল কিশোর। 'শুনলাম কেন নাকি নতুন এক জানোয়ার পালছে। তাই দেখতে এলাম আরকী।'

'এসো,' সাদরে ডাকলেন মিসেস শিপটন। 'কেন সারাদিন পড়ে থাকে ওটাকে নিয়ে।'

'ধন্যবাদ, মিসেস শিপটন,' বলল মুসা।

ছেলেরা তরতর করে সিঁড়ি ভাঙছে।

কেন শিপটনের ঘরের দরজা খুলল কিশোর।

ভিতরে পা রাখল ছেলেরা। ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত

মোজা। নাক টিপে ধরল মুসা আর রবিন।

'কী করে রেখেছে ঘরটাকে!' মন্তব্য করল নথি।

চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল কিশোর। রিটা হাওয়ার্থের পোস্টার টেপ দিয়ে সাঁটানো শিপটনের ডেস্কের সঙ্গে। দেয়ালে সাঁটা বিখ্যাত জাদুকরদের ছবি। শিপটন ভবিষ্যতে জাদুকর হতে চায় জানা আছে ওদের।

'দেরি না করে সূত্র খোঁজা যাক,' বলল কিশোর।

হেঁটে বেড়াতে লাগল ওরা ঘরময়। জার ও বাক্স ভর্তি এক টেবিল খুঁজে পেল কিশোর। প্রতিটায় লেবেল সাঁটানো। তাতে লেখা: রিটা।

প্রত্যেকটা বাক্স আর জারের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল তিন গোয়েন্দা। প্রচুর জঞ্জাল পাওয়া গেল, কিন্তু ডিকের দেখা নেই।

'ওর ডেস্কটা চেক করে দেখি,' বলল কিশোর।

কাজটা সহজ নয়। কেন শিপটনের অগোছাল ডেস্ক কাগজ, কলম আর নোটবইয়ে ঠাসা। একটু পরেই, একটা জিনিস দৃষ্টি কেড়ে নিল কিশোরের। জিনিসটা সবুজ রঙের এক প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক।

স্বচ্ছ ঢাকনাটা ভেদ করে দেখতে চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু একটা কাগজ প্রায় ঢেকে রেখেছে ওটাকে। ওতে লেখা: 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পোষা জানোয়ার।'

'মুসা, রবিন,' ডাকল কিশোর।

'কী ওটা?' বলল নথি, দু'জনে ধেয়ে এল কিশোরের কাছে।

ঢাকনাটায় টোকা দিল কিশোর।

'কেনের পোষা জানোয়ারটা মনে হয় এর ভিতরে আছে,' বলল ও।

'দেখা তো যাচ্ছে না, বুঝব কী করে এটাই ডিক?' বলল মুসা।

'জানার একটাই উপায় আছে,' বলে ঢাকনাটা উঠিয়ে ফেলল কিশোর। তারপর ভিতরে উঁকি মেরে সভয়ে শ্বাস চাপল।

সবুজ এক জীব বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে।

'ডিক নাকি?' নথির প্রশ্ন।

'ন-না,' তুতলে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'দে-দেখে ম-মনে হচ্ছে ড্রাগন জাতীয় কিছু!'

ট্যাঙ্ক থেকে জানোয়ারটা মাথা বের করলে, লাফিয়ে পিছু হটল কিশোর। টকাস করে জিভ বের করে কামরার চারধারে নজর বুলাতে লাগল ওটা।

'আগুন ওগরাবে নাকি রে বাবা!' আর্তনাদ ছাড়ল রবিন।

'খাইছে! পালাই চলো!'

দরজা লক্ষ্য করে দৌড় দিল ওরা, কিন্তু যেই বেরোতে যাবে, সরাসরি ধাক্কা খেল কেন শিপটনের সঙ্গে।

'ও-হো!' বলে উঠল কেন। 'আমার জাদুবিদ্যার গোপন খবর নিতে এসেছ, তাই না?'

'মোটেই না,' বলল নথি।

'তোমার ভাইরা তো বলল তুমি বাসায় নেই,' বলল মুসা।

দরজার আড়াল থেকে মুখ বের করল মানি আর পেনি, চকোলেট মাখা মুখে দুষ্টু হাসি লেপ্টে রয়েছে।

'টিমোর সাথে তোমাদের দেখা হয়েছে তারমানে,' বলল কেন। হেঁটে এল ট্যাঙ্কটার কাছে।

'টিমো?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'আমার পোষা ইগুয়ানা,' জানাল কেন, ট্যাঙ্ক থেকে সরীসৃপটাকে বের করে কাঁধের উপর রাখল। ওর বুকে আলতো বাড়ি দিচ্ছে ইগুয়ানার লম্বা লেজ।

'জাদুকর হওয়ার পর যখন শো করব, তখন হ্যাট থেকে বের করব টিমোকে,' বলল কেন।

'জাদুকররা তো খরগোস বের করে,' নথি মনে করিয়ে দিল।

'আমি যে সে জাদুকর নই,' সগর্বে বলল কেন। 'আমি শিপটন দ্য গ্রেট!'

চোখ উল্টাল তিন গোয়েন্দা।

'যাকগে, আমার ঘরে কী করছিলে তোমরা?' প্রশ্ন এল।

'একটা কাছিম হারিয়ে গেছে, সেটা খুঁজছিলাম। রিটার কাছিম,' জানাল কিশোর।

রিটার নাম শুনে দপ করে জ্বলে উঠল কেনের চোখজোড়া।

'রিটার কাছিম আছে জানি, কিন্তু সেটা হারিয়ে গেছে তা তো জানতাম না।'

'তোমার কাছে নেই বলছ?' নথি জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল কেন।

'নেই তাতে কী? খুঁজে বের করব। তারপর রিটার কাছে হিরো হয়ে যাব।'

কেনকে সন্দেহ করার কোনও মানে হয় না, মনে মনে বলল কিশোর। রিটাকে যে এতখানি ভালবাসে সে ওর পোষা কাছিম চুরি করতে যাবে না।

'চলো,' বন্ধুদের উদ্দেশে বলল ও।

'দাঁড়াও!' ডাক ছাড়ল কেন। ওদের মুখের সামনে বাড়িয়ে ধরল টিমোকে। 'ধরে দেখতে চাও?' বলে দাঁত বের করে হাসল।

টিমো জিভ বের করে চোখ পিটপিট করল। ভয়ে জমে যাওয়ার জোগাড় হলো তিন গোয়েন্দার। বিনাবাক্যব্যয়ে তড়িঘড়ি বাড়ি ত্যাগ করল ওরা।

বাইকের কাছে পৌঁছে নোটবুক থেকে কেন শিপটনের নাম কেটে দিল কিশোর।

'কেন পরিষ্কার,' বলল।

'ওর ঘরটা না,' ফুট কাটল মুসা।

তিন গোয়েন্দা বাইক নিয়ে চলে এল মেইন স্ট্রিটে। ছায়াছবির যন্ত্রপাতি আর ট্রেইলর তখনও রয়েছে।

বাইক পার্ক করার পর কিশোর মি. হার্ভে ও হেলগাকে দেখতে পেল।

'এখুনি ওঁদের চোখে পড়তে চাই না, এসো, লুকাই,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'খাইছে! কোথায়?'

ঝট করে চারদিকে চাউনি বুলিয়ে নিল কিশোর। এক ট্রেইলরের নীচে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা।

'ওটার নীচে।'

'নোংরা তো,' আপত্তি করল নথি।

ছেলেরা সাঁত করে ট্রেইলরের নীচে সেঁধিয়ে পড়ে উঁকি মারল। মি. হার্ভে আর হেলগার পা দেখতে পাচ্ছে শুধু।

কান খাড়া করল কিশোর।

'হেলগা, আমি আগেও কচ্ছপ খেয়েছি, কিন্তু এবারেরটার তুলনা হয় না,' বললেন মি. হার্ভে।

অস্ফুট শব্দ করে আঁতকে উঠল রবিন। ওর মুখ চেপে ধরল মুসা।

'সত্যিই অপূর্ব টেস্ট! মেকআপ ট্রেইলরে আরও অনেক রাখা আছে। যখন মন চায় বলবেন, পেয়ে যাবেন,' বললেন হেলগা।

'বাহ,' চমৎকার! বলে উঠলেন মি. হার্ভে।

'শুনলে কী বলল?' ওঁরা চলে গেলে বন্ধুদের উদ্দেশে বলল কিশোর।

'ওঁরা এইমাত্র কাছিম খেয়ে এসেছেন,' বলল রবিন।

'খাইছে! ডিককে খায়নি তো?'

ছয়

'সেটা চেষ্টা করলেই জানা যেতে পারে,' বলল কিশোর। ওরা তিনজন গুড়ি মেরে বেরিয়ে এল ট্রেইলরের তলা থেকে।

'কীভাবে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'মেকআপ ট্রেইলরে আরও কাছিম আছে, হেলগা বলছিলেন,' জানাল কিশোর।

মেইন স্ট্রিটে দৃষ্টি মেলে দিল ও। ব্লকের মাঝামাঝি লম্বা এক ট্রেইলর। দরজায় লেখা রয়েছে: মেকআপ।

আঙুল তাক করে ওটাকে দেখাল কিশোর।

'ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করা দরকার,' বলল।

'চাই কি হয়তো খানিকটা মেকআপও নিতে পারব,' বলল রবিন।

'খাইছে! কোনও দরকার নেই।'

সিঁড়ি ভেঙে ট্রেইলরের দরজার কাছে উঠে এল ছেলেরা। হাতল ধরে টান দিল কিশোর। দরজা খুলে গেলে উঁকি মারল ভিতরে।

'খালি,' বলে পা রাখল। ওকে অনুসরণ করল মুসা আর রবিন।

দেয়াল থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক আয়না। উজ্জ্বল আলো দিয়ে তৈরি ওটার কাঠামো। তিনটে সুইভেল চেয়ার আর একটা টেবিল ভর্তি মেকআপের নানান সরঞ্জাম।

টেবিলের উপর মুখ খোলা এক চকোলেটের বাক্স।

'খাইছে! টেস্ট করতে হচ্ছে, সোৎসাহে বলে উঠল মুসা।

আয়নার কাছে আংটায় লটকানো সুদৃশ্য এক হ্যাট দৃষ্টি কেড়ে নিল কিশোরের।

রিটা এটা পরে কিনা কে জানে, ভাবল ও। হ্যাটটা তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল।

'কেমন দেখাচ্ছে?'

'দারুণ,' বলল রবিন। 'দাঁড়াও, এটা দিয়ে নিই।'

হেসে ফেলল কিশোর। ওর মুখে গোলাপি পাউডার বুলিয়ে দিল নথি।

'সুড়সুড়ি লাগছে!' বলে উঠল কিশোর।

ঠিক এমনিসময় খুলে গেল ট্রেইলরের দরজা। এক মহিলা ও এক পুরুষ দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়। তাদের পরনে কালো আঙরাখা। মহিলার লাল চুল প্রায় গোলাপি দেখাচ্ছে।

'হাই, আমি পপি আর ও বিলি,' বলল মহিলা।

'তোমরা নিশ্চয়ই পরের সিনে কাজ করছ,' বলল লোকটা।

কী বলবে ভেবে পেল না কিশোর। মাথার হ্যাট চেপে ধরল।

'উম... আমরা,' বলল।

'মেকআপ করতে হবে আমাদের?' চট করে প্রশ্ন ছুঁড়ল রবিন।

'নিশ্চয়ই,' জানাল পপি।

মৃদু হেসে চেয়ারে বসে পড়ল রবিন।

'তবে শুরু হয়ে যাক,' বলল।

'কিন্তু—' কিশোর শুরু করেছিল।

বিলি হাততালি দিল। অন্য চেয়ার দুটো দেখাল ও।

'জলদি বসে পড়ো। আমাদের আরও অনেক কাজ বাকি।'

কিশোর টুঁ শব্দটাও করতে পারল না। একটু পরে, কাঁধে প্লাস্টিকের কেপ জড়িয়ে মেকআপ নিতে বসতে হলো।

'তোমার গাল দুটো লাল টুকটুকে,' পপি বলল কিশোরকে।

কিশোর 'ধন্যবাদ' বলতে যাবে, ওর মুখে এক মুঠো রং মাখিয়ে দিল পপি।

'আঘ!' ঢোক গিলল কিশোর। চোখের কোণে দেখল, বিলি মুসার মুখে রুপোলী রং মাখাচ্ছে।

'খাইছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

হেসে ফেলল রবিন। পরমুহূর্তে হাসি বন্ধ হয়ে গেল মুখে গোলাপি প্রলেপ পড়তে।

'ইহ,' বলে উঠল ও।

ছেলেরা আয়নায় চোখ রাখল। মুখ হাঁ।

'এবার চুলের কাজ,' বলল পপি। সে আর বিলি ক্যান বাড়িয়ে ধরল।

'হায়, হায়,' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। চোখ বুজে ফেলল। চোখের পাতা যখন মেলল, চুলের রং তখন গাঢ় নীল। মুসার চুল গোলাপি আর রবিনের উজ্জ্বল কমলা।

'দেখো তো কেমন লাগে?' বলল পপি।

ঢোক গিলল মুসা।

'মনে হচ্ছে সার্কাসের সং।'

'সুপার!' বলল বিলি। তোয়ালেতে হাত মুছে নিল। 'এখন বলো, ক্রানশি টার্টল খাবে?'

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল তিন গোয়েন্দা। কাছিম খেতে বলছে!

দরজা খুলে গেল এসময়। মি. হার্ভে ও হেলগা প্রবেশ করলেন। তাঁদের পিছনে শ্যারন, জুলি আর সিন্ডি।

'সব ঠিকঠাক মত চলছে তো?' মি. হার্ভে প্রশ্ন করলেন।

'জ্বী, সার,' জানাল বিলি।

সিন্ডি কিশোরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হেসে উঠল হা-হা করে।

'কীরকম কিম্ভূত দেখাচ্ছে!'

'এরা তো সঙের দৃশ্যে কাজ করছে না,' হেলগা বললেন বিলি আর পপিকে।

'তাই নাকি?' পপি হতবিহ্বল।

ও, আচ্ছা, তারমানে সং সাজানো হয়েছে আমাদেরকে, ভাবল কিশোর।

'সং সাজছে এরা,' বলে মেয়েদেরকে দেখিয়ে দিলেন হেলগা।

মি. হার্ভে ঘাড় কাত করে ওদের দিকে চাইলেন।

'তোমরা না পিযা পার্লারের সিনে ছিলে?'

নীল মাথা দুলিয়ে সায় জানাল কিশোর।

'তোমরা এখানে ফিরে এলে কেন?'

ধাপ্পা নয়, সত্যি কথা বলব– সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। চেয়ার ছেড়ে পরিচালক ও তার সহকারীর উদ্দেশে হেঁটে গেল।

'আমরা জানতে এসেছিলাম আপনারা দু'জন ডিককে খেয়ে ফেলেছেন কিনা।'

'ক্যামেরাম্যান ডিকের কথা বলছ?' বিলি বলে উঠল।

'ডিক মনে হয় কাছিমের নাম,' ফিসফিস করে বলল পপি।

'এসব কী বলছ আবোল তাবোল?' হেলগা প্রশ্ন করলেন।

'মিস্টার হার্ভে আপনাকে বলেছিলেন ডিককে সরিয়ে দিতে। কথাটা আমি শুনে ফেলেছিলাম।'

'পরে শুনলাম আপনারা বলাবলি করছেন কাছিম খেয়েছেন,' বলল মুসা।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে হেসে উঠলেন মি. হার্ভে ও হেলগা।

'তোমরা ভুল বুঝেছ,' বললেন হেলগা। চকোলেটের বাক্সটা তুলে নিয়ে, বন্ধ করলেন। কিশোর পড়ল ঢাকনায় লেখা: 'ক্রানশি মানচি টার্টলস।'

'কাছিমের আকার দিয়ে বানিয়েছে কিনা তাই এমন নাম রেখেছে,' ব্যাখ্যা করলেন মি. হার্ভে।

'হেলগা কোনও জ্যান্ত কাছিমের ক্ষতি করবে না,' জানাল বিলি। 'ও নিজেও অনেক কিছু পোষে।'

'আর মিস্টার হার্ভের তো খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না,' বলল পপি। 'উনি মাছ-মাংস খান না।'

'কী আমার গোয়েন্দা রে,' কিশোরের উদ্দেশে বলে উঠল সিন্ডি। 'আসল কাছিম আর চকোলেটের পার্থক্যও বোঝে না।'

কান গরম হয়ে গেল কিশোরের। ঘুরে দাঁড়িয়ে শশব্যস্তে ট্রেইলর ত্যাগ করল। ওকে অনুগমন করল মুসা আর রবিন।

'অ্যাই,' চেঁচিয়ে উঠল জুলি। 'ডিককে খুঁজে পেলে আমাদেরকে জানিয়ো কিন্তু। কালকে কাছিম দৌড় আছে।'

'সেই আশাতেই থাকো,' পাল্টা চেঁচাল মুসা।

বাইকের কাছে এসে নোটবুক বের করল কিশোর।

'হেলগা কাছিম চোর নয়। এখন আর কোনও সাসপেক্ট থাকল না।'

'কিশোর,' ফিসফিসিয়ে বলল নথি। 'আমরা ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হয়ে গেছি।'

'কেন?'

'দেখছ না সবাই কীভাবে আমাদেরকে দেখছে?'

'খাইছে! কিন্তু ওরা হাসছে কেন আমাদের দিকে চেয়ে?'

থমকে দাঁড়াল কিশোর। মুখ ঢাকল নোটবুক দিয়ে।

'তার কারণ আর কিছু না, আমাদের সঙের মেকআপ।'

'খাইছে!'

'হায়, হায়!'

সাত

'মাটি ফাঁক হলে ঢুকে পড়তাম!' কাতর কণ্ঠে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

ছেলেরা তড়াক করে বাইকে চাপল। লোকজন ওদেরকে দেখিয়ে হাসাহাসি করছে। গাড়িগুলো হর্ন বাজিয়ে তামাশা করছে। মেইন স্ট্রিট ধরে চলেছে ওরা।

'দেখো, মা, ক্লাউন যাচ্ছে,' ছোট এক ছেলে বলে উঠল। 'আমি সার্কাস দেখব! সার্কাস দেখব!' বায়না জুড়ে দিল।

বাড়ি পৌঁছে দৌড়ে ভিতরে ঢুকল কিশোর। ওর পোষা কুকুর বাঘা ভয় পেয়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

মেরি চাচী চেঁচিয়ে উঠলেন।

'একী দশা হয়েছে তোর?'

'আর বোলো না, চাচী!'

কিশোরকে মুখ আর চুল থেকে রং উঠাতে সাহায্য করলেন চাচী। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে চাচা-চাচীর সঙ্গে ডিনারে বসল ও।

ডিক সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা ওঁদেরকে খুলে বলল কিশোর।

'এখন ক'জন সাসপেক্ট বাকি আছে?' রাশেদ পাশা প্রশ্ন করলেন।

'একজনও না, চাচা।'

'তুই বরং এখন সূত্র খুঁজতে থাক,' পরামর্শ দিলেন চাচী। কিশোরের রুটিতে মাখন মাখিয়ে দিচ্ছেন।

'কিন্তু খুঁজবটা কোথায়?'

চোখ টিপলেন চাচা।

'কখনও কখনও ক্লু নিজেই এসে হাজির হয়।'

'তা হলে শিগ্‌গির আসুক। কেননা সোমবারের মধ্যে কেসটার সমাধান করতে হবে। নইলে কেলেঙ্কারির এক শেষ হবে।'

ডিনার সেরে বন্ধুদেরকে ফোন করল ও। পরদিন সকালে ওর বাসায় আসার অনুমতি নিয়ে রাখতে বলল।

সে রাতে ঘুমাতে কষ্ট হলো কিশোরের।

রবিবার ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। মুখ ধুয়ে জিন্স পরে নিল। টার্টলনেক সোয়েটার পরতে গিয়েও তার বদলে সোয়েটশার্ট পরল।

নাস্তা যেই সেরেছে, ডোরবেল বেজে উঠল।

'আমি দেখছি, চাচী।'

পীপহোলে চোখ রাখল কিশোর। রবিন আর মুসা।

'হাই!' দরজা খুলে বলল কিশোর।

'দরজার কাছে এটা পড়ে ছিল,' বলল রবিন।

ওর হাতে ডয়েল নিউজ।

কাগজটা নিল কিশোর।

'আমি তো হকারের কাছে ডয়েল নিউজ চাইনি,' বলল ও।

'বাঘা হয়তো মুখে করে নিয়ে এসেছে,' বলল মুসা।

শিরোনাম পড়ল কিশোর। **'তারকার মূল্যবান কাছিম নিখোঁজ।'**

দরজার কাছে, সিঁড়ির ধাপে বসল তিন বন্ধু। কাগজটা মেলে ধরে জোরে জোরে পড়ে শোনাল কিশোর: "তথাকথিত গোয়েন্দা কিশোর পাশার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে রিটা হাওয়ার্থের প্রিয় কাছিম হারিয়ে গেছে"।

'তোমার বদনাম না গাইলে ওর পেটের ভাত হজম হয় না,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল নথি।

কিশোর পড়ে চলল, ' " কাছিমটাকে শেষবার দেখা গেছে শনিবার বিকেলে। ওটার খোলে একটা তারা চিহ্ন রয়েছে। আর মাথায় আছে দুটো সাদা ফুটকি" ।'

'তারমানে ডিক উধাও হওয়ার আগে ভাল মত ওকে দেখে রেখেছিল শুঁটকি,' বলল মুসা।

'ও সেট ছেড়ে চলে যায় আগেভাগে,' বলল কিশোর। 'ডিকের নিখুঁত বর্ণনা ও পেল কোত্থেকে? কারও কাছ থেকে শুনে লিখেছে, নাকি–'

'ফিরে এসে চুরি করেছে ডিককে,' বাক্যটা শেষ করল নথি।

'চলো, ওর বাসায় গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করি,' প্রস্তাব করল কিশোর।

'খাইছে! শুঁটকির বাড়ি যাব? তারচেয়ে বরং হানাবাড়িতে যাই চলো!'

'বলা যায় না ওর ওখানে ডিককে পেয়েও যেতে পারি,' বলল কিশোর। খবরের কাগজটার দিকে চেয়ে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। চাচা ঠিকই বলেছিলেন। সূত্র কখনও কখনও সেধে এসে ধরা দেয়।

বাইক নিয়ে টেরির বাসার আঙিনায় ঢুকল ওরা। উঠনে ছিল শুঁটকি। ডয়েল নিউজের কপি স্তূপ করে রাখছিল।

'হ্যালো, টেরি,' বলল কিশোর। উঠনে প্রবেশ করল হেঁটে।

কিশোরের হাতে ধরা কপিটা দেখাল শুঁটকি।

'তোমার হাতে আমার পত্রিকা। তোমার নামের বানান ঠিক লিখেছি তো?'

'এ ব্যাপারে কখনও ভুল হয় তোমার?' মুসা পাল্টা বলল।

'ডিক সম্পর্কে তুমি এত কিছু জানলে কীভাবে, টেরি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জানলাম, কারণ আমি একজন ঝানু রিপোর্টার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। শুঁটকি টেরিকে সহজে বাগে আনা যাবে না। হঠাৎই একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়।

'কিন্তু ডিক ওর নীল রঙের কেসটা থেকে বেরনোর আগেই তো চলে গিয়েছিলে তুমি।'

মাথা নাড়ল শুঁটকি।

'ওটা নীল নয়, গোলাপি কেস ছিল–' বলতে আরম্ভ করে থেমে গেল ও।

মনে মনে হাসল কিশোর। বুদ্ধিটা কাজে দিয়েছে।

'টেরি, ডিকের কেসটা যে গোলাপি তুমি জানলে কীভাবে?'

সটান উঠে দাঁড়াল শুঁটকি। কোমরে হাত।

'তুমি বলতে চাইছ আমি ডিককে চুরি করেছি?'

'আমি জানতে চাইছি শুধু।'

'ভদ্রভাবে,' যোগ করল নথি।

চিবুক বাড়িয়ে দিল শুঁটকি।

'আমি জবাব দিতে বাধ্য নই। তোমার টিকটিকিগিরির থোড়াই কেয়ার করি!'

'তোমার জঘন্য খবরের কাগজেরও থোড়াই কেয়ার করি,' চোখ পাকিয়ে বলল মুসা। কিশোরের হাত থেকে কপিটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। পা বাড়াল শুঁটকিদের ট্র্যাশ বিনের উদ্দেশে।

'মুসা– দাঁড়াও!' কিশোর দৌড়ে এল।

'জঞ্জালের মধ্যেই জায়গা হওয়া উচিত এটার,' বলে উঠল মুসা। রিসাইক্‌ল বিনের ঢাকনা উঠাল। পরমুহূর্তে শ্বাস চাপল।

'কিশোর! দেখো!'

ভিতরে চোখ রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। টার্টল চপের খালি এক ঠোঙা। ঠিক যেমনটা কিনেছিল বেকি থ্যাচার।

ঠোঙাটা তুলে শুঁটকির কাছে নিয়ে এল কিশোর।

'দিয়ে দাও ওটা!' শুঁটকি ঠোঙাটা ছিনিয়ে নিল কিশোরের হাত থেকে।

'তুমি ডিককে চুরি করেছ?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'করেছি তো কী হয়েছে? রিটার উচিত শিক্ষা হয়েছে।'

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'ও আমাকে ইন্টারভিউ দিল না কেন?'

'মুভি সেটে পরে আবার ফিরে গিয়েছিলে কেন?' জবাব চাইল কিশোর।

'রিটাকে আরেকবার অনুরোধ করার জন্যে। কিন্তু তারপরই দেখলাম ও তোমাকে গোলাপি কেসটা রাখতে দিল।'

'আমরা তো তোমাকে দেখিনি!' বলল নথি।

মাথা ঝাঁকাল শুঁটকি।

'আমি বড় এক ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওখান থেকে সব দেখেছি, সব শুনেছি।'

'তো রিটা সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়নি বলে ডিককে চুরি করেছ? নাকি আরও কোনও কারণ আছে?' কিশোরের জিজ্ঞাসা।

'আছে,' জানাল শুঁটকি। 'একটা বোরিং ইন্টারভিউয়ের চাইতে কাছিম হারানোর স্টোরি অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না কিশোর।

'বলো কী!'

'খাইছে!'

'আমি অবশ্য কাছিমটা ফিরিয়ে দিতাম,' স্বীকার করল শুঁটকি। 'যে জ্বালান জ্বালিয়েছে ওটা, বাপ রে বাপ! কাল রাতে দেখি আমার বাবল্ বাথে সাঁতরাচ্ছে।'

ছেলেরা নিশ্চুপ। শুঁটকি কাগজ স্তূপ করছে।

'আমি জানি তুমি সব বানিয়ে বানিয়ে লেখো,' মুসা বলল।

'সব সময় না,' বলল শুঁটকি। 'যখন যখন দরকার পড়ে।' একটা পাতা বের করল ও। 'যেমন এটা।'

পাতাটার দিকে চেয়ে রইল কিশোর। রিটার ছবি ছাপা হয়েছে। উপরে লেখা: "রিটা ছেলেদেরকে অপছন্দ করে।"

'কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু স্টোরিটা তো পাঠক খাবে,' বলল শুঁটকি।

ভ্রূ কুঁচকাল কিশোর।

'এটা অসৎ সাংবাদিকতা।'

শ্রাগ করল শুঁটকি। কাগজের বান্ডিলটা তুলে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়াল।

রহস্যের কিনারা হলো। এখন একটা কাজই বাকি।

'টেরি, দাঁড়াও,' ডাকল কিশোর। 'ডিককে দিয়ে যাও। এখুনি।'

কাঁধের উপর দিয়ে চাইল শুঁটকি।

'সম্ভব না,' জানাল।

'খাইছে! কেন?'

'কারণ,' বলে দাঁত বের করে হাসল শুঁটকি, 'আমি ওকে পাচার করে দিয়েছি।'

আট

'কার কাছে?' কিশোরের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

'এতই যখন কৌতূহল তো শোনো, কেন শিপটনের কাছে।'

'কেন শিপটন?' কিশোর বলল।

'বদলাবদলি,' ব্যাখ্যা করল শুঁটকি। 'কাছিমের বদলে রিটার একটা ছবি। আর্টিকলের জন্যে দরকার ছিল।'

ছেলেরা ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে বাইকের উদ্দেশে এগোল।

'গুড লাক,' চেঁচাল শুঁটকি। কপট শুভ কামনা আরকী।

'কেন শিপটন ডিককে আমাদের হাতে কখনোই দেবে না,' বাইকে ওঠার সময় বলল নথি।

'হয়তো এতক্ষণে রিটার কাছে ফিরিয়েই দিয়েছে,' বলল কিশোর। 'চলো বাসায় যাই।'

'আমি আর খুদে দানব দেখতে চাই না,' বলল মুসা।

'টিমো এখন নিশ্চয়ই ট্যাঙ্কের ভিতরে আছে,' বলল কিশোর।

'আমি বলছিলাম মানি আর পেনির কথা।'

তিন গোয়েন্দা কেনদের বাসায় পৌঁছে দেখে, মানি আর পেনি উঠনে ফুটবল খেলছে।

'কেন কোথায়?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

হাসল যমজরা।

'ওকে খুব পছন্দ তোমাদের, তাই না?' মানি বলল।

'বেশি কথার সময় নেই। ও কোথায় তাই বলো,' মুসা বলল।

'এবার মিথ্যে বোলো না কিন্তু,' সতর্ক করল রবিন।

'আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা,' পেনি বলল। 'পিছনের উঠনে আছে ও। নিলাম বসিয়েছে।'

'কীসের নিলাম?' মুসা জবাব চাইল।

রলটা বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল মানি।

'রিটা হাওয়ার্থের যা যা জোগাড় করেছিল সব বিক্রি করে দিচ্ছে।'

'ওর স্যুভনিয়ারগুলো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল পেনি।

'ডয়েল নিউজে পড়েছে রিটা ছেলেদেরকে পছন্দ করে না। তাই খেপে ঘোম হয়ে গেছে।'

'ওর সব জিনিসপত্র আমার বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে,' অভিযোগ জানাল মানি।

'আর আমাকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্রেতাদেরকে খবর দিতে হয়েছে,' সুর মিলাল পেনি।

'আমরা ক্লান্ত!' দ্বৈত কণ্ঠে চেঁচাল ওরা।

কিশোর এক যমজের কাঁধ চেপে ধরল।

'মানি–'

'আমি পেনি!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ছেলেটি।

'ঠিক আছে, পেনি,' বলল কিশোর। 'ও কি কাছিমটাও বেচছে?'

'হ্যাঁ,' জানাল পেনি। 'কত করে বললাম ওটাকে রেখে দিই, কিন্তু কেন কিছুতেই শুনল না। রিটার কথা মনে পড়ে এরকম কোনও কিছুই ও রাখবে না।'

পেটের ভিতরে মোচড় অনুভব করল কিশোর। কেন শিপটনকে এখুনি ঠেকাতে হবে।

'এসো,' বন্ধুদেরকে ডেকে দৌড় দিল পিছনের উঠনের উদ্দেশে।

উঠনে সাতটা ছেলে-মেয়ে হাজির। এক পিকনিক টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে কেন। হাতে খালি এক সোডার ক্যান।

'কত বললে ক্যানটার জন্যে? রিটা কিন্তু এই ক্যান থেকে সোডা খেয়েছে,' হাঁক ছাড়ল কেন।

ছেলে-মেয়েরা পরস্পর বিড়বিড় করে আলাপ করছে।

এক মেয়ে হাত তুলল।

'আমার বোনের এক শিশি নেইল পালিশ দেব!'

মুখ বানাল কেন।

'নাহ্।'

চশমা পরা এক ছেলে এবার হাত উঠাল।

'দুটো উইঙ্কি ডিঙ্কি বার!'

'বাদামওয়ালা?' কেন উত্তেজিত।

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটি।

'করলাম বিক্রি! উইঙ্কি ডিঙ্কির কাছে!' চেঁচিয়ে বলল কেন।

সোডা ক্যানের সঙ্গে ক্যান্ডি বারের বিনিময় দেখল তিন গোয়েন্দা।

'এর পরের আইটেম...' চেঁচাল কেন। পকেটে হাত ভরল। ...হচ্ছে রিটার পোষা কাছিম।'

কিশোরের বাহুতে চাপ দিল নথি।

কাছিমটাকে তুলে দেখাল কেন।

'কত বলছ?'

হাত উঠাল রবিন।

'এক পাতা স্টিকার!'

মাথা নাড়ল কেন।

'উঁহুঁ।'

ঝট করে উঠে গেল মুসার হাত।

'এক প্যাকেট ফুটবল কার্ড!'

'এই তো কথা ফুটছে মুখে,' বলল কেন। চেঁচিয়ে উঠে 'করলাম বিক্রি' বলতে যাবে, এসময় একটি মেয়ে চিৎকার ছাড়ল।

'এক প্যাকেট ফুটবল কার্ড– আর একটা নতুন ফুটবল!'

ঘুরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। জুলি, শ্যারন আর সিন্ডি ওদের ঠিক পিছনেই দাঁড়ানো।

'কাছিম দৌড়ের জন্যে আমাদের ডিককে চাই,' বলল জুলি। 'ওকে আমাদের পেতেই হবে।'

'ও, তাই বুঝি?' বলে হাত উঁচাল কিশোর।

কেন আঙুল দেখাল ওর দিকে।

'কত বলছ?'

'জাদুকর জুয়েল আইচের অটোগ্রাফসহ ছবি।'

'জুয়েল আইচ?' চোখ চকচক করে উঠল কেনের।

'হ্যাঁ।'

মাথা চুলকে নিল কেন।

'জুয়েল আইচের ছবি বহুদিন ধরে খুঁজছি।'

হাত দুলাল জুলি।

'জাদুকর রবার্টো কান থেকে যে পয়সাটা বের করেছিলেন সেটা আমি দিতে পারব তোমাকে।'

উত্তেজিত বিড়বিড়ানির শব্দ উঠল।

সেরেছে, ভাবল কিশোর। রবার্তো এই সেদিন টিভিতে শো করেছেন। একেবারে টাটকা স্মৃতি সবার মনে।

'গুডবাই, ডিক,' আওড়াল রবিন।

এসময় কেন গর্জে উঠল।

'রবার্তো আলসে জাদুকর। সব কিছু লুকিয়ে রাখে আস্তিনের মধ্যে।'

জুলির দল রীতিমত আঁতকে উঠল।

কিশোরের উদ্দেশে তর্জনী তাক করল কেন।

'করলাম বিক্রি! কিশোরের কাছে। জুয়েল আইচের ছবির বিনিময়ে,' বলল ও।

'ধুত্তোরি!' শোনা গেল সিন্ডির কণ্ঠে।

তিন গোয়েন্দার খুশি ধরে না।

'সাবাস, কিশোর,' বলে উঠল মুসা।

কেনের হাত থেকে কাছিমটা নিল কিশোর। ওটার খোলে একটা তারা চিহ্ন আর মাথায় দুটো সাদা ফুটকি।

'রিটা ছেলেদেরকে অপছন্দ করে কথাটা ঠিক না, কেন,' জানাল কিশোর। 'সব টেরির বানানো কথা।'

'তা হলে ডিককে ফিরিয়ে দাও!' দাবি জানাল কেন।

'প্রশ্নই ওঠে না! ব্যবসা ব্যবসাই!' সাফ বলে দিল গোয়েন্দাপ্রধান।

সাবধানে ডিককে পকেটে পুরল কিশোর। এবার তিন বন্ধু বাইকে চেপে সোজা মেইন স্ট্রিটে।

ওরা যখন পৌঁছল, রিটা তখন শুটিং করছে এক আইসক্রিম পার্লারের সামনে। ওর কাজ শেষ হলে, ছেলেরা এগিয়ে গেল।

'তোমরা এখানে কী করছ?' রিটা বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'তোমার জন্যে একটা ছোট্ট উপহার নিয়ে এসেছি আমরা,' বলল কিশোর। কাছিমটা তুলে ধরে দেখাল।

'নতুন কাছিম আমার চাই না। ডিকের জায়গা আর কেউ নিতে পারবে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রিটা।

'কিন্তু এটাই তো ডিক,' জানাল মুসা।

'কী বললে?'

তারা চিহ্ন ও সাদা ফুটকি দেখাল কিশোর।

'ডিক!' চেঁচিয়ে উঠল রিটা। 'তোমাদেরকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব! কিশোর, সত্যিই সেরা গোয়েন্দা। ওর যে এত নাম-ডাক, এমনি না।'

'ধন্যবাদ,' জানাল কিশোর।

'সোমবার রকি বিচ স্কুলে আসছ তো?' রবিন প্রশ্ন করল।

'ডিককে না পেলেও যেতাম। প্রিন্সিপালকে কথা দিয়েছি যখন, যেতে তো

হবেই। কিন্তু ডিককে চুরি করল কে?'

শুঁটকি টেরি দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই।

ওর দিকে তর্জনী তাক করল মুসা।

'ওই যে ও,' বলল সে।

'ও, আচ্ছা, সাংবাদিক সাহেবের এই কীর্তি!' বলে উঠল রিটা।

মুখে কেউ যেন কালো কালি লেপে দিয়েছে, ঝেড়ে দৌড় দিল সাংবাদিকপ্রবর শুঁটকি টেরি।

ছেলেরা হাই ফাইভ বিনিময় করল।

'তোমাদের স্কুলে যাব ঠিকই, তবে এবার খানিকটা পরিবর্তন হবে,' বলল রিটা।

'কী পরিবর্তন?' কিশোরের কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

রিটার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

'ডিক এবার বাসায় থাকছে।'

হেসে উঠল কিশোর।

সোমবার সকালে রিটার জন্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। ছবি সম্পর্কে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মত বিনিময় করল ও।

অনুষ্ঠানের পর অসংখ্য অটোগ্রাফ দিতে হলো রিটাকে। লাল নোটবুকে সেদিন লিখল কিশোর: ঠিক সময়ে ডিককে খুঁজে পাওয়া গেল!

সিনেমা সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম আমি। জানলাম রিটা সম্পর্কেও। রিটা বড় তারকা হতে পারে, কিন্তু আর সব মেয়ের মত সে-ও নিজের পোষ্যকে ভালবাসে।

"টোটালি রিটা" দেখার জন্য তর সইছে না আমার। আশা করছি, মধুর সমাপ্তি ঘটবে ছবিটার। ঠিক আমার রহস্যটার মত!

কেস বন্ধ।

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারো।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবে – প্রয়োজনে ২টি পাতা নেবে। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবে না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবে।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবে স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবে না। ঠিক আছে? –কা. আ. হোসেন।

জানে আলম জয়

সিলেট-৩১০০। মোবাইল-০১৯৪২৭৭৫৭৫ বা ০১৭১৭৮৭০৩৩৯।

শুভেচ্ছা নিবেন। নতুন বই 'নির্জন উপত্যকা' পড়েই এই চিঠিটা লিখছি। নাম দেখে যতটা ভাল লাগবে আশা করেছিলাম ততটা ভাল লাগেনি। আসলে গোয়েন্দা গল্পে কেবল যদি গোয়েন্দাগিরি থাকে, সহগল্প হিসেবে যদি অ্যাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চ, হরর, সায়েন্স ফিকশন বা ফ্যান্টাসী প্রভৃতি না থাকে তা হলে কাহিনি অনেকটা ম্যাড়মেড়ে মনে হয়।

কাজীদা, বেশি কিছু চাই না, শুধু অনুরোধ করব, তি. গো. সিরিজকে আবার আগের মত সব ধরনের গল্প দিয়ে ভরিয়ে তুলুন, পিজ। এ অনুরোধ শুধু আমার নয়; তি. গো.র হাজারো, লক্ষ বা তার চেয়েও বেশি পাঠকের। আশা করছি, তিন গোয়েন্দার পরবর্তী কোনও বইতে এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য পাব। সেবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভাল থাকুন।

★সেবা প্রকাশনীর যে-কোনও সিরিজের কাহিনি-বাছাই অনেককিছুর উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া, অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয় বইটি কীভাবে বেরুবে -- এক বা দুই খণ্ড, নাকি তিন খণ্ডের ভলিউম হিসাবে। তুমি যে-ধরনের কাহিনির কথা বলছ সে-রকম গল্প পেতে হবে তো! তোমার পরামর্শ আমাদের মাথায় থাকল।

তারিফ হেসেন

বয়স-১২, ক্লাস -ফাইভ, ৪৮/২ দঃ বিশিল, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

আমি একজন পুরানো পাঠক। আমি তিন গোয়েন্দার বই পড়েছি ২৮টি। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে হিমপিশাচ, হারানো কুকুর ও ভলিউম ৮২। তিন

গোয়েন্দার বই পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। আপনারা তাড়াতাড়ি নতুন বই বের করুন। নির্জন উপত্যকা ও কিশোরের নোটবুক তাড়াতাড়ি বের করুন। রকিবদা ও নওয়াবদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

★ বাব্বা! তুমি খুবই পুরনো পাঠক দেখছি! বয়সও তো মেলা! রকিবদা ও নওয়াবদাকে তোমার ধন্যবাদ পৌঁছাতে গিয়ে তাড়াতাড়ি লেখার জন্য জোর তাগিদ দিয়ে এসেছি। এবার খুশি তো?

ক্যাডেট শাহরিয়ার

ক্যা: নং ১৩১৪, সিরাজী হাউস, দশম শ্রেণী; পাবনা ক্যাডেট কলেজ।

ক্লাস সিক্সে থাকতে প্রথম যখন তিন গোয়েন্দা পড়ি তখন থেকে তি. গো.র অসম্ভব ভক্ত। সেই ক্লাস সিক্সেই আমি চল্লিশটা ভলিউম পড়েছিলাম। এরপর কলেজে আসার পর রানার প্রেমে পড়লাম। তবুও তি.গো. সময় পেলেই পড়ি। তবে আগের মত না। অনেক দিন পর ভলিউম ৭৩ পড়লাম। খুব ভাল লেগেছে। একটা ব্যাপারে আমার বেশ খটকা লেগেছে। 'ছদ্মবেশী গোয়েন্দা' বইয়ে লেখা 'রূপালী মাকড়সা'র কাহিনিতে প্রিন্সকে সাহায্য করতে আহত হয় রবিন। যার ফল এই উল্টা-পাল্টা ভবিষ্যৎ দেখা। অথচ 'রূপালী মাকড়সা' তি. গো. তৃতীয় বই। মাঝখানে এতগুলো বই বের হলো। তা হলে কি কাহিনীর একটা সামঞ্জস্যের অভাব দেখা গেল না?

★ যেহেতু 'ছদ্মবেশী গোয়েন্দা' আমার পড়া নেই, সেহেতু তোমার প্রশ্ন বাণটি আমাকে ছুঁতেই পারেনি, দশ হাত দূর দিয়ে চলে গেছে। লেখকের কাছ থেকে উত্তরটা জেনে নিয়ে পরে জানাব। আর ইতোমধ্যে কোনও পাঠক যদি তার আগেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারে তা হলে তো আরও ভাল।

ঐশী আরাত্রিকা (মিঠু) প্রযত্নে: শ্রীবিমান চন্দ্রমানী, ফ্ল্যাট নং-৪ সি, ৩৭৩/৪, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল পুকুরপাড়, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫।
মোবাইল ০১৮১৭০৮৮৪৬১ ও ০১৫২৩২৫৪৪২।

প্রথমে সবাইকে জানাই বিজয় দিবস এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা। কিশোরকে দুটি জটিল রহস্যের, মুসাকে ২০টি আইসক্রিমের এবং রবিনকে ১০টি জ্ঞানের বইয়ের শুভেচ্ছা। তা ছাড়া সবাইকে আগাম ঈদের শুভেচ্ছাও জানাচ্ছি। কাজী আংকেল, কিশোর, মুসা, রবিনকে আমার স্পেশাল শুভেচ্ছাগুলো অতি অবশ্যই পৌঁছে দিবেন। না দিলে চোদ্দ দলের মত আমিও সেবা প্রকাশনী অবরোধ করব।

শামসুদ্দীন নওয়াব আংকেলকে তাঁর নতুন বইগুলোর জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ। প্রার্থনা করি, তিনি কয়েক কোটি বছর বেঁচে থাকুন। সুমেরুর আতঙ্ক, পুতুল রহস্য, চোরের পিছে, সময়সুড়ঙ্গে আবার, হিমপিশাচের কবলে বইগুলোর জন্য আবারও থ্যাংকস্ জানাচ্ছি। আমি বড় হয়ে যদি খাবারের দোকান খুলি, তাহলে কাজী আংকেল আর শা.নওয়াব আংকেলকে একশোটা আইসক্রিম ফ্রি খাওয়াব এবং পরের আইসক্রিমগুলোর জন্য ৫ টাকা করে নেব। আর সপ্তাহে ২টা আইসক্রিম ফ্রি। দারুণ অফার, তাই না? অবশ্যই আসবেন।

তিন গোয়েন্দার মধ্যে মুসাকে আমার বেশি ভাল লাগে। মুসার সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে। আমিও মুসার মত লম্বা-চওড়া, মুসার মত বেশি খাই, আর বাসায় প্রায়ই খাইছে বলি। মা বলেন, এটা নাকি বদভ্যাস।

এখন লেখা শেষ করি। আর হ্যাঁ, মানিঅর্ডারে কি ১০০ টাকার বেশি টাকা পাঠানো যাবে? আমি পেন ফ্রেন্ডশিপে আগ্রহী। সেবার সবাইকে যে কোনও লাল রঙের ফুলের শুভেচ্ছা। আর কাজী আংকেল, আশীর্বাদ করবেন যেন আমি পরীক্ষায় ভাল ফল করে বাবা-মার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।

★ তুমি পারবে। তোমার চিঠির ভাষাই তা বলে দিচ্ছে। ...হ্যাঁ, বেশি টাকাও পাঠাতে পার। ...বোঝা গেল, তুমি আইসক্রিম খুবই পছন্দ করো। বলি কি, দোকানটা অন্য কিছুর দিলে হয় না? এই ধরো, গরম কিছুর? মানে, চা-বিস্কুট বা ওরকম কিছু? ঠাণ্ডা খেলে আমার যে আবার দাঁত কন-কন করে!

এমরান আহমেদ (সজীব)

গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্র, খালিশপুর, খুলনা, বাসা নং: ND-2।

আমি সেবার একজন পুরানো ভক্ত। আমার অবস্থা অনেকটা 'যাহাই পাই, তাহাই খাই'-এর মত। তবে তিন গোয়েন্দা পেলে দুনিয়ার কোনও কথাই মনে থাকে না। ভলিউম-৮১ পড়লাম। 'যাও এখান থেকে' গল্পটা আগেও পড়েছিলাম। কিন্তু তার পরিবর্তিত রূপ 'ভয়াল শহর' আরও সুন্দর লাগল। আমি গল্পটিকে তিন গোয়েন্দায় রূপান্তরের জন্য রকিব আংকেলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তা ছাড়া নওয়াব আংকেলের 'নির্জন উপত্যকা' বইটাও সুন্দর হয়েছে। ব্যাপার কী, নওয়াবদা, দুই মাস বইয়ের কোন খোঁজ নেই কেন? কোথায় ডুব দিয়েছিলেন? আমার প্রতিটি চিঠিতেই মেগা হরর বই লিখতে বলি নওয়াবদাকে। বলতে বলতে মুখে ফেনা উঠে গেছে! কয়েকদিন আগে খসরু আংকেলের অনুবাদ ভলিউমটা কিনলাম। 'বুকের মাঝে কেমন করে ওঠে' টাইপের গল্প একেকটা। কাজীদা, এই অধমের ছোট একটা অনুরোধ রাখতেই হবে। ডিকেআইউইথনেস বুকসের 'পিরামিড' অথবা হ্যাজেল ম্যারীর (রেইনট্রী) 'দ্য গ্রেট পিরামিড' বই দুটো অনুবাদ করেন। অনীশ আংকেলের 'ভ্যাম্পায়ার' সংকলনের প্রতিটা গল্প 'আবার জিগায়' টাইপের সুন্দর হয়েছে।

কাজীদা, এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পরীক্ষায় জি.পি. এ.-৫ পাওয়ার পর আপনাদের দোয়ায় মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছি। আপনি আমার সাফল্যে গর্ব অনুভব করেছেন, নিজেকে খুব কেউকেটা আদমি মনে হচ্ছে। দোয়া করবেন, আমি যেন এই বাংলার আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিবেদিত করতে পারি।

★ দোয়া রইল। ...উপরের বই দুটি হাতে এলে উল্টে-পাল্টে দেখব অনুবাদ করতে ইচ্ছে হয় কি না। সব অনুবাদ তো সবার হাতে ভাল হয়ও না।

রাফসান রেজা রিয়াদ

সুরভী-৪, টিলাগড়, সিলেট। মোবাইল: ০১১৯৬০৬০৫১০।

ভলিউম-৮১-তে আলোচনা বিভাগে নিসাত তাসনিন রুসনা ও ঝর্ণার চিঠির

প্রেক্ষিতে আপনার উত্তর পড়ার পর থেকে আমি কিন্তু খুব একটা ভাল নেই। অনুগ্রহপূর্বক ধৈর্য সহকারে আমার চিঠিটা পড়বেন।

আচমকা 'তিন গোয়েন্দা'র নতুন একক বই প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তটা মোটেই ভাল হয়নি। এর কারণ হিসেবে আপনি যে বিষয়টির কথা বলেছেন– পাঠকদের ভলিউম প্রীতি– তার পিছনে কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনারাই দায়ী। তিন গোয়েন্দা'র প্রায় প্রতি ভলিউমেই যদি একটি (ক্ষেত্রবিশেষে দুইটি) নতুন বই পাওয়া যায়, তাতে আলোচনা বিভাগ থাকে এবং কোনও বই প্রকাশের মাত্র দুই মাসের মাথায় স্টক না শেষ হলেও সেটা ভলিউমে চলে যায়, তবে পাঠকরা যে ভলিউমের প্রতি আকৃষ্ট হবে এটাই তো স্বাভাবিক। পূর্বে তি. গো'র ভলিউম বলতে বোঝাত আউট অফ প্রিন্ট তিনটি বই একত্রে প্রকাশ। তা হলে কেন ইদানীং এত পরিবর্তন? পাঠকদের কাছে আপনি পরামর্শ চেয়েছেন, তাই আমি আমার মতামত জানাচ্ছি যে, প্রতি মাসে তিন গোয়েন্দা'র একটি নতুন বই বের করুন। পাশাপাশি তিন গোয়েন্দা'র নতুন বইয়ের কাটতি বৃদ্ধির জন্য কিছু প্রস্তাব রাখছি। যদি সম্ভব হয় অনুমোদন করবেন, আর যদি এটাকে একজন বেআদব পাঠকের উপর্যুপরি উপদেশ বর্ষণ হিসেবে দেখেন তা হলে আমার কিছু বলার নেই।

(১) 'দুটি বই একত্রে' প্রকাশ বন্ধ করুন। এ ধরনের বইয়ে মূল গল্পটি ভাল হলেও বোনাস গল্পটি খুবই সাধারণ মানের।

(২) ভলিউমে কোনও নতুন বই প্রকাশ করবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনটি বই আউট অফ প্রিন্ট হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভলিউম প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। স্টক শেষ না হলে কোনও বই ভলিউমে পাঠাবেন না।

(৩) 'এ-মাসের তিন গোয়েন্দা' এবং 'আলোচনা বিভাগে পাঠকের ছবি' বন্ধ করুন। কারণ পেপারব্যাক বইয়ে ছবি ভাল আসে না। তা ছাড়া জায়গাও নষ্ট হয়।

(৪) 'তিন গোয়েন্দা কুইজ প্রতিযোগিতা' পুনরায় চালু করুন। সহজ কুইজ দিন, ৫টির পরিবর্তে ৩টি কুইজ দিন, কুইজের উত্তর পাঠানোর সময়সীমা ২ মাস নির্ধারণ করুন। উপহার হিসেবে লেখকের অটোগ্রাফ সম্বলিত ১টি বই দিন। এতে পাঠকদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

(৫) তিন গোয়েন্দা'র ভলিউমে আলোচনা বিভাগ বন্ধ করুন।

(৬) পাঠকদের অনুরোধের দিকে দৃষ্টি রাখুন। রাগ করবেন না। তবে এ ব্যাপারে আপনারা বেশ স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়েছেন। যেমন, অনেক পাঠকই দীর্ঘদিন ধরে তিন গোয়েন্দা'র একটি দুই খণ্ডের বইয়ের জন্য এবং তিন গোয়েন্দাকে বাংলাদেশে আনার জন্য দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু আপনারা তাতে কর্ণপাতই করছেন না।

আমার প্রস্তাবগুলো ভেবে দেখবেন। তারপর আপনার যেটা ভাল মনে হয় সিদ্ধান্ত নেবেন। তিন গোয়েন্দা'র একজন ভক্ত ও পাঠক হিসেবে চুপ করে থাকতে

পারিনি বলে দুঃখিত। তিন গোয়েন্দা'র উত্তরোত্তর সাফল্য ও জনপ্রিয়তা কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

★তোমার পরামর্শ শুনলাম। এক্ষুনি কোনও জবাব দিচ্ছি না -- আরও চিঠি আসুক, তারপর সবমিলিয়ে কী সিদ্ধান্ত হয় জানতে পারবে। তোমার মিঠেকড়া, দীর্ঘ আলোচনার জন্য ধন্যবাদ।

মোঃ আফজাল হোসেন

ভাঠাটিকর-১৭, টিলাগড়, সিলেট।

টেস্ট পরীক্ষার কারণে মাঝখানে বেশ কয়েকদিন তিন গোয়েন্দার সাথে যোগাযোগ বন্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত ছুটি মিলতেই একসাথে ভলিউম-৮১, ৮২, ৮৩ এবং নির্জন উপত্যকা বইগুলো শেষ করি। বইগুলো পড়ে এত ভাল লেগেছে যে একাধিকবার পড়তে বাধ্য হয়েছি। নওয়াব দাকে কী বলে ধন্যবাদ দিব সেটাই তো বুঝতে পারছি না। কাজীদা, আপনি কি দয়া করে আপনার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার বিশাল ঝুলি থেকে নওয়াব দাকে আমার পক্ষ হয়ে ধন্যবাদ দিবেন? তবে হ্যাঁ, লোভনীয় কিছু প্রচ্ছদের জন্য ভিক্টর নীলকেও ধন্যবাদ দেবার এ সুযোগটা এবার ছাড়ছি না, ভিক্টর দাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কাজীদা, ভলিউমগুলো পড়ে জানতে পারলাম প্রতি মাসে তিন গোয়েন্দার নতুন বই বের হওয়া নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে, জানি এগুলো খুব মিস করব। তবে ০১৭২২০৬২২৫২ (সিলেটের জয়)-এর সাথে আমিও একমত। আসলেই তিন গোয়েন্দা বই এর জন্য ২-৩ মাস অপেক্ষা করা খুবই কষ্টদায়ক। আশা করি আপনারা সেটা বুঝবেন। অর্থাৎ আমাদের চাওয়া প্রতি মাসেই নতুন একটি তিন গোয়েন্দা বই।

কাজীদা, একটি অনুরোধ- ভলিউম ২৯ ও ৩৯ বই দুটি যদি স্টকে কম বা না থেকে থাকে তা হলে তাড়াতাড়িই রিপ্রিন্ট করুন। কারণ আমাকে সেবার বই সাপ্লাইদাতা লাইব্রেরীয়ান ভাই, অতি শীঘ্রিই আসছেন সেবায়, বই দুটি নেওয়ার জন্য। আর এ অনুরোধটাও তিনি আমার মাধ্যমে আপনাকে জানাতে বলেছেন।

★প্রিয় আফজাল, অনেকদিন পর তোমার চিঠি পেয়ে ভাল লাগছে। তোমার মতামত জানলাম, ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছাও আমরা ভাগাভাগি করে নিয়ে নিয়েছি। তুমিও আমাদের শুভেচ্ছা নাও। ...এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর. তিগো ভলিউম ২৯ বর্তমানে আমাদের স্টকে আছে, ৩৯ রয়েছে অল্প কয়েকটা, ওটা রিপ্রিন্টের জন্য প্রেসে গেছে।

মাহ্‌মুদ হোসেন আনাম

বহরমপুর, রাজশাহী-৬০০০।

আমি তিন গোয়েন্দার ভক্ত। এ পর্যন্ত আমি প্রায় ১০৯ টি তিন গোয়েন্দার বই পড়েছি। কাজীদা, আমি আপনার কাছে দুইটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।

১. কিছু কিছু দোকানে তিন গোয়েন্দার প্রথম দিকের ভলিউম যেমন, ভলিউম- ১/১, ১/২, ২/১, ২/২ ইত্যাদি বইগুলো। খুব সস্তায় এবং একই প্রচ্ছদে

দেখতে পেয়েছি। এগুলোর মলাট খুবই পাতলা। প্রচ্ছদটির বর্ণনাও দিয়ে রাখি। এখানে অনেকগুলো কাটা কাটা ছবি একসাথে রয়েছে। যেমন, উপরে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা, তারপাশে একটি বিমান, তার নীচে একটি মেয়ে এবং আরও অনেক মানুষের ছবি রয়েছে। এই প্রচ্ছদের বইগুলো কি আসল, না নকল?

২. বর্তমানে অনেকেই নানা রকম কথা বলছে। কেউ বলছে যে শামসুদ্দীন নওয়ার নাকি রকিব হাসানের ছদ্মনাম। কথাটি কি ঠিক?

উপরের দুইটি প্রশ্নের উত্তর পেলে খুবই উপকৃত হব। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

★ভলিউম ৪টি গুদাম থেকে আনিয়ে দেখলাম, তোমার বর্ণনার সঙ্গে একটিও মেলে না। প্রতিটিতেই পুরু ডুপ্লেক্স বোর্ডের উপর আলাদা আলাদা প্রচ্ছদ রয়েছে। তবে এটা বর্তমান অবস্থা। অনেক বছর আগে ভলিউম ১ থেকে ২২ পর্যন্ত প্রতিটি বইয়ে ওই রকম পাতলা কাগজে একই প্রচ্ছদ ছাপা হয়েছিল, সে-সব বইয়ের দামও ছিল কম। তারই কিছু কিছু নিশ্চয়ই তুমি বাজারে দেখেছ। ওগুলো নকল নয়, আসলই। সস্তায় পেয়ে গেলে তো ভালই। তবে দেখে নিয়ো সব পৃষ্ঠা আছে কি না, কিংবা সেকেন্ডহ্যান্ড কি না।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এক্ষুনি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, যা-ই বলি না কেন – তাতে কিছুটা ঠিক ও কিছুটা ভুল থাকবে। পরে সময়মত সবই জানতে পারবে। ...তোমার জন্যও আমাদের সবার শুভেচ্ছা রইল।

শাহরিয়ার কিবরিয়া

মোঃ পুর, ঢাকা-১২০৭।

পত্রের প্রথমেই জানাই সেবার সকলকে ২২টি ভিন্ন ভিন্ন ফুলের শুভেচ্ছা। 'শয়তানের থাবা' থেকে 'নির্জন উপত্যকা' পর্যন্ত আমি সব পড়েছি। তি. গো.-র মোট বিশটি গল্প আমি পড়িনি। সেগুলো হলো– রত্নদানো, রত্নচোর, গোরস্তানে আতঙ্ক, যুদ্ধঘোষণা, টক্কর, ভোরের পিশাচ, উচ্ছেদ, জলদস্যুর মোহর, অভিশপ্ত লকেট, এখানেও ঝামেলা, আবার ঝামেলা, বড়দিনের ছুটি, আমি রবিন বলছি, নেতা নির্বাচন, মাছির সার্কাস, মাছেরা সাবধান, ভূতের খেলা, ড্রাকুলার রক্ত, মায়াপথ, পিশাচবাহিনী ও অদৃশ্য রশ্মি। নওয়াবদাকে আবার অনুরোধ করছি দু'খণ্ডের বই বের করার জন্য।

কৌতুক

টেরি ও কডি জাদুঘরে গিয়েছে। সেখানে পাশাপাশি সাজানো দুটি মাথার খুলি দেখল। একটি বড়, একটি ছোট।

কডি: টেরি, ওই খুলিটা কার?

টেরি: সম্রাট অশোকের।

কডি: আর ছোটটা?

টেরি: ওটাও সম্রাট অশোকেরই।

কডি: আরে! একই লোকের মাথার খুলি দুটো হয় কী করে?
টেরি: পরেরটা ছোটকালের।

মোঃ মেহেদী হাসান
ধানুয়া, শিবপুর, নরসিংদী।

ভলিউম ৮৩-তে প্রকাশিত 'কিশোরের নোটবুক' খুবই ভাল লেগেছে। বইটির জন্য শা. নওয়াবদা'কে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

কাজীদা ৮৩-এর আলোচনা বিভাগে জোসী চাকমা ও মোঃ সাইফ হাসানের চিঠির মাঝখানে একটি কৌতুক ছাপানো হয়। কিন্তু কৌতুকটি কে পাঠিয়েছে সে বিষয়ে কিছু লেখা হয়নি। দয়া করে বলবেন কি কৌতুকটি কে পাঠিয়েছে?

শায়েখ বিন কমর, তোমাকে জানাচ্ছি, রকিবদা'র লেখা গুপ্তধনের বইগুলো হলো:– কঙ্কাল দ্বীপ, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত, জলদস্যুর দ্বীপ ১, ২, ছুটি, ভূতের হাসি, বোম্বেটে, কালো জাহাজ, বাক্সটা প্রয়োজন, ভাঙ্গা ঘোড়া, ঈশ্বরের অশ্রু, ওয়ার্নিং বেল, মূর্তির হুঙ্কার, সোনার খোঁজে, দক্ষিণ যাত্রা, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া এবং নেকড়ের গুহা। আর শা. নওয়াবদার লেখা গুপ্তধনের বইগুলো হলো:– ব্রাউন্সভিলে গণ্ডোগল, রত্নের সন্ধানে এবং জলদস্যুর গুপ্তধন।

আসিফ ও আফিম, তোমাদের সাথে আমিও একমত। আসলেই এখন তেমন কোনও ধাঁধা আসে না এবং অল্প কয়েকটা যা-ও বা আসে, তার উত্তর বইয়ের পেছনে দেওয়া থাকে। ফলে ধাঁধার মজাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি পাঠকদের জন্যও বিশেষ করে আসিফ ও আফিমের জন্য কয়েকটি ধাঁধা পাঠালাম। আশা করছি তোমরা উত্তর দিতে পারবে। আর না পারলে পরে যে কোনও এক সময় আমিই জানিয়ে দেব।

কুইজ
১. 'দিনিজসপ্রে'-এর সম্পূর্ণ নাম কী?
২. কোন ফুল থেকে পচা মাংশের গন্ধ বের হয়?
৩. তিন গোয়েন্দার ৬টি গোপন পথের নাম কী?
৪. আশ্চর্য ও প্রশ্নবোধক এরপর তিন গোয়েন্দার প্রতীক কী ছিল?
৫. মুসার গার্ল ফ্রেন্ডের নাম কী?
৬. কিশোর সর্ব প্রথম কাকে খুন করে?

☆কৌতুকটি ছিল জোসী চাকমার। ওর চিঠির উত্তর কৌতুকের পরে দিলে বুঝতে সুবিধে হতো ঠিকই, কিন্তু কেমন একটু বেখাপ্পা লাগত না? ...দেখা যাক, আসিফ ও আফিম ছাড়াও আর কে কে তোমার কুইজের উত্তর দিতে পারে।

আরিফুর রহমান বাদল
কাঁঠাল বাগান কলোনি, লাকসাম, কুমিল্লা। মোবা: ০১৭২২৪৩২৫৮৬।

কাজীদা, নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল। নতুন বছর বয়ে আনুক আপনার জীবনে

অনেক শান্তি আর সুখ। আর সেবা বয়ে আনুক অনেক মজার মজার বই। ভলিউম ৮১ ও ৮২ পড়লাম। ভালই লাগল। শা. নওয়াবকে ধন্যবাদ জানাবেন। তিন গোয়েন্দার হাল ধরে রাখার জন্য তাঁকে আরও কিছু 'এক্সট্রা' ধন্যবাদ দিবেন। আর তাঁকেও নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল।

বই দুটোর আলোচনা বিভাগ খুবই প্রাণবন্ত ও মজাদার মনে হলো। তাই অংশ নেয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। কাজীদা একটু সুযোগ কি দেবেন?

কুমিল্লার রথিনকে বলছি: তোমার কথা রাকিবের মনে পড়ে। তাই সে মিস্‌ড কল দেয়। বলো তো তুমি কি কখনও একটা মিস্‌ড কলের উত্তরে আরেকটা মিস্‌ড কল দিয়েছ? শোনো; মিস্‌ড কল এক ধরনের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

লাকসামের পলাশকে বলছি– কবিতাটি সুন্দর হয়েছে। আমরা তোমার কাছ থেকে আরও সুন্দর সুন্দর কবিতা আশা করি। কবিতা লেখা বন্ধ কোরো না।

এবার একটি কৌতুক:

মুসা একবার তার এক ক্লাসমেটের উপর খুব চটে গিয়ে বলল:

এক থাপ্পড়ে তোমার ৬৪টা দাঁত ফেলে দেব।

পেছনে শুটকী টেরী তা শুনতে পেয়ে বলল: মুসাকে বিজ্ঞান ক্লাসে আরও মনোযোগী হতে হবে। মানুষের দাঁত ৬৪টা নয়, ৩২টা থাকে।

মুসা আরও রেগে গিয়ে বলল: আমি জানতাম, তুমি আমাদের কথার মাঝে নাক গলাবে। তাই তোমার বত্রিশটাও ধরে রেখেছি।

সেবার সবাইকে ও আপনাকে আবারও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

আমি সেবার পাঠক-পাঠিকাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। তাই পূর্ণ ঠিকানা ও মোবাইল নং দিলাম।

★আশা করি বন্ধু পেয়ে যাবে। ...তুমিও আমাদের সবার শুভেচ্ছা জেনো।

মোঃ শোয়েব হাসান (অনিক)

গ্রাম+ডাক: কচুবুনিয়া, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট-৯৩২২।

শত অশান্তির মাঝে শান্তি পাই সেবার কাছে। ঠিক যেন শত অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল আলো। 'নির্জন উপত্যকা'য় রহস্য ভরা ছিল, শেষ অক্ষর না পড়ে বুঝতে পারিনি কে আসল নাটের গুরু। ভলিউম ৮৩-র কিশোরের নোটবুক এবং গুহারহস্য দুটিই VERY BEST। প্রচ্ছদও অসাধারণ। দুঃখ দূরে থাকুক সুখের দাপটে।

★তোমার ইতিবাচক মনোভাব খুব ভাল লাগল।

কিশোর থ্রিলার

ভলিউম-৮৫

তিন গোয়েন্দা

এবার ভেদ করতে হবে লেজকাটা বাঁদরের রহস্য। কিন্তু কাজটা অত সোজা নয়। শুরুতেই পেছনে লেগে গেল শত্রু। চলল গুপ্তধনের সঙ্কেত লেখা কাঠের চাকতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।
প্রথমে পেরু তারপর আর্জেন্টিনায় যেতে হলো তিন গোয়েন্দাকে। কিন্তু গুপ্তধনের হদিশ কি মিলল?

শয়তানের জলাভূমি: রকিব হাসান
দুর্গম ওয়াইল্ডক্যাট সোয়াম্পে এসে হাজির হলো তিন গোয়েন্দা প্রাগৈতিহাসিক উটের ফসিল খুঁড়তে গিয়ে বেরোল ডাকাত। তারপর? জমজমাট রহস্য! সমাধান না করে পিছিয়ে আসার কোন ইচ্ছে নেই তিন গোয়েন্দার।

সেরা গোয়েন্দা: শামসুদ্দীন নওয়াব
তিন গোয়েন্দার প্রিয় অভিনেত্রী কিশোরী রিটা হ্যাওয়ার্থ এসেছে রকি বীচে। ছবির শুটিং করতে। সঙ্গে এনেছে ওর প্রিয় কাছিম ডিককেও। তিন গোয়েন্দার জিম্মায় ডিককে রেখে মেকআপ করতে গেল রিটা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিখোঁজ হয়ে গেল কাছিমটা। রিটাকে এখন মুখ দেখাবে কী করে ওরা?
কিশোরের ধারণা, হারায়নি কাছিমটা– চুরি করা হয়েছে কাজেই, সূত্রের সন্ধানে মাঠে নামল তিন গোয়েন্দা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০